# জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা

## ২০০৫

রাষ্ট্রীয় শিক্ষা অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

# জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা
# ২০০৫

রাষ্ট্রীয় শিক্ষা অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

# জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা

# ২০০৫

রাষ্ট্রীয় শিক্ষা অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

## শুরুর কথা

NCERT-র উদ্যোগে সামাজিক চিন্তনের একটি অসাধারণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমাদের শিশুদের কী পড়ানো উচিত এবং কীভাবে সেটিই ছিল এই প্রক্রিয়ার বিষয়বস্তু। আমাদের কাজ ছিল বর্তমান দলিলে উপস্থাপিত জাতীয় পাঠক্রমের কাঠামো প্রস্তুত করা। ভাবনা এবং প্রত্যাশার বহুধা-বিস্তৃত এই মন্থন কর্মকাণ্ডে, বেশ অনেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আমাকে কাজ করতে হয়েছিল। যাঁদের নাম এই দলিলে উল্লিখিত হল।

অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে এখানে, আর প্রচুর পরামর্শ। এর সঙ্গে প্রায়শই এমন কিছু কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যেগুলি বিষয়টিকে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র করে তুলেছে। যেমন, মাতৃভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর যোগাযোগ মাধ্যম, অথবা শিশুদের নিজস্ব ভাষায় বাক্যগঠনে সক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে তাদের সামাজিক, আর্থিক এবং জাতিগত অতীত প্রেক্ষাপট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— এরকম আরো অনেক কিছু। শিক্ষাগত নানান প্রযুক্তি এবং মাধ্যমের তাৎপর্য বর্তমানে স্বীকৃত। কিন্তু শিক্ষকই হলেন এর মধ্যমণি। বৈচিত্র্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু একে সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়নি। সামাজিক মেলামেশায় আরব্ধ জ্ঞান যে আমাদের সম্পদ এবং একে সংহত করতে পারলে প্রথাবদ্ধ পাঠক্রম যে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হবে, বারংবার সে কথা স্বীকার করা হয়েছে। বহুত্ববাদ এবং তারই অনুভবসঞ্জাত বোধের জয়গান করা হয়েছে। এই বোধের সারাংশ হল, একটি বিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে বহুধা এবং বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত থেকে উন্নততর সৃষ্টিশীলতার পথনির্দেশ করতে পারে।

এই দলিলে প্রায়শই শিশুদের ওপর পাঠক্রমের যে বোঝা সে প্রশ্নটি ঘুরে ফিরে এসেছে। আর এই প্রসঙ্গে বারেবারে একই অন্ধকারে আমরা তলিয়ে গিয়েছি। আমাদের স্মৃতি স্বল্প মেয়াদী তথ্যের বোঝায় ভারাক্রান্ত। বিনিময়ে আমাদের বোধবুদ্ধি খোয়াতে বসেছি আমরা। এর বিপরীত প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে এক্ষুনি। কেননা আমাদের স্মরণশক্তি ক্ষমতা বিশেষভাবে এখনই বিপর্যস্ত হতে শুরু করেছে। শিশুদের কিছুটা অনুভবের বা বোধের স্বাদ দিতে হবে আমাদের। তবেই তো জীবনের নানান ওঠাপড়ায়, চিত্র ধ্বনিময় এই জগতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা প্রকৃত অর্থেই কি শিখতে পারবে, জ্ঞানের নিজস্ব সংজ্ঞা আর ব্যাখ্যা সৃষ্টি করতে পারবে। অনুভবের এই আস্বাদনে আমাদের সন্তানদের বর্তমান অখণ্ড, সৃষ্টিশীল এবং উপভোগ্য হয়ে উঠবে। তথ্যের মাত্রাতিরিক্ত বোঝায় তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। আর এই তথ্যও তাদের জীবনে খুবই অল্প সময়ের জন্য প্রয়োজন। সেই এক বাধাপেরোনো দৌড় প্রতিযোগিতা যাকে আমরা বলি পরীক্ষা, সেটি উত্তীর্ণ হবার জন্য যতদিন লাগে ততদিনই এরা গুরুত্বপূর্ণ। এই স্ব-আরোপিত প্রতিকূলতা থেকে নিজেকে মুক্ত করার কয়েকটি উপায়ের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এই দলিলে। এই ক্ষেত্রে সামান্য একটু সাফল্য অর্জনের তাৎপর্য হল, ক্ষমতাকে প্রশংসা করতে শিখেছি আমরা। শিখেছি যে, অসংখ্য তথ্য কাগজের ওপর কালির দাগে কিংবা কম্পিউটর ডিসকের কয়েকটি Byte-এ সহজেই ধরে রাখা যায়। কাজেই তাদের ভারে শৈশব স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করার অসারতা আমরা বুঝতে পেরেছি।

শিক্ষা প্রাণহীন জড় বস্তু নয়, যে তাকে চিঠিপত্রে কিংবা একজন শিক্ষকের মাধ্যমে বিলিবন্দোবস্ত করা যাবে। উর্বর এবং সতেজ শিক্ষা সর্বদাই সৃজিত হয়। শিশুর ভৌত এবং সাংস্কৃতিক মৃত্তিকার অনেক গভীরে তার মূল প্রোথিত। আর বাবা-মা, শিক্ষক, সহপাঠী, গোষ্ঠীর মানুষজন সকলের সঙ্গে আলাপচারিতায়, বাগবিতণ্ডায়, শিক্ষা অবিরাম পুষ্ট হয়। এই কর্মকাণ্ডে শিক্ষকদের ভূমিকা এবং মর্যাদা অবশ্যই শক্তিশালী করতে হবে, বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করতে হবে। জ্ঞানের সৎ এবং প্রকৃত নির্মাণ কাজে পারস্পরিক আদানপ্রদান বিষয়টি রয়েছে। এই দেওয়া নেওয়ায় যদি শিশুকে জোর করে নিষ্ক্রিয় করে রাখা না হয়, তবে শিক্ষকও এর থেকে অনেক কিছু শিখতে পারেন। সাধারণ ভাবে যে কোনো পরিণত বয়স্ক মানুষের তুলনায় শিশুদের ধারণা এবং পর্যবেক্ষণ শক্তি অনেক

বেশি। জ্ঞানের স্রষ্টা হিসেবে তাদের সম্ভাবনাময় ভূমিকার স্বীকৃতি প্রয়োজন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চিত আশ্বাসে আমি বলতে পারি যে, আমার সীমিত যেটুকু বোধবুদ্ধি সেটি শিশুদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে। এ দিকটিও দলিলে রয়েছে।

এই প্রক্রিয়ায় যারা যুক্ত ছিলেন তাঁদের সকলের স্পর্শে যে বিশিষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল, সেটি ছাড়া এ দলিল এমন সমৃদ্ধ ও বোধগম্য হয়ে উঠত না। কে যে প্রথম চকমকি পাথরে স্ফুলিঙ্গ তুলেছিল তা আমার জানা নেই— হয়তো বিশেষ ভাবে কেউই না। হয়তো অস্বচ্ছন্দ জমতে জমতে যখন পর্বত প্রমাণ হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই কালপর্বের কোনো এক মুহূর্তে হয়েছিল এ প্রচেষ্টা। যথেষ্ট হয়েছে আর নয়— অংশগ্রহণকারীদের বেশির ভাগের মনের ভাব এমন ছিল। হয়তো অল্প কয়েকজনের উৎসাহই ছিল সংক্রামক।

অনেক কাল আগে আমরা যা করতে চেয়েছিলাম তার অনেককিছু ভালোভাবে করে ওঠা যায়নি। সেজন্য কাউকে না কাউকে দোষ দেবার লোভ সামলানো শক্ত। কিন্তু আমরা দোষ বিচারের খেলা সাবধানে পরিহার করেছি— আমরা সকলেই কোনো না কোনো ভাবে এর জন্য দায়বদ্ধ, হয়তো সে কারণেই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সদস্য হিসাবে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যারা আবেগভরে দেশের অগণিত সাধারণ জন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করল, এ অবস্থার জন্য তারাই দায়ী। 'বহুত্ববাদ', 'ক্ষমতা', 'সাম্য' এই সব শব্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে আমি বিমুগ্ধ। আমি বিশ্বাস করি না যে এরা কোনো রাজনৈতিক বাগাড়ম্বরের অংশ। কেননা আমাদের এই বিস্তৃত আলোচনায় আমরা রাজনীতি প্রসঙ্গে প্রায় আলোচনা করিনি বললেই চলে। আমি বিশ্বাস করি যে এই শব্দগুলি আমাদের ভাবনায় এসেছে কেননা আমাদের মোট জনসমষ্টির যে তিনচতুর্থাংশ বর্তমানে সমস্ত সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত, আমাদের প্রকৃত শক্তি তাদের মধ্যেই নিহিত। এই দৃঢ় প্রত্যয় আমাদের পরিচালিত করেছে। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামাজিক পরম্পরায় অর্জিত দক্ষতা ও কুশলতার সঙ্গে প্রথাবদ্ধ শিক্ষার গাঁটছড়া বাঁধা হলেই আমাদের বাগানে ফুলের মরসুম এসে যাবে।

দলিলে প্রস্তাবাকারে এই পথে চলার কিছু দিকনির্দেশ রয়েছে। পদ্ধতির এমন কিছু পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে যেগুলি নিশ্চিতভাবেই সহায়ক হতে পারে। আমি আশা করি বিদ্যালয় শিক্ষাক্রমে সাধারণের জন্য একটি সর্বজনগ্রাহ্য শিক্ষানীতির ভাবনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে, যার সাহায্যে শিশু তার বাড়ি ও প্রাকৃতিক ভাষ্যে শিক্ষা লাভ করবে।

এ দায়িত্ব পালন করতে কখনো উৎসাহের ঘাটতি অনুভব করিনি আমরা। আমাদের মনে হয়েছে এটা করা যায়। এই উদ্যোগে আমাদের নবীন প্রজন্মের শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হবে— কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারের যে কটি চিহ্ন আমরা নিজেরাই মুদ্রিত করেছি— তার থেকে তারা দূরে থাকবে— এই আমার আশা।

যশ পাল

# কার্যনির্বাহী সারাংশ

NCERT-র কার্যনির্বাহী কমিটির ১৪ই এবং ১৯শে জুলাই, ২০০৪ সালের সভায় জাতীয় পাঠক্রম কাঠামোর পরিমার্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। লোকসভায় মানব-উন্নয়ন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন যে এই পরিমার্জনার কাজটি কাউন্সিলের করা উচিত। তদানুসারে এই সিদ্ধান্ত। একই সঙ্গে 'দুর্বহ ভার-বিহীন শিক্ষা' (১৯৯৩) এই শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জাতীয়পাঠক্রম কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনের কথা NCERT-র আধিকারিককে জানালেন মানব উন্নয়ন মন্ত্রকের শিক্ষা সচিব। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে , অধ্যাপক যশপালের নেতৃত্বে এই জাতীয় পরিচালন কমিটি এবং জাতীয় স্তরে ২১টি বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহ যাহা শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রণি তাদের প্রতিনিধিরা এই কমিটিতে যুক্ত। NCERT-র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধ্যাপকবর্গ ছাড়াও উচ্চশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, স্কুল-শিক্ষক, বেসরকারী সংস্থার শিক্ষাকর্মী এঁরা সকলেই রইলেন এই সব কমিটিতে। মহিশূর, আজমের, ভূপাল, ভুবনেশ্বর এবং শিলং এই পাঁচটি স্থানে NCERT-র আঞ্চলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আয়োজিত প্রধান আঞ্চলিক সেমিনারের আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা হতে লাগল। SCERT-র রাজ্য সচিব এবং পরীক্ষা পরিচালন বোর্ডগুলির সঙ্গে আলোচনা চলল। গ্রামীণ শিক্ষকদের পরামর্শ জানবার জন্য জাতীয় স্তরে তাঁদের সম্মেলনের আয়োজন হল। জনসাধারণের মতামত আহ্বান করে জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রপত্রিকায় নানান বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল এবং এর প্রতিক্রিয়ায় নানান প্রত্যুত্তর এসে পৌঁছল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভ্যতা ও প্রগতি শীর্ষক প্রবন্ধের একাংশে কবি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, 'সৃজনের উদ্দীপনা' এবং 'উদার আনন্দ' শৈশবের এই দুটি মহামূল্যবান সম্পদ অবিবেচক বড়দের পৃথিবীতে বিকৃত হয়ে যেতে পারে। এই অংশটি উদ্ধৃত করেই পরিমার্জিত জাতীয় পাঠক্রম কাঠামোর (NCF)-এরপ্রস্তুতি শুরু হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি যে সমস্ত পরিমার্জনা হয়েছে তারই বিবরণ আছে প্রারম্ভিক অধ্যায়ে। শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নীতিতে —(NPE, ১৯৮৬) একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার উপায় হিসাবে জাতীয় পাঠক্রমের কাঠামো গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। জাতীয় বিকাশের প্রত্যাশিত ধারণা থেকে সংবিধানের নিজস্ব কাঠামোর মধ্যে একটি মূল উপাদান নির্ধারণের সুপারিশও এর মধ্যে ছিল। প্রাসঙ্গিকতা, নমনীয়তা এবং সামগ্রিক গুণাবলীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে আয়োজিত কর্মসূচীতে আলোচ্য ক্ষেত্রটির আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

ধর্মনিরপেক্ষ, সাম্যবাদী, বিচিত্রমুখী ভারতের যে সমাজ তাকে অনুধাবন করে, সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভারতের সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নির্দেশিকা সন্ধান করে, শিক্ষার কয়েকটি উদার ব্যাপ্ত লক্ষ্যকে এই দলিলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা, অপরের স্বাচ্ছন্দ ও অনুভবের প্রতি সংবেদনশীলতা, নতুন পরিস্থিতিতে নমনীয় ও সৃজনশীল ভঙ্গিতে সাড়া দেবার শিক্ষা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই সংক্রান্ত ধারণার প্রাক্-বিন্যাস, অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ও সামাজিক পরিবর্তনের জন্য কাজ করা এবং সেই সঙ্গে নিজেরও কৃতি এতে যুক্ত করা। আমাদের গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের পদ্ধতিকে শক্তিশালী করার একটি উপায় হিসাবে শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে তার নিজস্ব ভঙ্গিমায় কাজ করতে হলে প্রথম প্রজন্মের স্কুলপড়ুয়াদের উপস্থিতিকে অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা সংবিধানের সংশোধনীতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত হওয়ায় তাদের ইস্কুলে পড়তে আনা বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে। বর্ণ, লিঙ্গ ও সক্ষমতা নির্বিশেষে প্রতিটি শিশু যেন তাদের শিক্ষায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা এবং এরই সঙ্গে সমস্ত স্কুলের পরিবেশের আনুকুল্য পায়। এই দায়িত্বও সংবিধান সংশোধনীতে আমাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও মানের গভীর বিকৃতি এই সত্যের সাক্ষ্য বহন করে যে, শিশুদের ওপর শিক্ষা একটি বিশাল দুর্বহ বোঝা আর পীড়নের মতো চেপে বসেছে। এই বিকৃতি সংশোধন করতে বর্তমান NCF পাঠক্রম বিকাশের চারটি নির্দেশক নীতির প্রস্তাব করছে: (ক) বিদ্যালয়ের বাইরে যে বিস্তৃত জীবন জ্ঞানকে তার সঙ্গে যুক্ত করা; (খ) যান্ত্রিকভাবে মুখস্থ করার পদ্ধতি থেকে শিক্ষার দিকবদল নিশ্চিত করা; (গ) পাঠক্রমকে এমনভাবে সমৃদ্ধ করা যাতে পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও তা বিচরণ করতে পারে; (ঘ) পরীক্ষাগুলিকে আরো নমনীয় করে তোলা ও শ্রেণীকক্ষের জীবনের সঙ্গে একে সংযুক্ত করা।

প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে আমাদের এই সমস্ত বহুমুখী উদ্যোগ অতি-শৈশবের সযত্ন পরিচর্যা ও শিক্ষার তাৎপর্যময় বিস্তৃতি এবং পেশাদারি পরিকল্পনার ওপর প্রভূত পরিমাণে নির্ভরশীল। বস্তুত, ECCE-র বহুল পরিচিত নীতির ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন করা প্রয়োজন। জ্ঞানের প্রকৃতি এবং শিশুদের শিক্ষালাভের নিজস্ব ধরনধারণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত রয়েছে। এর সাহায্যে যে তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে উঠেছে তারই মূল্যায়নে তৃতীয় অধ্যায়ে পাঠক্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানান সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষাদানের লক্ষ্য হওয়া উচিত শিশুদের স্বাভাবিক ইচ্ছা ও শেখার ধরনকে আরো বাড়িয়ে তোলা। তথ্য থেকে জ্ঞানকে স্পষ্টই পৃথক করা প্রয়োজন এবং শিক্ষাদানকে নিছকই মুখস্থ করতে শেখানো কিংবা তথ্য সরবরাহ করার প্রক্রিয়া হিসেবে না দেখে একে একটি পুরোপুরি পেশাদারি কাজ হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই পৃথিবীর প্রকৃত অর্থ সন্ধানে শিশুর উদ্যোগই হল সক্রিয়তার অন্তরের কথা, তার হৃদয়। কাজেই প্রতিটি সম্পদকে এমনভাবে ভাগবাটোয়ারা করতে হবে যাতে শিশুরা নিজেদের ভাবনা প্রকাশ করতে পারে, সমস্ত বিষয় নিজের মত করে কাজে লাগাতে পারে। তাদের প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের গভীর পর্যবেক্ষণে এভাবেই তারা স্বাস্থ্যে সম্পদে ভরপুর হয়ে বেড়ে ওঠে। শিশুর শ্রেণীকক্ষের অভিজ্ঞতা যদি এমনভাবে সংগঠিত করতে হয় যাতে শিশু নিজেই নিজের জ্ঞানের আকর গড়ে তুলতে পারে, তবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সেইমতো সুবিন্যস্ত সংস্কার প্রয়োজন (পঞ্চম অধ্যায়)। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের বিষয়গুলি কিংবা পাঠক্রমের ক্ষেত্রগুলির দার্শনিক ধারণার ভিত্তি নতুন করে গড়ে তুলতে হবে (তৃতীয় অধ্যায়) এবং বিদ্যালয়ের চারিত্রিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে, সম্পদের সংস্থান করতে হবে (চতুর্থ অধ্যায়)।

বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্রগুলি যেমন ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞান, সবকটি ক্ষেত্রেই কিছু তাৎপর্যময় পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল শিক্ষাকে আরো বেশি বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও ভবিষ্যতে প্রয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং আজ প্রতিদিন শিশুদের যে পীড়নের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হচ্ছে সেই দুঃসহ পীড়নকে তাদের শিক্ষাজীবন থেকে অপনোদন করা। বিষয়গুলির সীমারেখাকে আরো নরম করার সুপারিশ করেছে NCF, যাতে শিশুরা সংহত জ্ঞানের এবং কোনকিছু বুঝতে পারার মধ্যে যে আনন্দ তার আস্বাদ লাভ করতে পারে। এরই সঙ্গে রয়েছে, পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য বস্তুর বিচিত্রগামিতা, যার ফলে আঞ্চলিক স্তরের নানান জানবার বিষয় এবং পরম্পরাগত দক্ষতা অনুশীলন করা যায়। বিদ্যালয়ের উদ্দীপনাময় পরিবেশ যেন একেবারেই শিশুর বাড়ি এবং তার অঞ্চলের পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও সাযুজ্যপূর্ণ হয়—এই দুটি বিষয়েও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ভাষার ক্ষেত্রে, দ্বিভাষা সূত্র প্রবর্তনের নয়া উদ্যোগ নেবার প্রস্তাবনা করা হয়েছে। এর সঙ্গে শিশুর যা মাতৃভাষা সেটি বিভিন্ন উপজাতি-ভাষাও হতে পারে, সেই মাতৃভাষাকে নির্দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে স্বীকার করে তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। ভারতীয় সমাজের বহুভাষিক চরিত্রকে এমন একটি সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, যার উপস্থিতিতে প্রতিটি শিশুকে ইংরেজি সহ বহুভাষিক ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা যাবে। একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে ভাষার গভীর বহুমুখী চর্চার ভিত্তিতে যদি শিক্ষাদান পদ্ধতি গড়ে তোলা যায় তবেই এ কাজ সম্ভব এবং এটিই পাঠক্রম পরিকল্পনার ভিত্তি হওয়া উচিত। বিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য প্রতিটি শিশুর মনে একটি শক্তপোক্ত ভিত্তি গঠনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় সমস্ত শ্রেণীতে পঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

গণিত শিক্ষা অবশ্যই শিশুর মানসিক সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে। এর সাহায্যে সে যুক্তি বিন্যাসে চিন্তা করতে পারে, বিমূর্ত কোনো ভাবনাকে মনের মধ্যে চিত্রায়িত করে তাকে ব্যবহার করতে পারে, এবং বিভিন্ন সমস্যার সূত্রায়ন ও সমাধান করতে পারে। প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ গণিত শিক্ষাদানের মাধ্যমে, শিশুকে তার অভিজ্ঞতাসঞ্জাত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করে, গণিত শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের যে ক্ষেত্র, তারই বিপুল বিস্তৃতিতে শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে প্রসারিত করা সম্ভব। গণিতে সফল হওয়া প্রতিটি শিশুর অধিকার — এই ভাবে বিষয়টিকে দেখা উচিত। কেননা সুযোগের নানান ক্ষেত্র প্রসারিত করতে এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে একে যুক্ত করতে এই সাফল্য আবশ্যিক। কম্পিউটরের হার্ডওয়ার ও সফ্টওয়ার তৈরি করে প্রতিটি বিদ্যালয়ের সঙ্গে তার সংযোগ স্থাপনের কাজে পরিকাঠামোগত যে অদলবদল প্রয়োজন তার মুখোমুখি হয়ে এ কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

বিজ্ঞান-শিক্ষা পদ্ধতিকে একেবারে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন যাতে শিশুরা প্রতিদিনকার জীবনে পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণে সক্ষম হয়। প্রতিটি বিষয়ে বহিরঙ্গন কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয়তাকে আরো ব্যাপক স্তরে বিস্তৃত করে পরিবেশ সচেতনতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এই সমস্ত কর্মপরিকল্পনা থেকে প্রবাহিত তথ্য এবং বোধের কয়েকটি, ভারতের পরিবেশ বিষয়ে স্বচ্ছ ও সাধারণের আয়ত্ত্বাধীন যেসব তথ্যসমূহ আছে পরবর্তীকালে সবচেয়ে মূল্যবান শিক্ষামূলক সম্পদ হয়ে উঠতে পারে, বিশদ ব্যাখ্যায় সেগুলি প্রভূত অবদান রাখতে পারে। সুপরিকল্পিত হলে, জ্ঞান উদ্ভাবনের পথে এইসব ছাত্র/ছাত্রীদের অনেকেই নতুন বিষয়ে আগ্রহী। সমগ্র দেশ এমনকি দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে আবিষ্কারের শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস বা এই জাতীয় সামাজিক আন্দোলনের কথা চিন্তা করা উচিত।

সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে NCF-র প্রস্তাবনায় কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষকে চিহ্নিতকরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে এবং এরই সঙ্গে কয়েকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভাবনার বিষয় যেমন জল ইত্যাদি, এই সব ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপের কথাও বলা হয়েছে। সমাজের প্রান্তিক বোধ বা ধারণার ভিত্তিতে সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ নির্ধারণের সুপারিশ করে একটা দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। লিঙ্গ অনপেক্ষ ন্যায় , দলিত এবং আদিবাসী সংক্রান্ত বিষয়ে সংবেদনশীলতা এবং সংখ্যালঘুর প্রতি সংবেদী মনোভাব— সমাজ বিজ্ঞানের সবকটি ক্ষেত্রে এইসব বিষয় জানাতেই হবে। পৌরবিজ্ঞানকে রাষ্ট্র-শাসন বিজ্ঞানে ঢেলে সাজাতে হবে এবং শিশুর অতীত ও বর্তমান পৌর পরিচয়ের বোধ গঠনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তাৎপর্যের রূপকারী প্রভাব স্বীকার করতেই হবে।

পাঠক্রমে আরো চারটি ক্ষেত্রের প্রতি NCF আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে : কাজ, শিল্প ও ঐতিহ্যবাহী শিল্প, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা এবং শান্তি। কাজের প্রসঙ্গে বলা যায়, কয়েকটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকেই শিক্ষাকে বাস্তবে কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এই সব কাজ এমন হবে যাতে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কাজই জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়, এবং শিশুর মনে নানান ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রস্ফুটিত হয় যেমন, আত্মবিশ্বাস, সৃজনশীলতা, সহযোগিতা। জ্ঞান ও সৃজনশীলতার নানান নতুন নতুন আঙ্গিকও এতে উৎসাহিত হয়। বড় হয়ে ওঠার পর উচ্চশিক্ষাস্তরে, বিদ্যালয় বহিস্থ কর্মসম্পদকে প্রথাবদ্ধ স্বীকৃতিদানের জন্য পরিকল্পনার গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। এর ফলে যে সব শিক্ষার্থী জীবিকা-ভিত্তিক-শিক্ষা নির্বাচন করেছে তারা উপকৃত হবে। বিদ্যালয় বহিস্থ এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি কর্মশালার ব্যবস্থা করতে পারে, যেখানে শিশুরা যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে হাতে কলমে কাজ করতে পারবে। আর একাজের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে উপযুক্ত করে তুলতে হবে। চারুশিল্পের স্থান নির্ণায়ক মানচিত্র গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। এর সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলগুলিকে সনাক্ত করা যেখানে স্থানীয় চারুশিল্পীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে শিশুদের জন্য নানা চারুশিল্প আঙ্গিকের ব্যবহারিক শিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

সঙ্গীত, নৃত্য, দৃশ্যকলা এবং থিয়েটার—এই চারটি প্রধান ক্ষেত্রে বিস্তৃত করার সুপারিশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্দেশ নয় পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও বাদানুবাদের প্রক্রিয়াকেই গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা একজন মানুষের মনে নান্দনিক এবং ব্যক্তিগত সচেতনতা সঞ্চার এবং যে কোনো একটি শিল্প আঙ্গিকে নিজেকে প্রকাশ করার সক্ষমতা—এই দুটি ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করাই শিল্পকলা শিক্ষার উদ্দেশ্য। ভারতের পরম্পরাসঞ্জাত শিল্পগুলিকে, অর্থনৈতিক এবং

নান্দনিক উভয়মূল্যেই, বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ও সম্পর্কিত করে তাদের যথাবিহিত স্বীকৃতি দিতে হবে।

বিদ্যালয়ে শিশুর সাফল্য তার পুষ্টি এবং সুপরিকল্পিত শারীরিক ক্রিয়া-কর্মসূচীর উপর নির্ভরশীল। অতএব আমাদের সামর্থ্য এবং বিদ্যালয়ের সময়সূচীকে এমনভাবে বিভাজিত ও বিস্তৃত করতে হবে যাতে দ্বিপ্রাহরিক-আহার সংক্রান্ত কর্মসূচীকে শক্তিশালী করা যায়। প্রাক-বিদ্যালয় স্তর থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকালেও স্বাস্থ্য এবং শারীরিক শিক্ষা কর্মসূচীতে যাতে ছেলেদের মতো মেয়েদের প্রতি সমান মনোযোগ দেওয়া হয় সেটি নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন।

বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে অসহিষ্ণুতার প্রবণতা ক্রমাগত মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, যে কোনো মতবিরোধ সমাধানের উপায় হিসাবে হিংসার পথ বেছে নেওয়া হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় বিকাশের প্রাক-শর্ত হিসাবে এবং একটি বোধগম্য মূল্যবোধের ছকে আজকের প্রাসঙ্গিকতা সহ সমাজের একপ্রকার মানসিক অবস্থা বা মেজাজ হিসাবে শান্তি-র ধারণা সঞ্চারের প্রস্তাব করা হয়েছে। সমস্ত বিষয়ে এবং সমস্ত স্তরে যথাবিহিত কর্মপ্রক্রিয়া এবং বিবেচনাপ্রসূত বিষয় নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক ও ন্যায় সংগত সংস্কৃতির মধ্যে শিশুর সমাজের একজন হয়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া তার জন্য শান্তি-বিষয়ক শিক্ষার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে। পাঠচর্চার একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র হিসাবে শান্তি বিষয়ক শিক্ষাকে শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত পাঠ ক্রমের অন্তর্ভুক্ত করায় সুপারিশও করা হয়েছে সেকারণে।

বিদ্যালয়ের চারিত্রিক গঠনকাঠামো পাঠক্রমের একটি মাত্রা হিসাবে আলোচিত হয়েছে। কেননা বিদ্যালয়ে সফল হবার জন্য যে কর্মনীতি ও লক্ষ্য প্রয়োজন, এই কাঠামোই সেই অভিমুখে শিশুর প্রাক-অনুরাগ সঞ্চারিত করতে পারে। আমাদের একটি মজুত ভাণ্ডার হিসাবে এই কাজে বিদ্যালয়ের সময়সীমা বিষয়ে নমনীয়তার পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে হবে। নানা ধরনের পাঠক্রম, যেমন সুপরিকল্পিত কর্মকাণ্ড (project work) এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্যময় স্থানগুলি দেখার ব্যবস্থা, এদের জন্য বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের নানান সময়সীমার প্রয়োজন হয়। সময়ের এই ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য স্থানীয়ভাবে নানান পরিকল্পনা গ্রহণের এবং বিদ্যালয়ের দিনপঞ্জিকা ও সময় সারণিতে আরো নমনীয় পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষালাভের আরো বিস্তৃত ভাণ্ডার, বিশেষ ভাবে বই এবং পাঠসম্পর্কিত নানান সামগ্রী সবই যাতে আঞ্চলিক ভাষায় অধিগম্য হয়, বিদ্যালয় ও শিক্ষকের নিজস্ব পাঠাগারে যাতে সেগুলি সুলভে পাওয়া যায়, আর প্রচারসর্বস্ব প্রযুক্তির চেয়ে পারস্পরিক মতবিনিময়ে বাদানুবাদের স্বাধীনতা যাতে তাদের আয়ত্তাধীন হয়— সেইমতো উদ্যোগের প্রয়োজন। এর ফলে শিশুদের সামনে শিক্ষার আরো বিপুল ক্ষেত্র উন্মোচিত করার প্রস্তুতি চালানো যাবে। শিশুদের বাঁধাধরা প্রবণতার মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি ধারায় আটকে রাখা এবং বিশেষত গ্রামীন এলাকায় শিশুদের সামনে কয়েকটি সীমাবদ্ধ সুযোগ উপস্থাপিত করার এই প্রক্রিয়াকে NFC নিরুৎসাহিত ও বর্জনীয় মনে করে। এরই বিপরীতে মাধ্যমিক শিক্ষার উচ্চতর স্তরে পছন্দসই নির্বাচনের বহুমুখীনতা ও সহজ-পরিবর্তনশীলতার ওপর NFC বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

পর্যায়ক্রমে সুসংবদ্ধ সংস্কারের বিষয়ে, এই দলিলে গ্রামীণ দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন গুণাবলী এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় হিসাবে গোষ্ঠীবদ্ধ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার আরো নির্দিষ্ট ও সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের জন্য পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার কাজটিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের নানান গুণাবলীর বিকাশের জন্য বিদ্যালয় স্তরেই পাঠসংক্রান্ত পরিকল্পনা ও নেতৃত্বের শিক্ষা আবশ্যিক। আর ব্লক স্তরে ও ছোট ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে নানান ভূমিকার পরিকল্পিত বিভিন্নতা প্রয়োজন। শিক্ষকদের শিক্ষাক্রমে, চট্টোপাধ্যায় কমিশনের (১৯৮৪) সুপারিশ অনুযায়ী পেশাগত নিয়মাবলীকে হাল্কাচালে গ্রহণ করার যে বর্তমান প্রবণতা, তার বিপরীতমুখী দিকবদলের জন্য বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। প্রাক্-চাকুরি শিক্ষণ কর্মসূচী আরো সুসংহত ও দীর্ঘ হওয়া দরকার। এর মধ্যে শিশুদের পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট সুযোগ অবশ্যই থাকবে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষানবিশ হিসাবে বিবিধ বিদ্যা-শিক্ষাদানের বিভিন্ন তত্ত্বের সঙ্গে হাতে-কলমে অভ্যাসের সমন্বয় সাধন করতে হবে।

নতুন করে পাঠক্রম প্রস্তুতির কাজে এবং শিশুরা, বিশেষ করে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়ার দল এবং তাদের বাবা মা-র ওপর আজ যে মানসিক চাপ ক্রমবর্ধমান সমস্যা হিসাবে প্রতিভাত, তার সমাধানের জন্য সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা নিতে হবে। এটি শিক্ষা সংক্রান্ত সংস্কারের সবচেয়ে জরুরি ব্যবস্থা। এছাড়া আরো অনেক নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেবার কথা বলা

হয়েছে; যেমন প্রশ্নপত্রের চালু কাঠামোর পরিবর্তন যাতে বিবর্তনের ভিত্তি হিসাবে যান্ত্রিক মুখস্থের স্থান দখল করে নেয় যৌক্তিক এবং সৃজনশীল ক্ষমতা; স্বচ্ছতা এবং আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নকে উৎসাহ দেবার জন্য শ্রেণীকক্ষের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে পরীক্ষাকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দেওয়া।

প্রাক-বোর্ড পরীক্ষাগুলির চাপ বিপরীতমুখী করতে হবে আর এমন কর্মসূচীর প্রবর্তন করতে হবে যাতে বিভিন্ন স্তরের অংশগ্রহণের বিষয়ে শিক্ষার্থী পছন্দসই নির্বাচনে সক্ষম হয়। এর ফলে 'পাস' এবং 'ফেল' এই দুই শ্রেণীতে পড়ুয়াদের সাধারণীকৃত বিভাজনের বর্তমান ব্যবস্থা অতিক্রম করতে উৎসাহিত করা যাবে।

পরিশেষে, এই দলিল বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা এবং বেসরকারী সংস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য নাগরিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অংশীদারিত্বের সুপারিশ করছে। উদ্ভাবনী পরীক্ষাসমূহ যেগুলো ইতিমধ্যেই সহজতর সেগুলিকে শিক্ষার প্রধান ধারার অঙ্গীভূত করা উচিত, প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বিক শিক্ষায় পরিণত করতে UEC প্রতিনিয়ত যে ধারায় সম্মুখীন হয়; সে বিষয়ে সচেতন হয়ে রাষ্ট্র ও শিশুদের নানান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বহুবিস্তৃত সহযোগিতার একটি ক্ষেত্র অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে।

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জাতীয় পাঠক্রম কাঠামো (NCF) ২০০৫ তার বর্তমান রূপ ও আকারের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিত, অধ্যক্ষ, শিক্ষাক/শিক্ষিকা, মাতাপিতা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি NCERT-র শিক্ষক / শিক্ষিকা এবং বিভিন্ন স্তরের আরো অনেক দায়ভাগ বহনকারীর একগুচ্ছ সুচিন্তিত অভিমতে র মাধ্যমে পাওয়া একগুচ্ছ চিন্তনের কাছে আমরা ঋণী। বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষাসচিবগণ এবং SCERT-র আধিকারিকগণ এবং RIE-তে আয়োজিত আঞ্চলিক সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণের থেকে তাৎপর্যমন্ডিত অবদান গ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহ এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ ও সমস্ত দেশব্যাপী গ্রামীণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক / শিক্ষিকাগণ যে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার ভাগীদার সেগুলিই আমাদের চিন্তনকে তীক্ষ্ণ করতে সাহায্য করেছে। হাজার হাজার মানুষ-ছাত্র/ছাত্রী, মাতা পিতা এবং বৃহদার্থে জনসাধারণ নিয়মিত ডাকযোগে এবং বৈদ্যুতিন যন্ত্রে পাওয়া বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি র মানচিত্র নির্মাণে আমাদের সাহায্য করেছে।

NCERT-র নিজস্ব অফিস এবং উচ্চস্তরীয় যেমন, কার্যনির্বাহী কমিটি, সাধারণ পরিষদ এবং শিক্ষার কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্যগণের গঠনমূলক প্রস্তাবনা ও বোধসঞ্জাত মতামতের উদার প্রবাহে এই দলিল প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলিকে জুলাই-আগস্ট ২০০৫, সময়সীমার মধ্যে খসড়া NCE বিষয়ে আলোচনার জন্য কর্মশিবির সংগঠিত করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল এবং কয়েকটি রাজ্য থেকে পাওয়া প্রতিবেদন ও মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ইত্যাদি সরকারের সহযোগে আজিম প্রেমজি ফাউন্ডেশন যে সেমিনার সংগঠিত করেছিল তার প্রতিবেদনগুলির জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ (ত্রিচুর) এবং অল ইন্ডিয়া পিপলস সায়েন্স নেটওয়ার্ক (ত্রিচুর), ভারত জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতি (নতুন দিল্লী) SIEMAT (পাটনা) দি কনসার্নড ফর ওয়ার্কিং চিল্ড্রেন, (বাঙ্গালোর) ট্রাস্ট ফর এডুকেশনাল ইনটিগ্রেটেড ডেভলপমেন্ট (রাঁচি), কোশিশ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট (পাটনা) এবং দিগন্তর (জয়পুর)— এরাও এবিষয়ে আলাপ-আলোচনার আয়োজন করেছে। দি কাউন্সিল ফর ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিনেশন (নতুন দিল্লী), সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশান (নতুন দিল্লী), বোর্ডস অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন অফ স্টেটস,, ভারতের কাউন্সিল অফ বোর্ডস অফ স্কুল এডুকেশনান (COBSE) (নতুন দিল্লী) আমাদের ধারণাগুলি স্ফটিক-কঠিন ও স্বচ্ছ করে তুলতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন। সভা আয়োজনের জন্য যাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য তারা হল— একাডেমিক স্টাফ কলেজ অফ ইন্ডিয়া, হায়দ্রাবাদ; হোমিভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশান, মুম্বাই; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা; আলি জাফর জঙ্গ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড, মুম্বাই; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক কোঅপারেশান এ্যান্ড চাইল্ড ডেভলপমেন্ট, গৌহাটি; স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশন্যাল রিসার্চ এ্যান্ড ট্রেনিং, তিরুভান্থাপুরম, সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ইংলিশ এ্যান্ড ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস, মহিশূর; ন্যাশানাল ইনস্টটিউট অফ ডিজাইন, আমেদাবাদ; শ্যাম সমিতি, লোনাওয়ালা, পুনে; নর্থ ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি, শিলং; DSERT, বাঙ্গালোর; IUCAA, পুনে; সেন্টার ফর এনভারানমেন্ট এডুকেশান, আমেদাবাদ এবং বিজয় রিসার্চ কলেজ, বাঙ্গালোর।

সংবিধানের অষ্টম তপশিলের অন্তর্গত ভাষাসমূহে NCF-২০০৫ অনূদিত হয়েছে। ড. ডি. বারকাটাকি (অসমীয়া), শ্রী দেবাশিস সেনগুপ্ত (বাংলা), ড. অনিল বোড়ো (বোড়ো), অধ্যাপক বীণা গুপ্তা (ডোগরি), শ্রী কল্যাণ মানকোরি (গুজরাটি), শ্রীযুক্তা প্রগতি সাক্সেনা এবং শ্রী প্রভাত রঞ্জন (হিন্দি), শ্রী এস. এস. যাদুরাজন (কন্নড়), ড. সোমনাথ রায়না (কাশ্মিরী), শ্রী দামোদর ঘানেকর (কোঙ্কনি), ড. নিলম বা (মৈথিলী), শ্রী কে. কে. কৃষ্ণ কুমার (মালিয়ালম) , শ্রী টি সুরজিৎ সিং খোকচোম (মণিপুরী), ড. দত্ত দেশাই (মারাঠী), ড. খগেন শর্মা (নেপালী), ড. মদনমোহন

প্রধান (ওড়িয়া), শ্রী রঞ্জিত সিং বাঙ্গিলা (পাঞ্জাবী), শ্রী দত্ত ভূষণ পেলিকান (সংস্কৃত), শ্রী সুবোধ হাঁসদা (সাঁওতালি), ড. কে. পি. লেখওয়ানি (সিন্ধি), শ্রী এ. বল্লিনয়াগাম (তামিল), শ্রী ভি, বালসুব্রহ্মণ্য (তেলেগু) এবং ড. নাজির হুসেন (উর্দু)— এদের বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্ত। হিন্দি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার জন্য শ্রী রাঘবেন্দ্র,শ্রীযুক্তা ঋতু, ড. অপূর্বানন্দ এবং শ্রীযুক্তা লতিকা গুপ্ত, ড. মাধবী কমার, মঞ্জুলা মাথুর এবং শ্রীযুক্তা ইন্দু কুমার; এবং পাণ্ডুলিপির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার জন্য শ্রী হর্ষ শেঠি এবং শ্রীযুক্তা মালিনী সুদ এবং পাভুলিপির অংশবিশেষ পাঠ করে সহায়ক পরামর্শের জন্য শ্রী নাসিরুদ্দীন খান ও ড. সন্ধ্যা সাহু এঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা নথিবদ্ধ করা হল। এছাড়া দলিলটির নকশা এবং বিন্যাসের জন্য শ্রীযুক্ত শ্বেতা রাও, প্রচ্ছদ ও চিত্রের জন্য শ্রী রবিন ব্যানার্জী এবং অন্যান্য চিত্রের জন্য CIET-র শ্রী আর. সি. দাস. আর NCERT-এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে NCF-এর প্রচারে সাহায্য করার জন্য আমাদের DCETA-র সহকর্মীবৃন্দ এবং NCF তাঁর বর্তমান রূপে প্রকাশিত হওয়ার জন্য মুদ্রণ বিভাগের প্রতিও আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। শ্রী আর কে লক্ষ্মণ তাঁর অঙ্কিত দুটি কার্টুনচিত্র পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দেওয়ায় আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

এই তালিকা কোনোভাবেই শেষ হবে না এবং এই দলিল রচনায় যাঁদের অবদান আছে তাঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

# জাতীয় পরিচালন সমিতির সদস্যবর্গ

১) অধ্যাপক যশ পাল (সভাপতি)
প্রাক্তন সভাপতি
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
১১বি, সুপার ডিলাক্স ফ্ল্যাট
সেক্টর ১৫ এ নয়ডা
উত্তরপ্রদেশ

২) আচার্য্য রামমূর্তি
সভাপতি
শ্রমভারতী, খাদিগ্রাম
পোস্টঃ খাদিগ্রাম
জেলা জামুই- ৮১১৩১৩
বিহার

৩) ড. শৈলেশ এ. শিরালী
অধ্যক্ষ
অম্বর উপত্যকা আবাসিক বিদ্যালয়
কে. এম. রোড, মুগথিহাল্লি
চিকমাগালুর—৫৭৭১০১
কর্ণাটক

৪) শ্রী রোহিত ধানকর
আধিকারিক, দিগন্তর, টৌডি রামজানিপুরা
খোনাগোরিয়ান রোড
পোস্টঃ জগতপুরা
জয়পুর-৩০২০২৫
রাজস্থান

৫) শ্রী পরমেশ আচার্য্য
প্রাক্তন সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা কমিশন
এল/এফ ৯, কুষ্ঠিয়া রোড
সরকারী আবাসন এষ্টেট
অবন্তিকা আবাসন
কলকাতা-৭০০০৩৯
পশ্চিমবঙ্গ

৬) ড. মীনা স্বামীনাথন
সাম্মানিক আধিকারিক
উত্তরাদেবী কেন্দ্র, মানবী ও উন্নয়ন
এম.এস.স্বামীনাথন গবেষণা কেন্দ্র
তৃতীয় ক্রস রোড
তারামণি ইনস্টিটিউশন এরিয়া
চেন্নাই-৬০০১১৩
তামিলনাড়ু

৭) ড. পদ্ম এম.ষড়ঙ্গপাণি
সহযোগী সদস্য
ন্যাশাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্স স্টাডিজ
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স ক্যাম্পাস
ব্যাঙ্গালোর ৫৬০০১২, কর্ণাটক

৮) অধ্যাপক আর.রামানুজন
ইনস্টিটিউট অফ ম্যাথামেটিকাল সাইন্স
চতুর্থ ক্রশ, সিআইটি ক্যাম্পাস
তারামণি, চেন্নাই ৬০০১১৩
তামিলনাড়ু

৯) অধ্যাপক অনিল সদগোপাল
শিক্ষা বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
ই-৮/২৯এ, সাকার নগর
ভুপাল-৪৬২০৩৯
মধ্যপ্রদেশ

১০) অধ্যাপক জি. রবীন্দ্র
অধ্যক্ষ, রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন
মানসগঙ্গোত্রী, মহিশূর ৫৭০০০৬
কর্ণাটক

১১) অধ্যাপক. ড. দময়ন্তি জে.মোদি
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষা বিভাগ
ভাব নগর বিশ্ববিদ্যালয়
২২০৯,এ/২, আন্ধেরী
হিল ড্রাইভ, ভাব নগর ৩৬৪০০২
গুজরাট

১২) শ্রীমতি সুনিলা মসি
শিক্ষক, মিএা জি এইচ এস স্কুল
পোস্টঃ সোহাগপুর,
জেলাঃ হোসাঙ্গাবাদ ৪৬১৭৭১
মধ্যপ্রদেশ

১৩) শ্রীমতি হ্রাস কুমারী
প্রধান শিক্ষিকা,
হর্ষ এক্সপেরিমেন্টাল বেসিক স্কুল
ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়,
দিল্লী ১১১০০৭

১৪) শ্রী ত্রিলোচন দাস গর্গ
অধ্যক্ষ, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়
ফরিদকোট ক্যান্ট
পাঞ্জাব

১৫) অধ্যাপক. অরবিন্দ কুমার
কেন্দ্রীয় পরিচালক
হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন
ভি.এন.পুরাও মার্গ
মানখুর্দ, মুম্বাই ৪০০০৮৮
মহারাষ্ট্র

১৬) অধ্যাপক গোপাল গুরু
সেন্টার ফর পলেটিক্যাল স্ট্যাডিজ
স্কুল অফ সোসাল সায়েন্স
জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়
নিউ দিল্লী ১১০০৬৭

১৭) ড. রামচন্দ্র গুহ
২২ এ, ব্রুটন রোড
ব্যাঙ্গালোর ৫৬০০২৫
কর্ণাটক

১৮) ড. এ.বি.ডাবলা
অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান
সমাজতত্ত্ব ও সমাজসেবা বিভাগ
কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়
শ্রীনগর-১৯০০০৬
জম্মু ও কাশ্মীর

১৯) শ্রী অশোক বাজপেয়ী
প্রাক্তন উপাচার্য
মহাত্মা গান্ধী আন্তর্জাতিক
হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয়
সি ৬০, অনুপম এ্যাপার্টমেন্ট
বি ১৩, বসুন্ধরা এনক্লেভ
দিল্লী—১১০০৯৬

২০) অধ্যাপক ভালসন থাম্পু
সেন্ট স্টিফেন হাসপাতাল
জি-৩, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্লক
তিশ হাজারি দিল্লী—১১০০৫৪

২১) অধ্যাপক. শান্তা সিনহা
পরিচালক, এম.ভেঙ্কটরঙ্গিয়া ফাউন্ডেশন
ওয়েষ্ট মার্দপল্লী
সেকেন্দ্রেবাদ—৫০০০২৬
অন্ধ্রপ্রদেশ

২২) ড. বিজয়া মূলে
ফাউন্ডার প্রিন্সিপাল সিইটি এনসিইআরটি
প্রেসিডেন্ট, ইন্ডিয়া ডক্যুমেনটারি
প্রোডিউসার অ্যাসোসিয়েশান
বি.৪২, ফ্রেন্ডস্ কলোনি ওয়েষ্ট
নিউ দিল্লী—১১০০৬৫

২৩) অধ্যাপক মৃণাল মিরি
উপাচার্য
উত্তর পূর্ব পার্বত্য বিশ্ববিদ্যালয়
পোঃ এন. ই.এইচ.ইউ ক্যাম্পাস
ম্যাকনরো উমসিং
শিলং —৭৯৩০২২
মেঘালয়

২৪) অধ্যাপিকা তালাত আজিজ
আই.এ.এস.ই ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশন
জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া
জামিয়া নগর, নতুন দিল্লী—১১০০২৫

২৫) অধ্যাপিকা সবিতা সিন্‌হা
প্রধান, ডি ই এস্ এস্ এইচ,
এন সি ই আর টি
শ্রী অরবিন্দ মার্গ
নতুন দিল্লী—১১০০১৬

২৬) অধ্যাপক কে. কে.বশিষ্ঠ
প্রধান, ডি ই ই, এন সি ই আর টি
শ্রী অরবিন্দ মার্গ
নতুন দিল্লী—১১০০১৬

২৭) ড. সন্ধ্যা প্রাঞ্জপে
ডি ই ই, এন সি ই আর টি
শ্রী অরবিন্দ মার্গ
নতুন দিল্লী—১১০০১৬

২৮) অধ্যাপক সি. এস্. নাগারাজু
প্রধান, ডি ই আর পি পি,এন সি ই আর টি
শ্রী অরবিন্দ মার্গ
নতুন দিল্লী—১১০০১৬

২৯) ড. জ্যোৎস্না তিওয়ারী
ডি ই এস্ এস্ এইচ, এন সি ই আর টি
শ্রী অরবিন্দ মার্গ
নতুন দিল্লী—১১০০১৬

৩০) অধ্যাপক এম, চন্দ্রা
প্রধান, ডি ই এস্ এম, এন সি ই আর টি
শ্রী অরবিন্দ মার্গ
নতুন দিল্লী—১১০০১৬

৩১) ড. অনিতা জুলকা
রীডার, ডি ই জি এস, এন সি ই আর টি
শ্রী অরবিন্দ মার্গ
নতুন দিল্লী—১১০০১৬

৩২) অধ্যাপক কৃষ্ণ কুমার
আধিকারিক, এন সি ই আর টি
শ্রী অরবিন্দ মার্গ
নতুন দিল্লী—১১০০১৬

৩৩) শ্রীমতী অনিতা কাওল
সচিব, এন সি ই আর টি
শ্রী অরবিন্দ মার্গ
নতুন দিল্লী—১১০০১৬

৩৪) শ্রী অশোক গাঙ্গুলী
চেয়ারম্যান
সেন্ট্রাল বোর্ড অফ্ সেকেন্ডারী এডুকেশন
শিক্ষাকেন্দ্র
২, কমুইনিটি সেন্টার
প্রীত বিহার, দিল্লী—১১০০৯২

৩৫) অধ্যাপক এম.এ.কাদের (সদস্য সচিব)
প্রধান পাঠক্রম বিভাগ
এন সি ই আর টি
শ্রী অরবিন্দ মার্গ
নতুন দিল্লী—১১০০১৬

# বিষয় সূচী

'ছেলেবেলায় সামান্য জিনিস থেকে খেলনা তৈরি আর কল্পনা থেকে নিত্যনতুন খেলা আবিষ্কার করার স্বাধীনতা আমার ছিল। আমার আনন্দের পুরোটাই ভাগ করে নিতে পারত খেলার সঙ্গীরা; এমনকি তাদের অংশ নেওয়ার ওপরে নির্ভর করত আমার খেলা সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করা। ছোটবেলার পরম সুখের এরকমই এক দিনে হাতছানি দিল বড়দের বেচাকেনার জগৎ। আমাদের এক বন্ধুকে দেওয়া হল সাহেবি দোকান থেকে কেনা একটা খেলনা; জিনিসটা ছিল নিখুঁত, বড় আশ্চর্যরকম জীবন্ত। সে খেলনাটা নিয়ে গর্বিত হয়ে উঠল আর আমাদের খেলার কথা ভুলে যেতে থাকল; দামি জিনিসটা সে সযত্নে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখত, সেটার একমাত্র অধিকারী হিসেবে নিজেকে মহিমান্বিত বোধ করত, অন্যান্য খেলার সাথীদের স্বল্পদামের খেলনা ছিল বলে নিজেকে সে তাদের তুলনায় শ্রেয় জ্ঞান করত। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে ইতিহাসের আধুনিক ভাষা ব্যবহার করতে পারলে সেই অস্বাভাবিক রকমের নিখুঁত খেলনাটা থাকার জন্য সে নিজেকে আমাদের চেয়ে সভ্য বলে দাবি করত।

উত্তেজনার বশে সে একটা কথা উপলব্ধি করতে পারেনি— সেই মুহূর্তে যে কথাটা তার কাছে নিরর্থক ঠেকেছিল— যে এই প্রলোভন তার খেলার থেকেও অনেক বেশি উৎকৃষ্ট কিছুকে আড়াল করে রেখেছিল, নিজের মধ্যে এক উৎকৃষ্ট শিশুর বিকাশ। খেলাটা তার সম্পদের কথা জানান দিত, কিন্তু তার সৃজনশীল সত্তাকে, খেলার সময়ে শিশুর সরল আনন্দকে, আর খেলার জগতে যারা সঙ্গী তাদের প্রতি তার সাদর আমন্ত্রণকে প্রকাশ করত না।'

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সিভিলাইজেশন এ্যান্ড প্রোগ্রেস' প্রবন্ধ থেকে অনূদিত)

# প্রথম অধ্যায়

## বিষয় ভাবনা

- ১.১. ভূমিকা
- ১.২. ফিরে দেখা
- ১.৩. জাতীয় কার্যসূচি পরিকাঠামো গঠন
- ১.৪. পরিকল্পনা প্রণালী
- ১.৫. গুণগত মান বিস্তার
- ১.৬. শিক্ষার সামাজিক প্রেক্ষিত
- ১.৭ শিক্ষার উদ্দেশ্য

### ১.১. ভূমিকা

স্বাধীন রাষ্ট্র এই ভারতবর্ষ। বর্ণময় ইতিহাসে সমৃদ্ধ এই রাষ্ট্র, বহু জটিল সংস্কৃতি এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সকলের মঙ্গল সাধনে অঙ্গীকারবদ্ধ। ১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষা প্রকল্প সংসদ -এর অনুমোদন পেলে জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম নতুন রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু হয়। দেশের শিশুদের শিক্ষিত করে তোলার দিকে নজর দিতে গিয়ে আমাদের প্রথমেই ভাবতে হবে, শিশুদের শিক্ষিত করার এই বিশাল কর্মকাণ্ডে আমাদের প্রকৃত ভূমিকাটি কী হওয়া উচিত। আমরা শিক্ষার নামে শিশুদের কোন্ শিক্ষা জোগান দিচ্ছি— সেই সম্পর্কে এখন চিন্তা ভাবনার সময় হয়েছে। স্বাধীনতার সময় থেকে যে শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের দেশে চলছে, সেদিকে তাকালে আমাদের যথেষ্ট আশ্বস্ত হওয়ার কথা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী আজ আমাদের দেশে দশ লক্ষ বিদ্যালয়ে ৫৫ লক্ষ শিক্ষককে নিযুক্ত করা হয়েছে ২০২৫ লক্ষ শিশুকে শিক্ষা দান করবার জন্য। প্রায় ৮২ শতাংশ অধিবাসীবৃন্দের এক কিলোমিটারের মধ্যে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এবং তিন কিলোমিটারের মধ্যে একটি করে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে পঁচাত্তর শতাংশ অধিবাসীবৃন্দের প্রয়োজনে। প্রায় প্রতি বছর কমপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ ছাত্র মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় এই পরীক্ষা ব্যবস্থায়। কিন্তু এর পরেও ভারতের ৩৭ শতাংশ মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, প্রায় ৫৩ শতাংশ ছাত্র প্রাথমিক স্তরেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। তাছাড়া জেলা স্তরের বিদ্যালয়গুলির মান সর্বত্র এক নয়। এই সব কারণ ছাড়াও আরও কতগুলি সমস্যা রয়েছে, যা যথেষ্ট উদ্‌বেগের কারণ ঘটায়:— প্রথমত, বিদ্যালয়গুলির অনড় পরিকাঠামো যেকোনো পরিবর্তনের অন্তরায়। দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয় অর্জিত শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব জীবনের যোগহীনতা। তৃতীয়ত, বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের সৃজন ও অন্তর্দৃষ্টি গড়ে তোলার পথে সহায়ক হয় না, চতুর্থত শিক্ষার নামে শিশুদের কাছে যা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে তা ছাত্রছাত্রীর জীবনবোধে অন্য কোনো মাত্রা সংযোজন করে না। পঞ্চমত, শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ার নামে যেভাবে তার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কিত ধারণাকে ছেঁটে ফেলা হচ্ছে, সেই শিক্ষা শিশুর পক্ষে তো বটেই, সমাজ এবং জাতির পক্ষেও ক্ষতিকারক।

শিক্ষার প্রাথমিক শর্ত হল শিশুর সেই জীবনবোধ গড়ে তোলা যা তাকে প্রকৃত মানুষ করে তুলতে সাহায্য করবে এবং অন্যকে সেই জীবনবোধে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করবে। শিক্ষার এই শর্ত আজও আমাদের সমাজজীবনে সমানভাবে সত্য ও প্রযোজ্য। আর কিছু না হোক মানুষের প্রতি মানুষের নির্ভরশীলতার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলেছেন — আমরা এমনই চরম আনন্দ উপলব্ধি করি যখন অন্যের মধ্যে দিয়ে নিজেকে খুঁজে পাই। ঠিক সেইভাবেই বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে বিদ্যালয়ে আসা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই বোধ সঞ্চারিত করতে হবে। সমতার এই বোধের প্রতি আমাদের একনিষ্ঠ দায়বদ্ধতার প্রয়োজন।

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক সমাজকাঠামোয় ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্খায় প্রায়ই দেখা যায় মানুষ তার বস্তুগত লাভালাভের কথা ভেবে শিক্ষার সুযোগকে সীমিত করে দিচ্ছে। এর ফলে মানুষ অসুস্থ প্রতিযোগিতায় শিশুমনে এমন চাপ সৃষ্টি করছে যা তাদের মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে। একের অপরের কাছ থেকে শিক্ষা নেবার যে ইচ্ছা তা ক্রমশ লোপ পাচ্ছে শিশুমন থেকে। শিক্ষাই একমাত্র পথ যা আমাদের মতো এই বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক সমাজে মূল্যবোধ তৈরি করতে সাহায্য করে, শান্তি-মানবিকতাবোধ এবং সহ্যক্ষমতাকে বাড়ায়।

এই তথ্যগুলি শিক্ষা কার্যক্রম নির্মাণে সাহায্য করবে যার দ্বারা বিদ্যালয়গুলি এবং শিক্ষকমণ্ডলী সঠিক পথে শিশুদের শিক্ষাদানে সক্ষম হবেন। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে গিয়ে কার্যপ্রণালীর এই ধারণাটিকে একটি আকার দিতে হবে যা তাদের অভিজ্ঞতাকে স্পষ্ট করবে। এর জন্যে কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে।

ক) শিক্ষার কোন্ উদ্দেশ্যকে আমরা গ্রহণ করতে চাইছি?

খ) এই উদ্দেশ্যগুলি মেটাতে শিক্ষাসম্বন্ধীয় কোন্ কোন্ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যেতে পারে?

গ) এই শিক্ষা সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতাগুলিকে কীভাবে সুসংগঠিত করা সম্ভব?

আন্তর্জাতীয় পাঠক্রম পরিকাঠামো পুনর্বিবেচনা করে ২০০০সালে দেখানো হয়েছে শিশুদের উপর কীভাবে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে পাঠক্রমটি। ১৯৯০ সালের প্রথম দিকে মানবাধিকার কমিশন একটি কমিটি গঠন করেন। তাঁরা এই বিষয়টি খতিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোন যে, শিক্ষাপ্রণালীর গোড়াতে একটা মস্ত বড় গলদ রয়ে গেছে। তাঁরা দেখেছিলেন এই প্রক্রিয়াটির একটা প্রবণতাই হল তথ্যকে জ্ঞান হিসেবে গণ্য করা। চাপহীন শিক্ষা-র যে রিপোর্ট তৈরি হয়, সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয় যতক্ষণ না পরীক্ষা ব্যবস্থার বদল ঘটছে ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষা কখনোই শিশুর কাছে আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে না। পাঠ্য বইয়ের ভিত্তিতে পরীক্ষা দিয়ে শিশুর মেধা নির্ধারণের পদ্ধতিকে সবার আগে বদলানো প্রয়োজন। শিশুকে সব কিছু শেখাতে হবে এই প্রবণতা আসে শিশুর নিজস্ব কল্পনাশক্তির উপর বিশ্বাস না রাখতে পারার থেকেই। পাঠক্রমানুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রত্যেক বছর এবং নতুন নতুন বিষয় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়ে ক্রমশ শিশুদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে এবং শিক্ষা থেকে অর্জিত জ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করবার ক্ষেত্রটি দুর্বল হয়ে পড়ছে। মোটা মোটা পড়ার বই এবং পাঠ্যসূচি প্রমাণ করে এই প্রক্রিয়াটির ব্যর্থতা। কারণ শিশুদের শিশুসুলভ মনটি ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। যাঁরা জ্ঞানকোষ আয়তনের পাঠ্যবই লিখছেন তারা প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মনে করছেন— জ্ঞানের আকর সৃষ্টি করছেন। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর কল্পনাশক্তির কোনো গুরুত্ব নেই, সেকারণে, শিশুকে সব শেখাতে হবে— এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা অযথা চাপ সৃষ্টি করছি শিশুমনে। এই কমিটি, পাঠ্যসূচির ও পাঠ্যবই পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছে। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুরাও প্রতিযোগিতার দৌড়ে সামিল হচ্ছে। এর ফলে শিশুদের শৈশব যাচ্ছে হারিয়ে। শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর কল্পনাশক্তির বৃদ্ধি করতে এই রিপোর্ট কিছু মৌলিক পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছে বিদ্যালয়ের কার্যসূচি ও পরীক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে। কারণ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা শিশুকে কিছু তথ্য মনে রেখে পরীক্ষার খাতায় উগড়ে দিতে বাধ্য করায়। পরীক্ষার জন্য পড়া— এই যান্ত্রিকতার শিকার হয়ে শিশুদের শৈশব যাচ্ছে হারিয়ে। এই প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগ নেই বললেই চলে। এই রিপোর্টটা শিক্ষাপদ্ধতির মূল সমস্যাগুলিকে তুলে ধরেছে এবং চাপহীন শিক্ষা কীভাবে শিশুদের দেওয়া যায় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। এই

রিপোর্টটি শিক্ষক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত আছেন যারা তাদের যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

## ১.২. ফিরে দেখা

মহাত্মা গান্ধী অনুধাবন করেছিলেন যে শিক্ষাই হচ্ছে সেই পথ যার দ্বারা হিংসা-বৈষম্য-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব। 'নয়া তালিম' মানুষের আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মমর্যাদার ওপর জোর দেয়। এর মাধ্যমে অহিংসার বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে ওঠে। গান্ধীজি বলেছিলেন পরিবর্তনশীল সমাজে শিশুদের সমাজমনস্ক করে তুলতে সরাসরি পরিবেশের মধ্যে থেকে, মাতৃভাষার মাধ্যমে কাজ করতে হবে। তিনি এমন এক ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজের প্রতিভা ও ক্ষমতাকে উপলব্ধি করে বিশ্ব পুনর্গঠনে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকেই শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে সচেতনতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল স্বাধীনতার-উত্তরকালে সেই সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পায় জাতীয় পরিষদগুলি অর্থাৎ মধ্যশিক্ষা পরিষদ ( ১৯৫২-৫৩) এবং শিক্ষা পরিষদের ( ১৯৫৪-৫৫) মাধ্যমে। এই দুটি পরিষদই মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাসংক্রান্ত দর্শনকেই বিস্তৃত করেছে। পরিবর্তনশীল এই সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জাতীয় স্তরে সঠিক উন্নতি সাধনে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় সংবিধান ১৯৭৬ অবধি। কর্মপন্থা সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্র শুধুমাত্র পথনির্দেশ দিতে পারে রাজ্যকে। এই রকম পরিস্থিতিতেই জাতীয় শিক্ষা প্রণালী (১৯৬৮) এবং NCERT দ্বারা কর্মসূচি কাঠামো তৈরি হয়। ১৯৭৫ সালে শিক্ষাকে এই তালিকাভুক্ত করে সংগঠিত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সংবিধান সংশোধন করা হয়। ১৯৮৬ সালে প্রথমবার আমাদের দেশে জাতীয় স্তরে একমুখী জাতীয় শিক্ষা মেনে চলা হয়। দেশ জুড়ে বিদ্যালয় কার্যসূচীর মূল উপাদান সম্পর্কে NPE, NCERT(১৯৮৬) কিছু নির্দেশ দেয়। জাতীয় কার্যসূচির কাঠামোকে আরও উন্নত করবার জন্য ও নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পঠন প্রণালী পুনর্বিবেচনা করবার জন্য NPE, NCERT -কে দায়িত্ব দেয়।

NCERT কার্যসূচি সংক্রান্ত কাজ করতে গিয়ে বহু পড়াশোনা ও আলাপ আলোচনা চালায় ১৯৭৫ সাল পরবর্তী পঠন প্রণালী এবং একটি পঠনপাঠন কার্যসূচি তৈরি করে। দেশের বহুমাত্রিক চরিত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জাতীয় সংহতিকে দৃঢ় করতে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে সারা দেশে সমতুল্য করে তুলতে এটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। এই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য জাতীয় কার্যসূচি পরিকাঠামো গঠন করা হয় ১৯৮৮ সালে। এই কার্যসূচিকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে পাঠ্যবইয়ের শিক্ষাপ্রণালীর বহু সংশোধন ও পরিবর্তন করা হয়। এর ফলে শিশুর শৈশবে ও বয়ঃসন্ধি কালে শারীরিক ও মানসিক চাপ বেড়ে যায়। এই বিষয়টিকেও সভাপতির পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযশপাল মহাশয়ের অধীনে সংগঠিত কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি এর নাম দেন—'চাপহীন শিক্ষা' (১৯৯৩)।

## ১.৩ জাতীয় কার্যসূচি পরিকাঠামো গঠন:

বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী যোগ্যতা ও মূল্যবোধের পৃথকীকরণ করতে যদিও ১৯৮৬ সালে সুপারিশ করা হয়েছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় সেই স্তর পরম্পরা না মেনে এমন এক পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে যা শুধুমাত্র অফুরন্ত তথ্যসমৃদ্ধ পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে। ২০০০ সালের কার্যসূচি পরিকাঠামো গঠন সম্পর্কে পূর্ণর্বিবেচনা করা সত্ত্বেও শিক্ষাব্যবস্থার পরীক্ষাকেন্দ্রিক জটিলতা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে যায়। এই শতাব্দীর সূচনায় পরীক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত যে দীর্ঘ পর্যালোচনা হয়, সেখানে কিছু সদর্থক এবং নঞর্থক উন্নতির এবং

বিদ্যালয়ে শিক্ষার ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা সম্পর্কিত বহু বিষয় মনে রাখতে হবে; যেমন— শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিশুর সামাজিক-পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শিক্ষার প্রকৃতি অর্থাৎ মানুষের সার্বিক উন্নতি সাধনে শিক্ষার ভূমিকা এবং সর্বোপরি শিক্ষা পদ্ধতি।

জাতীয় কার্যসূচি পরিকাঠামো গঠন কখনো, কখনো একটি ভুল ধারণা পোষণ করতে বাধ্য করায় যাতে মনে হয় শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে সমতা রক্ষা করাই তাদের একমাত্র কাজ। NPE (১৯৮৫) এবং POA (১৯৯২)— এ দুয়ের অভিপ্রায় যেন স্ববিরোধী। জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে ভারতের ভূপ্রকৃতিগত বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের কথা মাথায় রেখেই NPE এমন একটা জাতীয় কার্যক্রম পরিবেশ কাঠামো গঠন করতে চেয়েছিল, যার মধ্যে মানুষের সাধারণ মূল্যবোধের পাশাপাশি শিক্ষার উপকরণগুলিও বর্তমান থাকবে। NPE এবং POA পরিস্থিতি বিবেচনা করে ঠিক করে সমাজের সকল শ্রেণীর শিশুদের তালিকাভুক্তি, ১৪ বছর পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষাদান ও বিদ্যালয় শিক্ষাকে গুণগত মানে উন্নতিসাধন (POA পৃ:-৭৭)। NPE-র এই প্রস্তাবনাকে আরও একটু বিস্তারিত করেছে POA । শিক্ষার যেসব প্রাসঙ্গিক নমনীয়তা এবং গুণমান জাতীয় কর্মসূচি পরিকাঠামো গঠনের আওতায় পড়ে সেগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে POA। এভাবেই এই দুটি তথ্য, শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করতে জাতীয় কর্মসূচি পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে।

> জাতীয় কর্মসূচি পরিকাঠামো গঠনের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠবে জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি, যার মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষণীয় উপাদান বর্তমান থাকবে। জাতীয় অস্তিত্বকে পালন করার জন্য যে বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে তার মধ্যে অন্যতম বিষয়গুলি হল— ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি।
>
> এই উপাদানগুলি এমন যে সব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেবে এবং এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যাতে মূল্যবোধ অর্থাৎ ভারতের সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, মানবজাতির সামাজিক ও রাজনীতিক সমতাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, লিঙ্গের সমতা, পরিবেশ সংরক্ষণ, সামাজিক বাধার অপসারণ, ছোট পরিবার রক্ষার নিয়মাবলী পর্যবেক্ষণ, বিজ্ঞানমনস্কতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান করতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের কঠিন প্রথা অনুযায়ী। ভারত সর্বদাই শান্তির জন্য কাজ করেছে এবং বিভিন্ন জাতির সঙ্গে বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে সারা বিশ্বকে এক পরিবারভুক্ত বলে মনে করে। এই প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি সৎ থেকে, বিশ্বদর্শনকে মজবুত করবে শিক্ষা এবং নবীন প্রজন্মকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শান্তি সহাবস্থানে উদ্বুদ্ধ করবে। সমতা বিস্তারে, সকলকে সমান সুযোগ দেওয়া জরুরি। শুধুমাত্র স্থান দিলেই হবে না, তাকে সার্থক করে তুলতে হবে। সাম্যের জন্মগত অধিকার সম্পর্কিত সচেতনতা কার্যসূচির মধ্য দিয়ে রূপায়িত করতে হবে। কুসংস্কার, সামাজিক পরিবেশে যে জটিলতা সৃষ্টি হয় তা দূরীকরণই হবে এর মূল উদ্দেশ্য।
>
> (জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি, ১৯৮৬)

### ১.৪. পরিকল্পনা প্রণালীঃ

এই প্রণালী সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর শুধু মনোযোগ দিলেই হবে না তার উপর ভিত্তি করে আমাদের পরিকল্পনাও তৈরি করতে হবে যাতে সঠিকভাবে সেগুলি কার্যকরী হয়। যদিও এইসব উৎকৃষ্ট পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে আগেও ভাবা হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হলঃ

* বিদ্যালয় বহির্ভূত জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগসাধন।
* মুখস্থ বিদ্যার বাইরে শিক্ষাকে রাখা।
* কার্যসূচিকে সমৃদ্ধ করতে হবে এমনভাবে যাতে শুধুমাত্র পাঠ্যবইকেন্দ্রিক না হয়ে শিশুর সার্বিক উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে।
* শ্রেণীকক্ষের জীবনের সঙ্গে পরীক্ষা ব্যবস্থার সাযুজ্য রক্ষার্থে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও বেশি নমনীয় করে তুলতে হবে।
* দেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অভ্যন্তরে জ্ঞানের সযত্ন সরবরাহে একটি নির্ণায়ক পরিচয়কে পুষ্ট করা।

সম্প্রতি যে পরিবর্তনের হাওয়া সমাজ জীবনে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে কার্যপ্রণালীকে সময়োপযোগী করে তুলতে হবে। এর মধ্যে সব থেকে জরুরি হল সর্বস্তরের শিশুদের বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা ও ধরে রাখা। এই কাজটি করতে হবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যাতে প্রতিটি শিশুর মূল্যবোধ দৃঢ় হয় ও তাদের আত্মমর্যাদাবোধ বৃদ্ধি পায় এবং পড়াশোনা করবার আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। কার্যসূচির মধ্যে সেই দায়বদ্ধতা প্রতিফলিত হওয়া উচিত, যা শুধু সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকেই তুলে ধরবে তা নয়, বরং তার সঙ্গে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত থেকে উঠে আসা বিভিন্ন শারীরিক মানসিক ও মননকেও তুলে ধরবে যা শিশুদের বিদ্যালয় জীবনে সফল হয়ে উঠতে সাহায্য করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাব্যবস্থায়, প্রাথমিক স্তর থেকেই, ভাষা, শ্রেণী, সংস্কৃতি, ধর্ম বৈষম্যকে অপসারিত করতে হবে। এই কাজ শুধুমাত্র কর্মপন্থা বা পরিকল্পনার ভিত্তিতে নয়, তা করতে হবে শিশুর পড়বার পদ্ধতি ও পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করবার প্রচলিত রীতিকে পূর্ণ:পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে।

UEE আমাদের সচেতনতা বাড়িয়েছে, আমরা বুঝেছি কর্মসূচির পরিধিকে অনেক বেশি বিস্তৃত করতে হবে যাতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান, হাতের কাজ তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আজ বাণিজ্যিক শক্তির দ্বারা এইসব ঐতিহ্যের অবক্ষয় ঘটছে এবং বিশ্বায়নের ফলে শিক্ষা ক্রমশ বস্তুতে পরিণত হয়েছে। আত্মমর্যাদাবোধ ও নৈতিক মূল্যবোধ এবং শিশুর কল্পনাশক্তি বৃদ্ধিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শিশুদের সহজাত জ্ঞান এবং কল্পনাশক্তির উপর শ্রদ্ধা রাখতে হবে।

শিক্ষা সংক্রান্ত যেসব পূণর্গঠনমূলক কাজকর্ম হয়েছে তার মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণ এবং পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠার ভূমিকা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের ( প.রা.প্র. ) ভূমিকার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং বিকেন্দ্রীকরণ — এ দুটি বিষয়কে সুসংবদ্ধ সংস্কার - অভিমুখী প্রধান পদক্ষেপ হিসাবে দেখতে হবে। প.রা.প্র. - এর ছত্রছায়ায় অনেক সুযোগ পাওয়া যায় – শিক্ষাব্যবস্থার আমলাতান্ত্রিক হয়ে ওঠার ঝোঁক কমে, শিক্ষক - শিক্ষিকাদের ওপর থাকে জবাবদিহির দায়, বিদ্যালয়গুলিও আরও স্বশাসিত হয় এবং ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনের প্রতি অনেক বেশি নজর রাখে। এই সমস্ত পদক্ষেপে স্থানীয় ভৌত শর্তাবলী, জীবজগৎ এবং পরিবেশের জটিল ঘেরাটোপে অবশ্যই নানাবিধি প্রশ্ন উদ্দীপ্ত হয়। স্ব স্ব পরিবেশে বেড়ে - ওঠা শিশুরা স্বভাবতই নানান দক্ষতার অধিকারী হয়ে ওঠে। চারপাশের পৃথিবী আর প্রাণীজগৎও নিরীক্ষণ করে তারা। সেই সব জ্ঞান যখন তারা শ্রেণীকক্ষে আমদানি করে, তখন তাদের প্রশ্নে, তাদের জিজ্ঞাসু কৌতূহলে এই পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে এবং আরো সৃষ্টিশীল হয়ে উঠতে পারে। পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত নীতির ক্ষেত্রে, ' জানা থেকে অজানায়', 'মূর্ত থেকে বিমূর্তে । ' অঞ্চলবিশেষ থেকে সমগ্র বিশ্বে সঞ্চরণের সর্বজনস্বীকৃত যে রীতি, এহেন সংস্কারে সেটিও সহজতর হয়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় তথা শিক্ষকদের শিক্ষাক্রমে বিবিধ বিদ্যার ক্ষেত্রে সমালোচনামূলক শিক্ষণের ধারণার চর্চা করতে হবে। উদাহরণ স্বরুপ দেখা যায়, এক্ষেত্রে সৃজনশীল কাজ বিবিধ বিদ্যা শিক্ষণের একটি কার্যকর মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে যে খানে

(ক) শিশুদের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাকে শ্রেণীকক্ষে প্রদত্ত জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে, (খ) কাজসংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন সমাজের প্রান্তিক অংশের শিশুদের সুযোগ দেওয়া যাবে এবং সুবিধাভোগী শ্রেণীতে অবস্থানকারী তাদের সঙ্গীসাথীদের মধ্যে এই সব শিশুদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রাধান্য এবং শ্রদ্ধার মনোভাব অর্জিত হবে এবং (গ) বিষয়ীভূত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যৌক্তিক বিন্যাসে নির্মিত মানুষের ক্রমসঞ্চিত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং তত্ত্বের বর্ধমান সপ্রশংস মনোভাব গড়ে তোলা সহজ হবে।এই পদক্ষেপগুলির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়েছে শিক্ষা ও কার্যসূচি অনুশীলন। এই কার্যসূচিগুলি অধিকমাত্রায় আমলাতান্ত্রিক না হয়ে যেন বিদ্যালয়গুলি বেশিমাত্রায় স্বশাসিত হয়— এই বিষয়ে অবাধ সুযোগ দিয়েছে।

শিশুদের পরিবেশের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিবেশরক্ষা— এ দুটি হল কার্যসূচি সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিগত শতাব্দীতে মানুষ যতটা প্রযুক্তিনির্ভর হয়েছে ততটাই পরিবেশবিমুখ হয়েছে। আগের থেকেও বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি। পরিবেশ রক্ষার এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে শিক্ষাই মানুষকে সেই পথ দেখাতে পারে যার মধ্য দিয়ে মানুষ বাঁচবার, বৃদ্ধিলাভ করবার এবং উন্নতি করবার শক্তিকে অর্জন করতে পারে। পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বয়স এবং শ্রেণী নির্বিশেষে সমাজে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় জাতীয় শিক্ষা প্রণালী ১৯৮৬ সালে।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সঙ্গতি রেখে বসবাস করতে পারাই হল মানুষের মৌলিক চাহিদা। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। অসুস্থ পরিবেশ প্রায়শই মানুষকে অসহিষ্ণু, বিরোধপ্রবণ করে তোলে। তার ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সারা পৃথিবীই আজ হিংস্রতার শিকার। শিক্ষা কখনো-কখনো শিশুমনে বীজ বপন করে, যা মানব অনুভূতি ও শাশ্বত সত্যগুলিকে অস্বীকার করে। সাংস্কৃতিক শান্তি রক্ষা করাই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হল মানুষের ক্ষমতার বৃদ্ধি যাতে সে জীবনের পথ হিসেবে শান্তিকে বেছে নিতে পারে এবং বিবাদকে নিজের বশে রাখতে সক্ষম হয়। 'শান্তি'— বিদ্যালয় পাঠক্রমে এমন একটা ভূমিকা নিতে পারে যার দ্বারা সমগ্র জাতির পুনরুজ্জীবন সম্ভব।

এক জাতি হিসেবে আমরা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় শক্ত করে গণতন্ত্রকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ (১৯৫২) গণতন্ত্র সম্পর্কে যা বলেছেন তা আর একবার দেখে নেওয়া যেতে পারেঃ

> " গণতন্ত্রে নাগরিকত্বের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বহু বুদ্ধিজীবী, সামাজিক এবং নৈতিক গুণ। ...একজন গণতান্ত্রিক নাগরিকের বোঝবার ক্ষমতা এবং বৌদ্ধিক সচেতনতা থাকা উচিত যার সাহায্যে সে মিথ্যা থেকে সত্যকে, প্রচার থেকে ঘটনাকে বেছে নিতে পারে এবং গোঁড়ামি ও কুসংস্কারকে দূর করতে পারে।... যা কিছু পুরাতন তাকে বর্জন করতে হবে এবং যা নতুন তা-ই গ্রহণের যোগ্য এস ভাবনা থাকা উচিত নয়। আবেগকে দূরে সরিয়ে রেখে দুটোকেই পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং যেটি আইন ও অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করছে সেটিকে সাহসের সঙ্গে বর্জন করতে হবে...।"

নিজেদের জন্যই গণতন্ত্রকে জীবনের পথ ভেবে লালন করতে হবে, শুধুমাত্র শাসনের রীতি ভেবে নয়। সংবিধানে যে সব মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে সেগুলিই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

- ভারতীয় সংবিধান শ্রেণী সমতা এবং সকল নাগরিকের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত বিপুল সংখ্যক শিশু এবং সরকারি ও বেসরকারি

বিদ্যালয়ের মধ্যে যে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় সমাজে সেগুলি সমতার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। সামাজিক পরিবর্তন এবং মানবজাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতাকে রক্ষা করা যায় একমাত্র শিক্ষার সাহায্যে।

- গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক আইন সব নাগরিকের ক্ষেত্রে এক এবং অখণ্ড।
- সংবিধানে চিন্তা ও কর্মস্বাধীনতার কিছু মৌলিক মূল্য আছে। গণতন্ত্র নিজের প্রয়োজনে এক ধরনের নাগরিক তৈরি করে, যে নিজের লক্ষ্য নিজেই নির্ধারণ করতে পারে এবং অন্যের অধিকারকে মূল্য দেয়।
- একজন সুনাগরিকের কর্তব্য হচ্ছে সাম্য, স্বাধীনতা এবং সুবিচারের কর্তব্য, আদর্শ প্রচার করা যাতে সমাজে সৌভ্রাতৃত্ব বজায় থাকে।
- ভারত হল একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অর্থাৎ সমস্ত ধর্মবিশ্বাসের উপর শ্রদ্ধা রাখা প্রয়োজন। আজকের শিশুদের মধ্যে সেই ভাবনাকে ছড়িয়ে দিতে হবে যে ভাবনায় তারা জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারে।

বালিকাদের সমান সুযোগ অথবা প্রতিনিধিত্বের শর্তে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রচলিত অভিগমন মোটেই পর্যাপ্ত নয়। বর্তমানে, বৈচিত্র্য, ভিন্নতা এবং অসুবিধার প্রশ্নগুলি বিচার করে ফলাফলে সমতা অর্জনের লক্ষ্যে একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সাম্যের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার একটি কঠিন কাজ হল, সমস্ত শিক্ষার্থীকে এমনভাবে সক্ষম করে তোলা যাতে তারা আপন অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হতে পারে এবং সমাজে রাষ্ট্রে স্ব স্ব সাক্ষর রেখে যেতে পারে। কতকগুলি কেন্দ্রীয় মানবিক যোগ্যতা অর্জন না করা অবধি মানুষ যে তার অধিকার এবং নিজস্ব পছন্দ - অপছন্দ কোনো কিছুই কাজে লাগতে পারে না, আমাদের মনে এ ভাবনার স্বীকৃতি প্রয়োজন। অতএব সমাজের প্রান্তিক শিক্ষার্থীর দল এবং বিশেষত বালিকারা যাতে আপন দাবীতে সোচ্চার হতে পারে এবং সেই সঙ্গে সমষ্টি জীবনকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে, সেই স্বপ্নকে সম্ভব করে তুলতে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের অবশ্যই ক্ষমতায়ন ঘটাতে হবে, যার ফলশ্রুতিতে এই সমস্ত শিক্ষার্থীরা অসম সামাজিকীকরণের অসুবিধা অতিক্রম করতে পারবে এবং স্বশাসনে সমনাগরিক হয়ে-ওঠার ক্ষেত্রে আপন কর্মদক্ষতা বিকাশে সক্ষম হয়ে উঠবে।

বহু আঞ্চলিক এবং স্থানীয় সংস্কৃতি দিয়ে গড়া সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ভরা এই ভারতীয় সমাজ। মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, জীবনে বেঁচে থাকার পথ এবং সামাজিক সম্পর্ককে বোঝবার ক্ষমতা একের অপরের থেকে আলাদা। সব শ্রেণীরই বেঁচে থাকবার, উন্নতি করবার অধিকার, আমাদের বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক সমাজের সঙ্গে শিক্ষা পদ্ধতির একটা সামঞ্জস্য তৈরি করতে হবে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দৃঢ় করতে এবং জাতীয়তাবোধের সঙ্গে একাত্মীকরণ করতে এই কর্মসূচি পরিবর্তনশীল সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নব-প্রজন্মকে অতীতের সঙ্গে নব উদ্ভূত দৃষ্টিভঙ্গির পূণর্মূল্যায়ন করতে বাধ্য করাবে। মানব - বিবর্তনের প্রকৃত বোধে এ বিষয়টি অবশ্যই স্পষ্ট হয় যে, আমাদের দেশের যে উদ্দীপ্ত প্রাণের প্রশ্রয়ে বিবিধ স্বাতন্ত্র্যের নিয়ত পরিবর্জন, সেই বৈশিষ্ট্যময় স্বতন্ত্র অবস্থানই এই উদ্দীপনার

পদপ্রান্তে সশ্রদ্ধ নিবেদন। আমাদের ধনভাণ্ডারকে অবশ্যই চিরদিন সমৃদ্ধ করে রাখবে। একে নিছক সহনশীলতার পরিণতি হিসাবে গণ্য করা উচিত হবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সংবিধানে যে মৌলিক অধিকার ও নীতির প্রতি দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত নাগরিক সচেতনতার কথা বলা হয়েছে তা প্রয়োজনে, পূর্বেই মেটাতে হবে।

## ১.৫. গুণগত মান বিস্তার

যদিও গোটা প্রক্রিয়াটি সব শিশুদের কাছে পৌঁছতে চেয়েছে, কিন্তু গুণগত মান বিষয়টি নতুন এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। গুণগত মান ও সুযোগ-সুবিধা— একে অপরের উপর নির্ভরশীল— এই বিশ্বাস ভারতের রাজনীতিতেও যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমনই লক্ষ্য করা যায় শিক্ষার ক্ষেত্রেও। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ও বিভিন্ন শ্রেণীতে শিশুরা যে শিক্ষা পায় তার মধ্যেও গুণগত মানের বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। স্বর্গীয় শ্রী জে.পি.নায়ক সমতা, গুণগত মান এবং পরিমাণকে ভারতীয় শিক্ষার 'ছলনাময়ী ত্রিকোণ' নামে অভিহিত করেছেন। এই রূপক শোভিত ত্রিকোণের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গভীর তত্ত্বনির্ভর বোঝাপড়ার গুণ থাকা দরকার। সম্প্রতি (UNESCO ) থেকে প্রকাশিত বিশ্বসংক্রান্ত রিপোর্টে পদ্ধতির মান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেখানে গুণগতমান সম্পর্কিত বিতর্কে পদ্ধতির মানকেই যথাযথ প্রেক্ষিত হিসেবে ধরা হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে একটি শিশুর সফলতাকে দেখতে হবে গুণগত মানের নির্দেশক হিসেবে। যে শিক্ষাব্যবস্থা, দ্রুত উন্নয়নশীল বেসরকারি এবং বৃহৎ সরকারি শাখার মধ্যে বিভক্ত তাদের চিহ্নিত করা যায় সম্পদের সংকুলান ও অসম বিস্তার দিয়ে। গুণগত মান সম্পর্কিত বিষয়টি কিছু জটিল ধারণা ও বাস্তব প্রশ্নের সম্মুখীন করে। বেসরকারি বিদ্যালয়ের মান অত্যন্ত উৎকৃষ্ট এই ধারণাই গুণগত মান নির্ধারণ করতে পরীক্ষার ফলাফলকেই মূল উপাদান বলে মনে করে। এসব ধারণাই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির আত্মবৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতাকে অগ্রাহ্য করে। অনেক সময় তারা শিশুর মাতৃভাষাকে অবহেলা করে। সে কারণে, তারা শিশুদের মধ্যে কীভাবে জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তুলছে সে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে আমাদের বাধ্য করায়। সর্বোপরি, তাদের ভর্তিপদ্ধতি এমন যে সেখানে গরিব শিশুরা পড়বার বেশি সুযোগই পায় না। ফলে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে শিশুরা আসে, সে কারণে শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত হয়ে যায়।

শারীরিক সম্পদ কখনো গুণগত মান নির্ধারণের নির্দেশক হতে পারে না; যদিও শারীরিক সম্পদের সংকুলান যে-কোনো সরকারি অথবা বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির গুণগত মানের উপর চাপ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষিত এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শিক্ষকের পরিমাণের উপর শিক্ষার মান নির্ভর করে। শিক্ষকদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং চাকরি সম্পর্কে সম্প্রতি NPE যা ইঙ্গিত দিয়েছেতো সত্যই উদ্‌বেগজনক। যদিও চট্টোপাধ্যায় কমিশন (১৯৮৪) এ বিষয়ে আগেই উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছে। সমস্ত শিক্ষা পদ্ধতিই শিক্ষকদের গুণগত মানের উপর নির্ভরশীল এবং শিক্ষকদের গুণগতমান নির্ভর করে তার নির্বাচন, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং কর্মপন্থার উপর।

শিক্ষার প্রকৃতি এবং শিশুর স্বপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় ধারণাই বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যে একটি মাত্রা দান করে। শুধু এগুলিই নয়, যাঁরা পাঠসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষকদের উপরেই নির্ভর করে বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য বলয় নির্মাণ। আজ যেখানে জাতির মনুষ্যত্ব সরাসরি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে প্রতিনিয়ত সেখানে বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ্য বইয়ে কীভাবে জ্ঞান উপস্থাপিত করা হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য বিষয়গুলিও দেখতে হবে। বিদ্যালয়ে কার্যসূচি অন্তর্ভুক্ত সব বিষয়গুলিকেই এই বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যে ধরনের জ্ঞান সরবরাহের কথা বলা হয়েছে সেগুলি বিদ্যালয়ের প্রতিটি পাঠ্যসূচিতে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা দেখতে হবে। গণতন্ত্রের ভিত ও সংবিধানে উল্লেখিত মূল্যবোধকে আরও বেশি মজবুত করাই হল শিক্ষার সব থেকে বড়ো জাতীয় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়াই বুঝিয়ে দেয় আমরা গুণগত মান ও সামাজিক ন্যায়কে কার্যসূচি পুনর্গঠনের কেন্দ্রীয় বিষয় করেছি। নাগরিক প্রশিক্ষণই হল

প্রথাগত শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজ, সর্বজনীন মানবিক অধিকারগুলি এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত শান্তি ও সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থানের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। জীবনের গুণগত মান সকল অর্থেই শিক্ষার গুণগত মানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সে কারণে শান্তি ও সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার প্রবণতাকে দেখতে হবে গুণগত মানের অন্যতম উপাদান রূপে, শুধুমাত্র ক্ষেত্রমূল্য দেখলে চলবে না।

> ''গণতন্ত্র আত্মমর্যাদা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এবং প্রতিটি ব্যক্তিকে 'মানুষ' হিসেবে মূল্য দেয় ... অতএব , গণতান্ত্রিক শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সার্বিক উন্নতি সাধন। সমাজে বেঁচে থাকবার শৈল্পিক প্রকাশ বিস্তারে ছাত্রদের সেভাবে শিক্ষা দিতে হবে। যদিও এটা স্পষ্ট যে ব্যক্তি কখনো একা বাঁচতে পারে না। ... যে শিক্ষা , সুন্দরভাবে আনন্দের সঙ্গে অন্যদের মধ্যে বাঁচতে সাহায্য করে না সেই শিক্ষা মূল্যহীন।''
>
> ( মধ্যশিক্ষা পরিষদ ১৯৫২-৫৩, পৃষ্ঠা-২০)

### ১.৬: শিক্ষার সামাজিক প্রেক্ষিত:

সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির কোনো ভূমিকা নেই। সামাজিক শ্রেণী, অর্থনৈতিক পদমর্যাদা, লিঙ্গসম্পর্ক, সাংস্কৃতিক বিচিত্রতা এবং অসম উন্নতি—এ সবই ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য। এসবই শিশুদের বিদ্যালয়ে যোগদান ও শিক্ষাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আর এর প্রত্যক্ষ চাপ পড়ে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসা শিশুদের উপর। তাই দলিত ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মেয়েরা শিক্ষায় গ্রামে ও শহরে বসবাসকারী নারীদের থেকে তুলনায় অনেক পিছিয়ে। শহরে ও বহু গ্রামে দেখা যায় বিদ্যালয় প্রণালী এমনভাবে স্তরে স্তরে গঠিত হয়েছে যা শিশুদের অন্যরকম শিক্ষা সরবরাহ করে। অসম লিঙ্গ-সম্পর্ক কেবলমাত্র আধিপত্যকেই চিরস্থায়ী করে না, সেই সঙ্গে বালক ও বালিকা উভয়েরই মানবিক যোগ্যতার পূর্ণতর বিকাশের স্বাধীনতা ব্যাহত করে এবং উদ্বেগের জন্ম দেয়। অতএব সকলের স্বার্থেই বর্তমান লিঙ্গ অসাম্যের থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করতে হবে।

ব্যয়বহুল বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে শুধুমাত্র শহরে উচ্চবিত্তরা শিশুদের পড়তে পাঠায়। পাশাপাশি স্থানীয় সংগঠনের দ্বারা পরিচালিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত সমাজের শিশুরা পড়তে আসে। সাম্প্রতিক কালে গ্রামে বিভিন্ন মানের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যাচ্ছে । সেই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষা সরবরাহ করতে যান্ত্রিক নিয়মে শিক্ষক ও ছাত্র সংখ্যা নির্ধারণ করা হচ্ছে যাতে প্রতি বাসস্থানের এক কিলোমিটারের মধ্যে একটি করে বিদ্যালয় থাকতে পারে। যদিও প্রয়োজনীয় কার্যসূচি অথবা উপাদানের স্বচ্ছতা কিংবা শিক্ষাবিজ্ঞানের ধারণার অভাবে সেগুলি এখনও অসমর্থিত। অনিচ্ছাকৃতভাবেই এইসব আপাত উন্নতি শিক্ষায় বাধাদান করে এবং সমতার সুযোগের সাংবিধানিক মূল্য ও সামাজিক আইনকে ধ্বংস করে। অবৈতনিক শিক্ষাদান অর্থে যদি শিক্ষার সমস্তরকম বাধা দূর করে দেওয়াকে বোঝায় তাহলে UEE -র সাফল্যে—রাজ্যের সামাজিক নীতি এবং অন্যান্য শাখার সহযোগিতার গুরুত্ব কতটা তা আমাদের বোঝা উচিত।

বিশ্বায়নের ফলে গোটা সমাজে শিক্ষার প্রকৃত অর্থ বদলে যাচ্ছে। একদিকে শিক্ষাকে ব্যবসায় রূপান্তরিত করবার প্রয়াস, অন্যদিকে শিক্ষাবিস্তারে পয়সার সংকুলান কিংবা বিকল্প বিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্যে আমলাদের প্রয়াস — এসবই ইঙ্গিত দেয় শিক্ষা কী ভাবে। রাজ্য থেকে পরিবারে এবং পরিবার থেকে সমাজে তার অবস্থান বদলাচ্ছে কীভাবে ব্যবসায়িক চাপ মেনে নিয়ে বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা, পণ্যদ্রব্যে পরিণত হচ্ছে এবং বিদ্যালয়ের গুণগত মানের সঙ্গে ব্যবসায়িক মানসিকতা জুড়ে যাচ্ছে। এই বিষয়ে আমাদের আরও বেশি সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন

আছে। ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের মধ্যে বিদ্যালয়গুলিকে টেনে আনা হচ্ছে এবং তার সঙ্গে অভিভাবকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা শিশুদের মনের উপর বিরাট চাপের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। ফলে শিক্ষার আনন্দ থেকে তারা ক্রমশ বঞ্চিত হচ্ছে। স্থানীয় কমিটির জন্য তিয়াত্তর ও চুয়াত্তর নম্বর সাংবিধানিক সংশোধন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংবিধিবদ্ধ ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে যাতে স্থানীয় কমিটিগুলি তাদের সন্তানদের জন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ উন্নতিসাধনে পদক্ষেপ নিতে পারে। দারিদ্র্য ও অসম সামাজিক সম্পর্কের কারণে শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের আগ্রহ প্রায়শই চাপা পড়ে যায়। শুধু তাই নয়, সমান গুণগত মানের বিদ্যালয়গুলির অভাবেও তাদের ইচ্ছাগুলি মরে যায়। গ্রামের গরিবদের মধ্যে পরিবার বৃদ্ধি করার প্রবণতা সম্পর্কে কোনো আলোচনা হয়নি শিক্ষা সংক্রান্ত প্রণালীর মধ্যে। শিক্ষার জন্য গরিবদের প্রত্যাশা ও বাসনাকে কার্যসূচির বাইরে রাখলে চলবে না।

ভারতীয় শিক্ষার সামাজিক প্রেক্ষিত এভাবেই শিক্ষানীতিকে বহু চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দেয়। সেগুলি কার্যসূচি গঠনের মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। পরিচালনা করার মূল উপাদান সংক্রান্ত আলোচনাই এই চ্যালেঞ্জগুলির দিকে মনোযোগ দিতে সাহায্য করেছে। জ্ঞানের ধারণা উন্মোচন যাতে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নতুন ক্ষেত্রগুলিতে অন্তর্ভুক্তি করা যায় এবং শিক্ষাদানের অভ্যেস যা সর্ব্বদাই, আত্মবিশ্বাস এবং সচেতনতা বাড়ানোর সহায়ক হয় তার বিকাশে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে পাঠ্যক্রম পর্যালোচনার কাজটি করতে হবে।

### ১.৭. শিক্ষার উদ্দেশ্যঃ

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল কিছু শিক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশাবলি মেনে আদর্শ শিক্ষা প্রদান করা। শিক্ষার এই উদ্দেশ্যের পাশাপাশি বর্তমান সমাজের প্রয়োজনীয়তা ও চিরায়ত মূল্যবোধকেও সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে শুধু বর্তমান সামাজিক চাহিদাই নয়, সার্বিক মনুষ্যত্বের আদর্শও রক্ষিত হয়। শিক্ষাকে এমন স্তরে উন্নীত করতে হবে যেখানে সে একসঙ্গে সমকালীন ও চিরায়ত হয়ে উঠতে পারে।

শিক্ষার এই লক্ষ্যপূরণ করতে গিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশ কিছু সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপকে বিদ্যানিকেতনের পাঠ্যে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষাকে স্বতন্ত্র চরিত্র দিতে পেরেছে। শিক্ষার এই লক্ষ্য , শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষ ভিত্তিক পড়াশোনার হাতিয়ার নয়, পাশাপাশি ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাও মানসিক আকাঙ্খা পোষণ করতে সাহায্য করেছে। তাই বর্তমানকে উপেক্ষা না করেও সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছোনো সম্ভব এই শিক্ষার উদ্দেশ্য যতই পরিণতি দেখতে চাক না কেন, সেখানে নীরব দর্শক হয়ে না থেকে তাকে পরিণতির লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রতিটি পদক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। শিক্ষার উদ্যেশ্যের মধ্যে সেই দূরদর্শিতা থাকা প্রয়োজন যা শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথকে ত্বরান্বিত করে। এটি তিনটি উপায়ে সম্ভব প্রথমত প্রদত্ত শর্তগুলির উপর গভীর ও সচেতন পর্যবেক্ষণ। — এখানে দেখে নেওয়া প্রয়োজন কোন্ কোন্ উপায়গুলি লক্ষ্যে পৌঁছোনোর পথ সুগম করছে এবং কোন্গুলি বাধা সৃষ্টি করছে। এক্ষেত্রে সচেতনভাবে নজর করতে হবে কোন্ বয়সে শিশুরা কী পড়ছে ও তাদের গ্রহণ ক্ষমতা কত। দ্বিতীয়ত এই দূরদর্শিতা সাহায্য করবে কার্যক্রম শিক্ষাক্রম বেছে নিতে। তৃতীয়ত যোগ্য বিকল্প খুঁজে নিতে সাহায্য করবে। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্যকে সামনে রেখে চলতে গেলে আমাদের বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপ ফেলতে হবে। বিদ্যালয়, শ্রেণীকক্ষ এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সেই স্থান যেখানে শিক্ষার মূল ক্রিয়াকলাপগুলি সাধিত হয়। এই স্থানই ছাত্রদের চিরকাঙ্খিত উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার ক্ষেত্র। ছাত্র মনস্তত্ত্ব, শিক্ষার লক্ষ্য, জ্ঞানের প্রকৃতি এবং সামাজিক প্রেক্ষিত আমাদের সাহায্য করে সেই উপাদানগুলি বুঝতে যা শ্রেণীকক্ষের অনুশীলনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

যে সব উপাদানগুলি পথ দেখাতে সাহায্য করবে সেগুলি সম্পর্কেও আগে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেগুলিই সামাজিক মূল্যবোধের একটা ভূচিত্র গড়ে দেবে যার মধ্যে থেকে আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে শনাক্ত করতে সফল হব। সামাজিক মূল্যবোধ বলতে সর্বপ্রথম সমতার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বিচার, স্বাধীনতা, অন্যের প্রতি

সংবেদনশীলতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানুষের আত্মমর্যাদা ও অধিকারের উপর দায়বদ্ধথাকতে হবে। যুক্তি এবং বোঝাপড়ার উপর নির্ভর করে এই সব মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধ থাকাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। সুতরাং এই কার্যসূচি বহু অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে, শিশুদের মধ্যে সেই দায়বদ্ধতা গড়ে তুলতে এবং বিদ্যালয়ে মতবিনিময় ও উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করতে সাহায্য করবে।

নিজের ক্ষমতানুযায়ী সচেতনভাবে বিবেচনার মধ্য দিয়ে মূল্যনির্ভর সংকল্প তৈরি করতে নির্দেশ দেয় চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা। শিক্ষার দ্বারা অন্যের ভালো থাকা এবং অনুভবের প্রতি সংবেদনশীল হতে পারাই মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবার বুনিয়াদ তৈরি করে।

শেখার জন্য পড়া এবং পড়া ও না-পড়ার জন্য যে ইচ্ছাশক্তি, সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন পরিবেশের সঙ্গে নমনীয়তা ও সৃজনী শক্তির দ্বারা মানিয়ে চলার ক্ষমতা তার উপরেই নির্ভর করবে।

জীবনে কী পছন্দ করছি এবং গণতান্ত্রিক পথে যোগদান করতে পারছি কিনা— তা নির্ভর করে আমি বিভিন্ন উপায়ে সমাজকে কতটা দিতে পারছি তার উপর। অর্থনৈতিক পথে অগ্রসর হতে এবং সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে একমাত্র শিক্ষা কাজ করবার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে পারে। তাই শিক্ষা ও কাজের মধ্যে একটা মেলবন্ধন তৈরি করতে হবে। কার্য সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আছে কিনা সেই ব্যাপারে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে। তা করতে হবে দক্ষতা ও আচরণের মধ্যে দিয়ে। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতকে বুঝে নিজের মানসিকতাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা সম্ভব হবে। কাজ একাই সামাজিক মনন সৃষ্টি করে।

আহ্ ছেলে আমার ইস্কুল চলল!
......... ভাগ্যিস বিমানবন্দর থেকে কায়দা করে ঐ একটা জুটিয়ে এনেছিলাম!
(সৌজন্যে : টাইমস্ অফ ইন্ডিয়ায় আর কে লক্ষ্মণ।)

সৌন্দর্য ও শৈল্পিক উপলব্ধি হচ্ছে মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিল্প ও সাহিত্যে সৃজনশীলতা বৃদ্ধি এবং নান্দনিক উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করতে পারে একমাত্র শিক্ষা। নান্দনিক উপলব্ধি এবং সৃজনীলতার শিক্ষা গ্রহণ আজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ নান্দনিক উপলব্ধি মতামত তৈরি করতে সাহায্য করবে। বাজারি শক্তির দ্বারা উৎপাদিত রুচি অনুযায়ী সৌন্দর্য ও উপলব্ধি বোধ গড়ে তোলার বিপক্ষে এটা খুবই প্রয়োজনীয়। সৌন্দর্য ও বিনোদনের প্রশ্নে এটা খুব ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে যে সৌন্দর্য ও বিনোদনের প্রথাগত রীতিকেই বিস্তৃত করা হচ্ছে কি না? কারণ তাতে মহিলা ও প্রতিবন্ধী মানুষ অপমানিত বোধ করতে পারেন।

# দ্বিতীয় অধ্যায়
## শিক্ষা ও জ্ঞান



এই পরিচ্ছদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি হল শিশুকে একজন স্বাভাবিক শিক্ষার্থী হিসাবে এবং তার নিজস্ব কার্যকলাপের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করা। মূল শিক্ষার বাইরে আমরা শিশুদের নানা ধরনের কৌতূহল, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং অন্তহীন প্রশ্নের সম্মুখীন হই। ওরা খুব সক্রিয়ভাবে তাদের চারপাশের পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকে। সারাক্ষণ নতুন কিছু আবিষ্কারের নতুন কোন ডাকে সাড়া দেওয়ায় নেশায় ওরা বিভোর। শিশুরা আপন মনেই নতুন কিছু পড়ে, আর আপন মনেই তার অর্থ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে। শিশুর শৈশব হল বৃদ্ধি ও পরিবর্তন এ দু'য়েরই সময়, যেখানে মানুষের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার সম্পূর্ণ বিকাশের সুযোগ থাকে। শৈশব শুধুমাত্র পরিণত সমাজের উপযুক্ত হয়ে ওঠার শিক্ষাই দেয়না, পাশাপাশি পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে ব্যক্তিমানুষকে সাহায্য করে, যাতে সে সমাজের অন্যান্য মানুষের নিরিখে নিজেকে বুঝতে পারে, কাজ করতে পারে এবং প্রয়োজনে নিজের পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়। প্রতিটি নতুন প্রজন্ম জ্ঞান ও সংস্কৃতির ভাণ্ডারের উত্তরাধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যা তাদের নিজস্ব কার্যকলাপ ও বোঝাপড়ার জালবুননের মাধ্যমে নতুনভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে।

### ২.১. সক্রিয় শিক্ষার্থীর প্রাধান্য

প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার্থীদের একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা দেয় যার মাধ্যমে তারা নিজস্ব জ্ঞানের ভাণ্ডার গড়ে তোলে, পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক ও তাদের চারপাশের সামাজিক পরিবেশ এবং অর্পিত কর্মভার থেকে তারা তাদের কার্যক্ষমতাকে উন্নততর করে। সে কারণেই বিভিন্ন সুযোগের সদ্ব্যবহার, উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্য পরিচালনা, ভুলভ্রান্তি ও আত্ম সংশোধনের প্রয়োজন। এটি যেমন ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি, বিশেষত বিদ্যালয় সমস্ত শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন সুযোগ করে দেয় যাতে তারা এই সমাজ, অন্যান্য মানুষজন ও নিজেদের সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করে। এই ধারণার মাধ্যমেই জন্মসূত্রে পাওয়া পরিবার

বা গোষ্ঠীর অনুকূল পরিবেশ দ্বারাই নিজেদের উত্তরাধিকার অর্জন ও তার সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম। তাই বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত প্রথাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা পৃথিবীকে জানার ও তার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের সুযোগকে উন্মুক্ত করে দেয়।

আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য হল পাঠক্রমকে শিশুদের কাছে একটি সম্পূর্ণ ও অর্থবহ অভিজ্ঞতা হিসেবে তুলে ধরা এবং পাঠ্যপুস্তক সংস্কৃতিকে বন্ধ করা। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থী ও শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের ধারণার এক মৌলিক পরিবর্তন। তাই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল ভিত্তি ও নিহিতার্থ সম্পর্কে গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাদান বলতে শিশুদের অভিজ্ঞতা, তাদের বক্তব্য এবং সক্রিয় অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দেওয়াই বোঝায়। এই ধরণের শিক্ষার জন্য শিশুর মানসিক উন্নতি ও উৎসাহের দিকগুলি মনে রেখে শিক্ষার পরিকল্পনা প্রয়োজন। পরিকল্পনাগুলিকে তাই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তার বৈচিত্র্যের কথা মনে রেখে প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পছন্দ অনুযায়ী ক্রিয়াশীল হওয়া উচিত। স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতিতে, যে সমস্ত অনুশীলন ও পাঠ্য আমরা শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা করি সেগুলি শিশুদের সামাজিকীকরণ ও শিশুশিক্ষার ভাবগ্রাহী বৈশিষ্ট্যগুলিকেই প্রকাশ করে। এর পরিবর্তে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া শিশুর সক্রিয় এবং সৃজনশীল ক্ষমতাগুলিকে গড়ে তুলতে ও পরিস্ফুট করতে পারি। এই ক্ষমতাকে পুঁজি করে শিশুরা বিভিন্ন ঘটনার অর্থ খোঁজার চেষ্টা করে, পৃথিবীর সাথে ও অন্যান্য মানুষের সাথে তাদের যোগসূত্র তৈরি হয়। শিক্ষা একটি সক্রিয় এবং সামাজিক প্রক্রিয়া। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'ভালো ছাত্র' বলতেই আমরা বুঝি শিক্ষকের প্রতি অনুগত, নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন একজন শিক্ষার্থী, 'যে শিক্ষকের উচ্চারিত শব্দকে' প্রামাণিক জ্ঞান হিসেবে গণ্য করে।

**শারীরিক অস্বস্তির সাধারণ উৎস**

স্কুলে পৌঁছতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম।
ভারী স্কুল ব্যাগ।
প্রাথমিক পরিকাঠামো যেমন সহায়ক পাঠ্যপুস্তকের অভাব।
অপরিকল্পিত আসবাবের ফলে ঠেস দিয়ে বসার মতো স্থান অপর্যাপ্ত হওয়ায়, পায়ে এবং হাঁটুতে টান ধরা।
সময়সারণীতে শিশুদের শরীর প্রসারিত করা সঞ্চালন এবং খেলার অবকাশ না থাকায় কিশোর-কিশোরীদের খেলাধুলা থেকে বঞ্চিত হওয়া ও ফলে মেয়েদের খেলাধুলার প্রতি ঔদাসীন্য।
শুধু মাত্র মেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় শৌচাগার ও শৌচের উপকরণের অভাব।
শারীরিক শাস্তির— মারধোর, অদ্ভুত শারীরিক ভঙ্গিমা।

## ২.২. শিক্ষার্থীদের প্রসঙ্গে

শিশুদের বক্তব্য এবং অভিজ্ঞতার কোনোটাই শ্রেণীকক্ষে প্রকাশ পায় না। সেখানে মূলত শিক্ষক / শিক্ষিকার কণ্ঠস্বরই প্রাধান্য পায়। শিশুরা সাধারণত কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে বা শিক্ষকের কথার পুনারাবৃত্তি করতে মুখ

খোলে। খুব কম ক্ষেত্রেই তারা সক্রিয় হয় বা বলা যায় সক্রিয় হওয়ার সুযোগ পায়। পাঠক্রম এমন হওয়া উচিত যেটি শিশুদের নিজস্ব বক্তব্য গড়ে তুলতে সাহায্য করে, ওদের কৌতূহল বাড়িয়ে তোলে— যাতে তারা আরও প্রশ্ন করে, অর্থসন্ধিৎসু হয়, নিজে হাত দিয়ে কিছু করতে চায়। এই ভাবে নিজস্ব অভিজ্ঞতাগুলিকে স্কুলে থেকে অর্জিত জ্ঞানের সাথে মিলিয়ে নিতে পারে। শুধু মাত্র পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি না করে, পাঠ্যক্রমকে তাই নতুন ভাবে গড়ে তোলাই আমাদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য। এজন্য শিক্ষক / শিক্ষিকাদের প্রস্তুতি, স্কুলে বার্ষিক পরিকল্পনা, পাঠপুস্তক ও শিক্ষার বিভিন্ন উপাদান, পঠন, পাঠনের পরিকল্পনা এবং সর্বোপরি পরীক্ষা ও মূল্যায়নের প্রকৃতি সবকিছুরই দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন প্রয়োজন।

শিশুরা শুধুমাত্র সেই পরিবেশেই শিখতে পারে যেখানে তারা নিজেদের আদরণীয় বলে মনে করে। আমাদের বিদ্যালয়গুলির এখনও পর্যন্ত শিশুদের জন্য এই পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। আনন্দ ও মানসিক চাহিদা পূরণের পরিবর্তে যদি শিক্ষা শব্দটির সাথে ভয়, মানসিক চাপ ও অনুশাসন জড়িয়ে থাকে তবে তা শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শিশুদের পক্ষে এটি অনুভব করা অত্যন্ত প্রয়োজন যে তাদের পরিবার, গোষ্ঠী, ভাষা এবং সংস্কৃতি প্রকৃতই মূল্যবান কেননা বিদ্যালয়ে এই সব সম্পদের বিশ্লেষণ এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের প্রক্রিয়াতেই এরা অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে আর তাদের প্রতিভার বৈচিত্র্যময়তা কাম্য, সর্বোপরি বড়দের সমাজ তাদের দক্ষতাকে সর্বোত্তম হওয়ার উপযোগী বলে মনে করে। এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দিকগুলি সম্পর্কে আমাদের আরও বেশি সচেতন হওয়া দরকার কারণ বর্তমান স্কুলগুলির পরিধি ক্রমশ বাড়ছে এবং সমাজের সর্বস্তরের শিশুরা সেখানে আসছে। স্কুলে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা সার্বিক শিক্ষার জন্য পরিকাঠামোগত উন্নতি ও বহুমুখী শিক্ষার প্রচলন বর্তমান সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। শারীরিক শাস্তির বিরুদ্ধেও দৃঢ় পদক্ষেপ প্রয়োজন। এছাড়া দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে স্কুল শিক্ষা আরও সহজলভ্য হওয়া উচিত। পাশাপাশি পাঠক্রমের বোঝা ও পরীক্ষা সংক্রান্ত চাপের বিষয়েও জরুরী সমাধান দরকার। যেকোন শিক্ষার ক্ষেত্রেই শারীরিক ও আবেগজনীত নিরাপত্তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরেই নয়, পরবর্তী ক্ষেত্রেও তা প্রয়োজন।

## ২.৩. শিক্ষা এবং বিকাশ

শৈশব থেকে যৌবনের প্রারম্ভ—দ্রুত বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের সময়। পাঠক্রমের মধ্যে শিক্ষা ও বিকাশের প্রতি একটি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থাকা উচিত যা কিনা শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ও পাশাপাশি ব্যক্তির স্বতন্ত্র উন্নয়ন এবং পারস্পরিক আদান প্রদানের মধ্যে যোগসূত্র ও পার্থক্যগুলি চিহ্নিত করতে পারে।

২.৩.১. যে-কোনো প্রকার বিকাশের প্রাথমিক শর্ত হল সকল শিশুদের সুস্থ শারীরিক বৃদ্ধি। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পুষ্টি, শারীরিক ব্যায়াম এবং অন্যান্য মনঃ সামাজিক প্রয়োজনের নিরিখে জীবনের মৌলিক দাবিগুলির নির্দিষ্ট উল্লেখ জরুরি হয়ে পড়ে। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক পুষ্টি, শারীরিক অনুশীলন এবং সবধরণের শারীরিক অস্বস্তি থেকে মুক্তি।

নিয়মমাফিক হোক বা না হোক যে কোনো রকম স্বাধীন খেলাধূলাই শিশুদের শারীরিক উন্নতির পক্ষে অত্যন্ত জরুরী যা তাদের চাপ থেকেও খানিকটা মুক্তি দেয়। নানান খেলাধুলা, বহিঃঅঙ্গন ক্রীড়া এবং যোগব্যায়ামের ফলে শারীরিক সক্ষমতার প্রসার ঘটে, এর মধ্যে অনেক কিছুই জড়িয়ে থাকে। পরিশ্রম করার ক্ষমতা, সম্পূর্ণ ও সামগ্রিক দক্ষতা, আত্ম সচেতনতা এবং আত্ম নিয়ন্ত্রণ, সর্বোপরি পারস্পরিক সহযোগিতা যা দলগত খেলাধুলার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। খেলার মাঠ, সাজ-সরঞ্জাম এবং নিয়মকানুনের সাহায্যে সক্রিয়তা এবং নানান খেলা সকল শিশুদের অধিগম্য করা যায়। তাকে আরও সার্বিক করে তোলা যায়, যাতে শারীরিক কারণে প্রতিবন্ধি শিশুরাও অন্যদের সাথে যোগদান করতে পারে। শিশুরা খেলাধুলা, জিমন্যাস্টিকস, যোগব্যায়াম বা যেকোন Performing art এ নিজেদের উৎকর্ষতার শিখরে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি আনন্দের পরিবর্তে অভীষ্টই বড়ো হয়ে ওঠে তবে সে শিক্ষা অভ্যাস ও অনুশাসনের নামান্তর যা চাপের সৃষ্টি করে। স্বাস্থ্য এবং শরীরশিক্ষা সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে

আবশ্যিক হলেও এদের মধ্যে যারা খেলাধুলা এবং বহিঃঅঙ্গন ক্রীড়ায় উন্নতি করতে চাইবে, তাদের সে বিষয়ে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

শারীরিক বিকাশ, মানসিক ও বোধের বিকাশের সহায়ক, বিশেষত ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে চিন্তাশক্তি, যৌক্তিকতা নিজের ও পৃথিবীর সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হওয়া, ভাষার ব্যবহার এ সবকিছুই পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়ায় মাধ্যমেই তৈরি হয়।

২.৩.২. জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন ভাষা ও কাজের মাধ্যমে নিজের এবং পৃথিবীর সম্পর্কে ধারণা তৈরির ক্ষমতা। অর্থবহ শিক্ষা একটি সৃজনশীল পদ্ধতি, এটি শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ ও তার পুনরুদ্ধার নয়, সারবস্তু ও মানসিকতার বহিঃ প্রকাশ। ভাবনা, ভাষা ( মৌখিক ও চিহ্ন) এবং হাতে-কলমে কাজ করা তাই একে অপরের সঙ্গে গভীর সম্পর্কযুক্ত। এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয় শৈশবে এবং বিভিন্ন স্বতন্ত্র ও পরোক্ষ কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রথমদিকে শিশুরা জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রস্তুত থাকে, স্পষ্ট অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণভাবে কাজ করে। যখনই তারা ভাষাগত দক্ষতা ও অনেকের সাথে মিলেমিশে কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করে তখনই বিমূর্ত, অনিশ্চিত ফলাফল সমৃদ্ধ বা কোনো জটিল পরিকল্পনার কাজে যারা সক্ষম তাদের আরো জটিল যুক্তির সম্ভাবনার ক্ষেত্রটি উন্মুক্ত হয়।

বেসরকারী বা সরকারী বহু স্কুল রয়েছে যারা বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। কোঠারী কমিশনের মতে "ভারতের বর্তমান অবস্থায় বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলি এসে পরস্পরের কাছাকাছি একটি সাম্য ও সংযুক্ত সমাজ গড়ে তোলে সেটি শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা তার পরিবর্তে সামাজিক বিচ্ছিন্নতাকে শুধু বাড়িয়েই তুলছে না, পাশাপাশি শ্রেণীবিভেদকে আরও ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করছে ... এই বিচ্ছিন্নতার ফলে ক্রমশই জনগণ ও শ্রেণীগুলির অন্তবর্তী দূরত্ব বিস্তৃত হয়ে চলেছে (১৯৬৬ : ১৮১) আমরা কি আমাদের ছেলেমেয়েদের সবসময় বোঝাতে চেষ্টা করি যে আমরা তাদের স্বাতন্ত্র্যকে সম্মান করি? উত্তরটা যদি অনিচ্ছায় ইতিবাচক হয় তবে এখনি আমাদের কোঠারী কমিশনের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং সামাজিক স্তর ব্যতিরেকে কোনো এলাকার সমস্ত শিশুদের জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ের পদ্ধতিকে বাস্তবায়িত করার কাজে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

সাধারণ বিদ্যালয় ব্যবস্থাকে একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা রূপে সংজ্ঞায়িত করা যায়। ভারতবর্ষের সংবিধানের ভিত্তিতে এটি প্রতিষ্ঠিত এবং জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, শ্রেণী বা স্থান নিরপেক্ষে সমতার ভিত্তিতে সমস্ত শিশুদের সমতুল মানের শিক্ষাদানের এই ব্যবস্থা সক্ষম। বর্তমানে প্রচলিত সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (অর্থাৎ সরকারি, স্থানীয় সংস্থা এবং ব্যক্তি পরিচালিত) দায়িত্ব হল, বিদ্যালয়ের সন্নিকটে বসবাসকারী সমস্ত শিশুদের অবৈতনিক শিক্ষা এবং মৌলিক পরিকাঠামোগত ও বিবিধ সংক্রান্ত রীতিপদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা দান করা।

ধারণার বিকাশ তাই একটি অবিরাম প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নূতন অর্থের সন্ধান পাওয়া যায় ও ঘটনা বা বস্তুসমূহের যোগসূত্রগুলি গভীরতর এবং সমৃদ্ধ হয়। এরই পাশাপাশি চলে তত্ত্বের বিকাশ। শিশুরা তাদের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পৃথিবীর বিভিন্ন তত্ত্বের সম্মুখীন হয়, এমনকি অন্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের বুঝতে সাহায্য করে কেন পৃথিবীটা এমন, কারণ ও ফলাফলের মধ্যে কী সম্পর্ক এবং সিদ্ধান্ত ও কাজের মূল ভিত্তি কী? স্বভাব, আবেগ এবং নৈতিকতা তাই জ্ঞানের বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং ভাষা, মানসিক প্রকাশ ভঙ্গিমা, ধারণা ও যৌক্তিকতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যত বেশি শিশুদের আধি বৌদ্ধিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ততই তারা তাদের ধ্যানধারণা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নিজেদের শিক্ষাকে নিজেরাই পরিচালনা করতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

* সমস্ত শিশুরাই শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ও তারা এর জন্য স্বভাবতই উৎসাহিত হয়। অর্থ সন্ধান, বিমূর্ত বিনা শক্তির বৃদ্ধি, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হল শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

* শিশুরা নানা ভাবে শেখে — অভিজ্ঞতা দিয়ে, কাজের মাধ্যমে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, বই পড়ে, আলোচনা ও প্রশ্ন করে, শুনে, চিন্তা করে এবং প্রতিক্রিয়া জানিয়ে, কথার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে, লেখার মধ্য দিয়ে — স্বতন্ত্রভাবে বা একসাথে। শিশুদের বিকাশের সময় এই সমস্ত প্রকার সুযোগের প্রয়োজন রয়েছে। আবার প্রতিবন্ধী শিশুদের বিকাশ জ্ঞানের বিকাশের সমর্থনে বহুমুখী সংবেদী অভিজ্ঞতা।

* শিশুকে শেখাতে গিয়ে যদি সেটি জ্ঞানগর্ভ উপস্থাপনা হয় তবে কিছুদিন পর থেকে তা শিশুরা আর পছন্দ করে না। শিশুরা অনেক কিছু মনে রাখে কিন্তু সেটা না বুঝেই বা পৃথিবীর সঙ্গে সেটির সম্পর্ককে না অনুভব করেই।

* স্কুলের ভিতর বাইরে উভয়ক্ষেত্রেই শিক্ষাদান চলতে পারে। শিক্ষা সমৃদ্ধ হয় যখন দুটি ক্ষেত্রেই পরস্পর পরস্পরের সাপেক্ষে ক্রিয়াশীল থাকে । শিল্পকলা এবং কাজ সামগ্রিকভাবে শিক্ষায় নান্দনিক ও অবহিত উপাদানের উপস্থিতি সুযোগ ঘটায়। এই জাতীয় অভিজ্ঞতাগুলি ভাষাগত ভাবে বস্তুকে জানার জন্য, বিশেষত: নৈতিকতা ও আদর্শের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । সরাসরি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জীবনের সঙ্গে তাকে যুক্ত করা উচিত।

* শিক্ষাকে গতিময় হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা ধারণাগুলির সঙ্গে, সবসময় একাত্ম হয়ে থাকে ও সেগুলির সম্পর্কে বোঝাপড়াকে গভীরতর করে, পরীক্ষার পরেই শিক্ষার বিষয়গুলিকে ভুলে না যায়। প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে অনেক সময় শেখানোর জন্য বারবার কোনো বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করতে হয়। একই সঙ্গে শিক্ষার বৈচিত্র্যমতায় এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, তারপর চিত্তাকর্ষক ও মনোনিবেশী হয়ে ওঠে। এমন একঘেয়েমি মানেই অনুশীলনটি শিশুর কাছে যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে যার জ্ঞানগত মূল্য অত্যন্ত সামান্য।

২.৩.৩. কৈশোর হল আত্মপরিচয় গড়ে ওঠার একটি জটিল সময়। আত্মবোধ অর্জনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন এবং নব্য প্রজন্মের পরিণত মানুষ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে যে সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা তার সঙ্গে সঠিক বোঝাপড়ার শিক্ষাও সংশ্লিষ্ট। স্বাধীনতা, ঘনিষ্ঠতা এবং সঙ্গীসাথীদের দলগত নির্ভরতা — এই জাতীয় বিষয়ে দায়িত্বশীল আলোচনাও আমাদের কাজের অঙ্গ। এ কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং এ সমস্ত ক্ষেত্রে নিজেদের মানানসই করে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের যথাযথ সহায়তা করা প্রয়োজন। বহির্জগতের প্রাকৃতিক পরিসরে মুক্ত বিচরণ মানুষের মনন গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এটি বিশেষভাবে মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের সামাজিক রীতিনীতিগুলি চারদেয়ালে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করে। একইভাবে ছেলেদের ক্ষেত্রেও রীতিগুলি প্রযোজ্য কিন্তু তার প্রকাশ সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ এক্ষেত্রে ছেলেদের ঘরের বাইরের নানা শারীরিক ক্রিয়ায় উৎসাহিত করা যায়। এই প্রবণতা বিশেষভাবে বেড়ে যায় কৈশোরে শারীরিক পরিপূর্ণতার সময়ে। এসময় বর্তমান ধ্যানধারণা ও নিয়মগুলির সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগে আবার একই সাথে অন্যের বিশেষত: সমবয়সি বন্ধুবান্ধবের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বয়ঃসন্ধিকালে জৈব পরিপূর্ণতা সংক্রান্ত পরিবর্তনসমূহের ফলশ্রুতিতে এই সমস্ত গতানুগতিকা বিশেষভাবে

উচ্চকিত হয়ে ওঠে। বয়ঃসন্ধিকালীন জীবনের বিবিধ সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এইসব শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনগুলি অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে। এই সময় ছোটদের সামাজিক ও আবেগজনিত সাহায্যের প্রয়োজন হয় যাতে তাদের মধ্যেকার সম্পর্কগুলি ভালো থাকে, অন্যের প্রতি বিশেষতঃ অপর লিঙ্গের প্রতি, দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হয়। সঠিক সাহায্যের অভাবে পরিবর্তন সম্পর্কে ধন্দ ও ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয় আর ফলে খেলাধুলা ও বাইরের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে লিঙ্গ, শ্রেণী, জাত, ধর্ম, সংখ্যালঘুত্ব এবং শারীরিক প্রতিবন্ধকতার, কারণে কোন শিশু স্কুলের পঠনপাঠনের অভিজ্ঞতা থেকে যেন বঞ্চিত না হয়। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান সময়ে হামেশাই এর বিপরীত অবস্থাই দেখা যায়। সংস্কার ও নৈতিক আদর্শের পার্থক্য সম্পর্কে ছোটদের ভালভাবে ওয়াকিবহাল করা উচিত। শুধুমাত্র যুক্তি দিয়ে নৈতিক স্বভাব তৈরি করা যায় না। নৈতিক যৌক্তিকতায় পরিবর্তন সাধনের জন্য প্রয়োজন নৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ নিয়ে আলোচনার সুযোগ এবং সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে পারস্পরিক আদানপ্রদানে নিজের প্রতিফলন।

স্বাতন্ত্র্য এবং নৈতিকতা, সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের নিরিখে আপসের মাধ্যমে গড়ে ওঠে । বর্তমান সময়ে ব্যক্তিপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বহুমাত্রিক পরিচয়ের প্রতিও আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। কেননা একজন ভারতীয় হিসাবে যুক্তি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং শান্তি এই বিশ্বসংস্কৃতি দ্বারা আমরা পরিবৃত।

বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত কিশোর-কিশোরীদের যে সামাজিক এবং আবেগসঞ্জাত সহায়তা প্রয়োজন হয়, এ বিষয়টি স্বীকার করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অপরিবর্তনীয় লিঙ্গ-বৈশিষ্ট্যের মোকাবিলা করা, সঙ্গী সাথীদের চাপ সামলানো, তাদের জীবনে প্রতিনিয়ত যে বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়, তার সঙ্গে নিজেকে মানানসই করে তোলার জন্য আবশ্যিক দক্ষতা অর্জন করা, ইতিবাচক আচার-আচরণের রীতিনীতির প্রবর্তন — এই সমস্ত ক্ষেত্রেই তাদের সাহায্যের প্রয়োজন। এমত সহায়তার অনুপস্থিতিতে তাদের মনে এই সব পরিবর্তনের সম্পর্কে নানান ভ্রান্ত ধারণা ও সংশয় সৃষ্টি হবে এবং তাদের পাঠ্য সংক্রান্ত এবং পাঠ্য বহির্ভূত কাজকর্মও ব্যাহত হবে।

২.৩.৪. সমস্ত শিক্ষার্থী, বিশেষত যারা প্রান্তিকতার আশঙ্কাজনক সীমানায় অবস্থিত যেমন প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীরা, সকলেই যাতে শ্রেণীকক্ষের একজন হয়ে উঠতে পারে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা গুরুত্বপূর্ণ। কোনো বিশেষ একজন অথবা একদল শিক্ষার্থীকে শিক্ষাগ্রহণে অক্ষম ইত্যাদি অভিধায় চিহ্নিত করে ফেললে, শিক্ষার্থীদের মনে অসহায়তা, হীনম্মন্যতা এবং কলঙ্কের অনুভব জন্মায়। শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত বিদ্যা-শিক্ষণের অনুপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিবিধ সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের কারণে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যে-সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তাদের ছায়ায় এদের শিক্ষাজীবন অন্ধকারময় হয়ে ওঠে। প্রতিবন্ধী একজন শিক্ষার্থীরও অন্যদের সঙ্গে একই দলের সদস্য হবার সমান অধিকার রয়েছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই যে পার্থক্য সেটিকে সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত না করে বরং শিক্ষালাভে সহায়ক একটি সম্পদ হিসাবে অবশ্যই দেখতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি হল সামাজিক অন্তর্ভুক্তির অন্যতম একটি উপাদান।

অতএব, সকল শিক্ষার্থীই যার নাগাল পাবে এমন একটি নমনীয় পাঠক্রম তাদের সামনে উপস্থাপিত করার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের ওপরই বর্তায়। কোনো একজন শিক্ষার্থী বা তাদের একটি দলের নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী একটি পাঠক্রমের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই দলিল কেবল প্রারম্ভিক বিন্দুটি নির্মাণ করে দেয়। এই পাঠক্রমে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই যথাযথ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করাতে হবে এবং সুবিধা সৃষ্টিতে এটি সক্ষম হবে যাতে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ক্ষমতার নিরিখে সর্বোচ্চ জ্ঞান অর্জন করতে পারে ও শিক্ষায় সাফল্য লাভ করে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান এবং শিক্ষালাভের প্রক্রিয়াটি এমনভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থীদের বিবিধ, বিচিত্র প্রয়োজনে

এটি সাড়া দিতে পারে। ধারণা শক্তি বা বোধের ক্ষেত্রে কয়েকজন শিক্ষার্থীর কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে এমত বিচারে সমস্ত শিক্ষার্থীকেই শিক্ষার সমান সুযোগ দানের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা ইতিবাচক কৌশল সন্ধান করতে পারেন। বিদ্যালয় বহিস্থ সংস্থা বা সহ-শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করলে এই লক্ষ্য অর্জন করা যাবে।

## ২.৪ পাঠক্রম ও অনুশীলনের নিহিতার্থ

২.৪.১ নির্মাণভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে, শিক্ষা হল জ্ঞান নির্মাণের একটি প্রক্রিয়া। পার্থিব / সক্রিয়তার ভিত্তিতে যেসব ধারণা (অভিজ্ঞতা) শিক্ষার্থীদের মনে রয়েছে, তার সঙ্গে নতুন ধারণাসমূহকে যুক্ত করে, তারা সক্রিয় অংশগ্রহণে আপন জ্ঞানভাণ্ডার নির্মাণ করে। উদাহরণ স্বরূপ, পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি লিখিত রচনা অথবা একগুচ্ছ চিত্র বা চাক্ষুষ দৃশ্যাবলীর সঙ্গে কিছু আলোচনা ব্যবহার করে নবীন শিক্ষার্থীদের মনে পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা গঠনের কাজটি সহজতর করে তোলা যায়। পথ-পরিবহন ব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারণার ভিত্তিতেই এই প্রাথমিক নির্মাণকার্য (মানসিক উপস্থাপনা) সংঘটিত হয়। আর একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার একটি শিশুর মনে গরুর গাড়িকে কেন্দ্র করেই পরিবহন ব্যবস্থার প্রাথমিক ধারণাটি গড়ে ওঠে। প্রদত্ত সক্রিয়তার একটি গুচ্ছের (অভিজ্ঞতাসমূহ) মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা মনে বহিস্থ বাস্তবতার (পরিবহন ব্যবস্থা) মানসিক উপস্থাপনা (প্রতিবিম্ব) নির্মিত হয়। শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতিতে ধারণার এই নির্মাণ এবং পুনর্নির্মাণ একটি আবশ্যকীয় উপাদান। উদাহরণস্বরূপ, পথ-পরিবহণের ভিত্তিতে নির্মিত পরিবহণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণাটি পরিবহণের অন্যান্য ব্যবস্থা—যেমন সমুদ্র এবং আকাশ পরিবহন—এদের সঙ্গে মানানসই করে যথাযথ সক্রিতার ব্যবহারে পুনর্নির্মিত করা যায়। সংশ্লিষ্ট সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কার্যকর অংশগ্রহণে, মনুষ্যজীবন / অর্থনীতি এবং একটি পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যস্থ সম্পর্ক সমূহের (কার্য-কারণ) মানসিক প্রতিবিম্ব নির্মাণ আরো সহজতর হতে পারে। অবশ্য এক অর্থে এই নির্মাণ প্রক্রিয়ার একটি সামাজিক দিক রয়েছে এবং সেটি হল যে একটি জটিল কর্তব্য সম্পাদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান সর্বদাই গোষ্ঠীভিত্তিক পরিস্থিতির অভ্যন্তরেই অবস্থিত হতে পারে। প্রসঙ্গত, অর্থের নবতর ব্যঞ্জনার সন্ধান, বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গির লেনদেন এবং বহিস্থ বাস্তবতার মানসিক উপস্থাপনার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই পরস্পর সহযোগী শিক্ষায় যথেষ্ট পরিসর পাওয়া যায়। এখানে নির্মাণ শব্দার্থে এই ইঙ্গিত মেলে যে, ছাত্র বা ছাত্রী যখন শিক্ষালাভ করে তখন প্রতিটি শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত এবং সামাজিক স্তরে এই জ্ঞান নির্মাণ করে। সকলের জন্য শিক্ষার প্রসারে নির্মাণভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী এই জাতীয় কৌশল উপস্থাপিত করে।

শিশুদের জ্ঞান নির্মাণের শিক্ষা অর্জনে শিক্ষকদের ভূমিকা বৃদ্ধি পেতে পারে যদি তারা এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই একটি শিশু জ্ঞান লাভ করে। শিশুদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া যার মাধ্যমে তারা স্কুলের ভিতরের শেখা ও বাইরের ঘটনাগুলিকে মেলাতে পারে। শিশুদের নিজের ভাষায় ও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উত্তর দিতে উৎসাহিত করা, শুধুমাত্র পড়াটুকু মনে রাখা এমনভাবে উত্তর দিতে না শেখানো ইত্যাদি ছোটখাটো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি শিশুদের নিজস্ব বোঝাপড়া গড়ে উঠতে সাহায্য করে। 'বুদ্ধিদীপ্ত অনুমান হল সঠিক শিক্ষাদানের একটি উপকরণ যাকে উৎসাহিত করা উচিত। অনেক সময়ই প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতা থেকে বা প্রচারমাধ্যম থেকে শিশুদের মনে এমন অনেক ধারণা জন্মায় যা তারা শিক্ষকের প্রশংসা না পাওয়ার ভয়ে প্রকাশ করতে পারে না। এটি হল 'যা জানা আছে' আর 'যা প্রায় জানা হয়েছে'-এর মাঝামাঝি একটি অংশ যেখানে নতুন কিছু জানতে পারা যায়। এইভাবে লব্ধ জ্ঞান অনেক সময় দক্ষতায় পরিণত হয়, যেটি স্কুলের বাইরে, বাড়িতে বা গোষ্ঠীতে চর্চিত হয়, সেই সমস্ত জ্ঞান ও দক্ষতা হল শ্রদ্ধেয়। একজন অনুভূতিপ্রবণ এবং ওয়াকিবহাল শিক্ষক বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হলে ছাত্রদের উপযুক্ত অনুশীলনে ব্যাপ্ত রাখতে পারেন যাতে তারা তাদের বিকাশের ব্যাপ্তিকে অনুভব করতে পারে।

সক্রিয় ব্যস্ততার মধ্যে পড়ে প্রশ্ন অনুসন্ধান, বিতর্ক, প্রয়োগ এবং প্রতিফলন যেটি তত্ত্ব গঠন এবং ধারণার সৃষ্টিতে সহায়ক। স্কুলগুলিকে উপরোক্ত বিষয়গুলির মাধ্যমে নতুন ধারণা সৃষ্টির সুযোগ করে দিতে হবে কিন্তু এই

সক্রিয়তা এবং তার সাহায্যে বিভিন্ন ধারণা, দক্ষতা তৈরী হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বাধা কাজ করে। আবার একটি নির্দিষ্ট বয়:গোষ্ঠীর কাছে যেটি বাধা অন্য বয়:গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সেটি সহজ এবং অনাকর্ষণীয় হতে পারে:

প্রশ্নের কাঠামো ...

যদি উত্তর হয় '৫' তবে প্রশ্ন কি হতে পারে? নিচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল —

চারের সাথে এক বেশি হলে কত হয়?

সাতাশের সাথে এক যোগ করে তাকে তেত্রিশ থেকে বাদ দিলে কত হয়?

তুমি কটা মিষ্টি খেতে চাও?

আমি আমার দিদিমার বাড়িতে গেছি রবিবার এবং বৃহস্পতিবার ফিরেছি। আমি কতদিন বাড়িতে রইলাম?

প্রথমে ক, খ ও গ এল, তারপর ঘ, ঙ, ও ছ এল। এরপর ক ও চ চলে গেল। চ ফিরে এল এবং ঘ চলে গেল। শেষ পর্যন্ত কতজন রইল?

যদি উত্তর হয় এটি হল লাল' তা হলে প্রশ্ন কি হতে পারে —

ফুলের রঙ কি ছিল?

তুমি চিঠিটাকে ঐ বাক্সে রাখলে কেন?

কেন রাস্তায় আলো দেখে মেয়েটি থমকে দাঁড়ালো?

অনেক সময় 'বিষয়মুখীনতা'র নামে শিক্ষকেরা সৃজনশীলতা ও নমনীয়তাকে নষ্ট করেন। সরকারী বা বেসরকারী স্কুলে শিক্ষকেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছোটদের বাধ্য করেন কোনো প্রশ্ন একই রকমভাবে উত্তর দিতে। অন্যরকম উত্তরকে মেনে না নেওয়ার যুক্তিগুলি খানিকটা এরকম — 'পাঠ্যবইয়ে নেই এমন কোনো উত্তর দেওয়া যাবে না।'

''আমরা শিক্ষকেরা আলোচনা করে ঠিক করেছি যে শুধু এই উত্তরটিকেই আমরা সঠিক বলে মানব'' অথবা ''যদি অনেক ধরণের উত্তর আসে, তবে কি সবকটিকেই ঠিক বলে ধরব?'' এই ধরনের তর্ক শিক্ষা শব্দটির অর্থকে শুধু হাস্যকরই করে না, একই সঙ্গে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের বোঝাতে চায় যে স্কুলগুলি কেমন অযৌক্তিভাবে অনমনীয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের বিবেচনা করে দেখা উচিত যে কেন আমরা ছোটদের শুধু প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য করি। এমনকি উত্তর থেকে প্রশ্ন তৈরি করাও একটি উপযুক্ত পরীক্ষা হতে পারে।

### ২.৪.২. মিথস্ক্রিয়ার গুরুত্ব

ভাষা ও ক্রিয়ার মাধ্যমে চারপাশের পরিবেশ, প্রকৃতি, বস্তুগৃহ ও মানুষের সাথে মিথস্ক্রিয়ার শিক্ষা সংঘটিত হয়। নানারকম শারীরিক কাজকর্ম যেমন ঘোরাফেরা, অনুসন্ধান। নিজে নিজে কোনো কাজ করা, বন্ধুবান্ধব বা বড়দের সাথে কিছু করা, ভাষাকে ব্যবহার করা — পড়া, প্রকাশ করা বা প্রশ্ন করা, শুনতে এবং প্রতিক্রিয়া জানানো

ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে মানুষ শিক্ষিত হয়ে ওঠে। তাই যে পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাদান ঘটে সেটি সরাসরি জ্ঞানগত তাৎপর্যময়।

আমাদের স্কুলশিক্ষার বেশির ভাগটাই এখনও পর্যন্ত ব্যক্তিভিত্তিক (ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়)। শিক্ষককে এখানে জ্ঞান বিতরণ করতে দেখা যায় — একে সাধারণভাবে শিশুদের তথ্য সরবরাহ করা এবং শিশুদের শিক্ষার জন্য অভিজ্ঞতার চয়ন বলে গুলিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু শিক্ষক, সমবয়সি বন্ধুবান্ধব এবং বড় বা ছোট যেকোনো ব্যক্তির সাথে মিথস্ক্রিয়া শিক্ষার সম্ভাবনাকে সমৃদ্ধ করে। অন্যের সাথে-সাথে-শেখা বলতে একে অপরের সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং হাতে কলমে শেখাকে বোঝায়। এই জাতীয় শিক্ষা সমৃদ্ধ হয় যখন স্কুলগুলি বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক স্তরের শিশুদের একত্রিত হওয়ার সুযোগ দেয়।

প্রাথমিক শিক্ষার গোড়ার দিকে দল বেঁধে কাজ করতে শেখানো হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পে ছাত্রছাত্রীদের যুক্ত করা শিক্ষার অঙ্গ হওয়া উচিত। বিভিন্নভাবে এই দলবদ্ধ শিক্ষার মূল্যায়ন করা যায়। স্কুলে বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের একই দলে মিলিয়ে নিয়েও দলগত কাজ করানো যেতে পারে। এই ধরনের মিশ্র দলে ছোটরা পরস্পরের থেকে সামাজিক মূল্যবোধ ও একসাথে কাজ করার পাঠ নেয়। অন্যের সঙ্গে থেকে এইভাবে কোনো একজন এমন কোনো কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে যা সে একা পারত না।

দলের সাথে কাজ করা, দায়িত্ব নেওয়া এবং হাতে হাতে কাজে অংশগ্রহণ করা, এ সমস্তই জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রেই শুধু গুরুত্বপূর্ণ দিক নয়, শিল্পকলা ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই। বহুস্তরবিশিষ্ট শ্রেণীর ভিন্ন বয়সি দলগুলির ক্ষেত্রে, এই ধরনের উলম্ব দলবিভাগ, যা কিনা বিভিন্ন স্তরকে ছেদ করে এবং বিভিন্ন বয়সের মানুষকে একসাথে একটিমাত্র কাজ করার সুযোগ দেয়, সেটি শিক্ষাদানের পক্ষে উপযুক্ত ও সঠিক পাঠ্যসূচী নির্মাণে সহায়ক হয়।

| প্রক্রিয়া | বিজ্ঞান | ভাষা |
|---|---|---|
| | পরিস্থিতি<br>স্তন্যপায়ীদের বিষয়ে শিক্ষার্থীরা একটি লিখিত রচনা পড়বে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের স্তন্যপায়ীদের জীবন সম্পর্কে একটি দূরবীক্ষণ চিত্র দেখবে। নানান ঘটনা বা সক্রিয়তা দেখানো যায় যেমন, ভূপৃষ্ঠে বা জলে পরিভ্রমণ রত একদল স্তন্যপায়ী চারণক্ষেত্রে ঘুরছে, শিকারকে আক্রমণ করছে, নতুন প্রাণের জন্ম দিচ্ছে, বিপদ বা অন্যান্য ঘটনায় সকলে একত্রিত হচ্ছে। | পরিস্থিতি<br>শিক্ষার্থীরা 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি পড়বে। পরে, গল্পটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তাদের দেওয়া হবে এবং সেই সঙ্গে গল্পে বর্ণিত কয়েকটি দৃশ্যের উদাহরণসহ কিছু নেপথ্য উপাদান তাদের দেওয়া হবে। এই উদাহরণে বর্ণিত একটি বা দুটি দৃশ্যে কয়েকজন শিক্ষার্থী অভিনয় করবে। |
| নিরীক্ষা | স্তন্যপায়ীদের কাজকর্ম, বা আচার ব্যবহার অথবা প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি শিক্ষার্থীরা লিপিবদ্ধ করবে। | অভিনীত দৃশ্যগুলি শিক্ষার্থীরা দেখবে। |
| বর্ণনার প্রাসঙ্গিকতা | তারা নিজেদের ব্যাখ্যাকে পাঠ্যাংশের সঙ্গে যুক্ত করবে। | নেপথ্য উপাদানের উদাহরণের সঙ্গে পাঠ্যাংশের কাহিনীকে যুক্ত করবে। |
| ধারণা সংক্রান্ত শিক্ষানবিশি | শিক্ষক বা শিক্ষিকা বর্ণনা করবেন যে কীভাবে স্তন্যপায়ীর উদাহরণ ব্যবহার করে ছাত্র বা ছাত্রী এই সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ এবং বিশদ ব্যাখ্যা করতে পারে। | কীভাবে পঠিত কাহিনী এবং নেপথ্য উপাদানের বর্ণনার মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়, অভিনীত দৃশ্যকে ব্যবহার করে শিক্ষক / শিক্ষিকা তার একটি আদর্শ উপস্থাপিত করবেন। |

| প্রক্রিয়া | বিজ্ঞান | ভাষা |
|---|---|---|
| সহযোগ | কোনো একটি কর্তব্য পালনে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করবে এবং তাদের কাজে তারা যখন এগিয়ে যাবে তখন শিক্ষক বা শিক্ষিকারাও তাদের পরামর্শ দেবেন বা চালনা করবেন। | নানাভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দল গঠন করে একত্রে কাজ করবে এবং তাদের অগ্রগতির পথে শিক্ষক / শিক্ষিকারা তাদের পরামর্শ দেবেন বা চালনা করবেন। |
| বিশদ ব্যাখার নির্মিত | জলে বা স্থলে ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী স্তন্যপায়ীদের সম্পর্কে নিজেদের মনে তারা যেসব উপায় সমূহ গড়ে তুলেছে, তাদের পরখ করার জন্য সেগুলিকে শিক্ষার্থীরা বিশদ ব্যাখ্যা করবে এবং আবশিক প্রমাণ সৃষ্টি করবে। | কাহিনী সম্পর্কে তারা নিজস্ব ব্যাখ্যা সৃষ্টি করবে এবং তাকে ব্যাখ্যা করবে |
| বহুমুখী বিচিত্র ব্যাখ্যাসমূহ | নিজ দলের অভ্যন্তরে এবং অন্যান্য দলের সঙ্গে লিখিত পাঠ এবং নিজ ব্যাখ্যা, দুটিই কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীরা আপন ধারণা বা উপায়ের পক্ষে যুক্তি বিস্তার করবে এবং তার বিশদ ব্যাখ্যা দেবে। প্রদত্ত পাঠ সহ তাদের নিজস্ব যুক্তি এবং প্রমাণে তথ্যের ব্যাখ্যা অথবা উত্তরসন্ধানের বিভিন্ন পথ বা উপায়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হবে। | নিজ দলের অভ্যন্তরে এবং অন্যান্য দলের সঙ্গে নিজের ব্যাখ্যাগুলিকে তুলনা করলেই শিক্ষার্থীর মনে এই ধারণা বা বোধ সৃষ্টি হবে যে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া হতে পারে। |
| বহুমুখী, বিচিত্র উপস্থাপনা | আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে এবং স্তন্যপায়ীদের আচার ব্যবহার ও বিভিন্ন ঘটনাকে প্রতিটি বিষয়ভিত্তিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যুক্ত করে শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করবে যে, তারা যে কাজ করছে তারই মধ্যে দৃঢ়ভাবে নিহিত সাধারণ একটি নীতি ক্রমশ উপস্থাপিত হচ্ছে। | লিখিত পাঠ, কাহিনীর নেপথ্যচারী উদাহরণ এবং তাদের নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা দেখবে যে কেমনভাবে একই চরিত্র এবং মূল প্রতিপাদ্যটি বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করা যেতে পারে। |
| শিক্ষক / শিক্ষিকার ভূমিকা | এ ক্ষেত্রে, শিক্ষক / শিক্ষিকা হলেন একজন সহজিয়া মানুষ, যিনি জ্ঞান-নির্মিতির প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের আপন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে, তাদের বিশ্লেষণ ও বিশদ ব্যাখ্যার কাজে সর্বদাই উৎসাহিত করেন। | |

## ২.৪.৩. শিক্ষার অভিজ্ঞতার রূপায়ণ

শিক্ষার অনুশীলনের মান এর শিক্ষণীয়তা এবং শিক্ষার্থীর কাছে তার মূল্যকে প্রভাবিত করে। যে-সমস্ত অনুশীলন খুবই সহজ বা খুবই শক্ত, যেগুলি পুনরাবৃত্তিময় এবং যান্ত্রিক, যা শুধুমাত্র পাঠ্যের হুবহু নকল করা, যেখানে শিশুদের স্বতন্ত্র বহিঃ প্রকাশ এবং প্রশ্ন করাকে অনুমতি দেয় না বরং শিক্ষকের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে শেখায় সংশোধনের জন্য যেগুলি শিশুদের পরোক্ষভাবে বাধ্য হওয়ার প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনার সমতা বা যুক্তিবোধের মূল্যায়ন করার জন্য শেখে না। জ্ঞান গড়ে ওঠে অন্যের দ্বারা এবং ওরা

শুধু তাকে গ্রহণ করে। শিক্ষকের পক্ষে সাধারণভাবে নিষ্ক্রিয় শিশুদের উদ্দীপ্ত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

অভিজ্ঞতার চয়ন

কোনো ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করা যেমন, বাস্তব অবস্থায় অঙ্কুরোদগম পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করা, দুধ সংগ্রহের বিভিন্ন স্তর, কোনো ডেয়ারি ফার্মে নানাজাতীয় দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরী হয়ে বাক্সবন্দি হওয়া ইত্যাদি।

শরীর ও মনের চর্চা যেমন কোনো বিষয়ে নিয়ে অভিনয়ের পরিকল্পনা ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ।

শিশুর অভিজ্ঞতা আছে এমন কিছু বিষয় কথাবার্তা বলা এবং সেটিকে প্রতিফলিত করা (উদাহরণস্বরূপ সমাজ ও পরিবারে লিঙ্গের পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করা বা সংখ্যা নিয়ে কোনো বুদ্ধির খেলায় অংশগ্রহণ)

ভারী জিনিস তোলার জন্য পুলি জাতীয় যন্ত্র তৈরীর চেষ্টা করা

লিখন, অঙ্কন এবং প্রদর্শন সংক্রান্ত অনুশীলন অভিজ্ঞতার পরে শিক্ষকদের কোনো আলোচনা, স্পষ্ট মনোভাব জানানো তারা লেখালেখি, আঁকা বা প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পারে। তিনি ছোটদের সাথেই খুঁজতে পারেন কি প্রশ্ন হতে পারে আর তার উত্তরই বা কি হবে।

শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান এবং অন্যান্য তথ্যকে সংযুক্ত করে অভিজ্ঞতাকে গভীরতর করতে পারেন। পাঠ্যপুস্তকে গঠিত জ্ঞান এবং অন্যান্য উদাহরণের সঙ্গে তিনি তার অভিজ্ঞতার যোগসূত্র খুঁজে পায় এবং তার অভিজ্ঞতা আরও গভীর হয়ে ওঠে।

এই ধরনের অভিজ্ঞতা ও তার পরবর্তী কাজকর্মগুলি শিক্ষার যে-কোনো স্তরেই মূল্যবান। শুধুমাত্র স্বভাব, ধরন এবং জটিলতাগুলিরই পরিবর্তন প্রয়োজন। ভাষা হল অভিজ্ঞতা চয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি। তাই অভিজ্ঞতা এবং ভাষার বিকাশের স্তরের মধ্যে সঠিক সমন্বয় সাধন প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীরা নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয় এবং নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে চায়। এই প্রবণতা শেষপর্যন্ত স্ব-প্রতিফলন এবং নমনীয়তার পক্ষে ক্ষতিকারক। অবশ্য যদি শিক্ষা শিক্ষার্থীকে শক্তিশালী করবে এমনই লক্ষ্য থাকে। সপ্তম শ্রেণীতে পৌঁছোনোর পর এধরণের পরিবেশে মানুষ হয়েছে এমন শিশুরা আত্মবিশ্বাস প্রমাণ করার ক্ষমতা এবং স্কুলের অভিজ্ঞতার অর্থ নির্ধারণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তারা বারবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যান্ত্রিকভাবে মুখস্থ করার চেষ্টা করে।

অপরদিকে কোনো কঠিন অনুশীলন বা স্বাধীন চিন্তাকে গুরুত্ব দেয় এমন কোনো কাজ যা বৌদ্ধিক পদ্ধতিতে করা যায় সেটি ছাত্রের স্বাধীনতা, সৃষ্টিশীলতা ও আত্ম অনুশাসনকে উৎসাহিত করে। ক্যুইজ বা চট্‌জলদি উত্তর এবং সর্বক্ষেত্রে সঠিক উত্তর জানার পরিবর্তে আমাদের উচিত ছাত্রদের অর্থপূর্ণ শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করতে বলা।

যে সমস্ত অনুশীলন শিশুদের পড়ার বইয়ের বাইরে জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ জোগায়, তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বাড়িতে বা গোষ্ঠীর কাছ থেকে, পাঠাগার ও স্কুলের বাইরে অন্যান্য জায়গা থেকে সেগুলি এই দর্শন মেনে চলে যে শিক্ষা এবং জ্ঞানের অনুসন্ধান করতে হয়, তারপর তার সত্যতা যাচাই করে তাকেগ্রহণ করতে হয়। এখানে শিক্ষক বা পাঠ্যপুস্তর কেউই শেষ কথা বলে না। এক্ষেত্রে ঐতিহ্যময় স্থানগুলি জ্ঞানের উৎস হিসাবে খুবই তাৎপর্যময়। শুধুমাত্র ইতিহাসের শিক্ষক নন, সব বিষয়ের সব শিক্ষকদেরই দায়িত্ব যাতে তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা শিশুদের মধ্যে ঐতিহাসিক স্থানগুলি সম্পর্কে সমান আগ্রহ তৈরী হয় এবং তারা সেগুলিকে অনুসন্ধান করে তাদের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে উৎসাহিত হয়।

এই ক'বছরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য পাঠক্রম পরিকল্পনা ও শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ উন্নতিসাধনে বেশ কিছু প্রচেষ্টা হয়েছে। সেই প্রচেষ্টাগুলিকে পুর্নবিবেচনা ও শক্তিশালী করার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনই প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত বড় ছাত্রদের জন্য শিক্ষার অভিজ্ঞতা তৈরী করা যা তাদের বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে সচেতন করতে এবং শিক্ষা থেকে জ্ঞান গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

এক্ষেত্রে পরিকল্পনায় নমনীয়তা, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের বক্তব্যগুলিকে গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে আমরা বদ্ধ ঘরের জানলা খুলে NPE-86 -এর লক্ষ্যে পৌছতে পারি। এজন্য শিক্ষকের দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন যাতে তারা শিশুদের শিক্ষার প্রতিফলন অনুযায়ী নিজেদের মত করে শিক্ষার পরিকল্পনা করতে পারেন। বর্তমানে শিক্ষাসংক্রান্ত সংস্কারের প্রচেষ্টাগুলি এখন পর্যন্ত খুবই কেন্দ্রীভূত। গ্রাম সমিতি ব্লক সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রগুলির সহযোগিতার মাধ্যমে, স্থানীয় শিক্ষিত মানুষ এবং শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক গ্রন্থ ও সম্পদ থাকলে সম্ভব হবে।

### ২.৪.৪ পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গি

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত কিছু সীমিত 'অনুশীলন পরিকল্পনা'র উপর নির্ভর করে আছে যার মূল লক্ষ্য হল 'আচরণ' তৈরী করা। এই ধারণা অনুযায়ী শিশুকে হয় কোনো প্রাণী বলে গণ্য করে শিক্ষা দেওয়া যায় অথবা কোনো কম্পিউটার ভাবা হয় যাকে প্রমাণিত করতে হবে। তাই এখানে ফলাফলের প্রতি জোর দেওয়া হচ্ছে এবং ছোট ছোট তথ্যের আকারে জ্ঞানের প্রকাশ করা হচ্ছে যেগুলি সরাসরি পাঠ্যবই থেকে বা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শিশুরা মনে করছে এবং শেষমেশ মিলিয়ে দেখা হচ্ছে যে তারা সত্যিই মনে করতে পারছে কিনা। পরিবর্তে আমাদের এইভাবে ভাবা উচিত যে শিশুরা তাদের 'জ্ঞানের বিকাশ' ঘটাচ্ছে। সর্বক্ষণ এটি শুধুমাত্র 'গুরুভার বিষয়গুলি' যেমন অঙ্ক এবং বিজ্ঞানের ভাষা এবং সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, সমানভাবে মূল্যবোধ, দক্ষতা এবং স্বভাবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বহু শিক্ষক, মূল্যায়ক এবং পাঠ্যপুস্তক রচয়িতারা এটিকে সত্য বলে মানতে রাজি নন।

* 'সক্রিয়তা' শব্দটি বর্তমানে বেশিরভাগ প্রাথমিক স্কুলশিক্ষকের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলেও অনেক ক্ষেত্রেই এটিকে প্রায় জোর করে 'হারবারশিয়ান' পাঠ্যসূচী পরিকল্পনায় জুড়ে দেওয়া হয়েছে যা কিনা প্রতিটি অনুশীলনীর শেষে 'ফলাফল' নিয়েই উদব্যস্ত। এখন এর উপযুক্ততা নিয়ে নানা কথা শোনা যাচ্ছে তবুও অনুশীলনীর মধ্যে এই বিষয়টিকে ফলাফলের নামে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে । বিপরীতে শিক্ষকদের উচিত প্রতিটি বিষয়ের জন্য চার থেকে পাঁচ ঘণ্টার ছোট ছোট এককের পরিকল্পনা করা। দক্ষতা ও বোঝাপড়া গড়ে ওঠা সম্ভব শুধুমাত্র দক্ষতাকে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে ব্যবহার করতে করতে। যখন জ্ঞান, বোঝাপড়া একটি একক শেষ হবার পর এবং পরে কোন পুনমূল্যায়িত সময়ে উভয়ক্ষেত্রে জ্ঞান, উপলব্ধি এবং দক্ষতার মূল্যায়ন করা যায়। সেক্ষেত্রে মূল্যায়নের বৃত্তটি যোগ্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে দীর্ঘতর হওয়া প্রয়োজন।

* সক্রিয়তা শিক্ষকদের আলাদাভাবে শিশুদের প্রতি যত্নবান হতে এবং অনুশীলনীর প্রয়োজনীয়তা এবং বৈচিত্র্য অনুযায়ী অনুশীলনীতে পরিবর্তন সাধন করতে সাহায্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে শিশু ও অপেক্ষাকৃত বড় শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষের অনুশীলনে যুক্ত করা সম্ভব হলে এই ধরণের অনুশীলন আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এছাড়াও এর ফলে শিক্ষকেরা যাতে সেই সব শিশুদের ডাকে সাড়া দিতে পারেন সেজন্য শব্দের মনোযোগ প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত শিক্ষক ও প্রত্যেকটি শিশুর মধ্যেকার সম্পর্কটি গভীর নয়। শিশুদের দল হিসাবেই গণ্য

করা হয় এবং শুধুমাত্র 'মেধাবী' বা 'অসুবিধাজনক' শিশুদের আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা। এই ধরণের মনোযোগ পেলে তা সব শিশুদের জন্যই উপযোগী।

* যেসব শিশুদের শেখার অসুবিধা রয়েছে বা যাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার দরকার আছে এমন একটি শ্রেণীর অনুশীলনের পরিকল্পনা থেকে বোঝা যায় যে শিক্ষক কিভাবে তার কাজকে শিশুদের প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করেন। শেখার ব্যর্থতাকে বর্তমানে যান্ত্রিকভাবে দূর করার চেষ্টা চলছে, অর্থাৎ শুধুমাত্র একই অনুশীলনগুলিকে বারংবার সেইসব শিশুদের কাছে পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। অনেক শিক্ষক এই শিশুদের সমস্যাকে সমাধানের জন্য ওষুধের খোঁজ করছেন। তাঁরা এখনও পর্যন্ত এইসব শিশুদের শিক্ষাদানকে ব্যক্তিসাপেক্ষে আলাদা করতে পারছেন না, ঐ শিশুরা যা পারে তার উপরই ভিত্তি করে শেখাতে পারছেন না। কয়েকজন শিশু যে সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে। শিশুদের নিজের মধ্যেই যে শক্তি আছে তারই ভিত্তিতে প্রতিটি শিশুকে তাদের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী শিক্ষিত করে তোলার কাজটি তাদের এখনো কঠিন বোধ হয়।

* শিক্ষকদের বুঝতে হবে যে অনুশীলনের পরিকল্পনা কিভাবে করলে শিশুরা বাধ্য হবে ভাবতে এবং বুঝতে যে তারা ঠিক কি শিখছে, শুধুমাত্র যা বলা হচ্ছে তার পুনরাবৃত্তি করবে না। একটি নতুন সমস্যা হল যে ''সক্রিয়তা'' ও ''খেলাচ্ছলে শেখানো'' অর্থে শিক্ষাকে এতটাই লঘু করা হচ্ছে যে শিশুদের ক্ষমতার স্তরের থেকে অনেক নিম্নস্তরের অনুশীলন দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া এক্ষেত্রে আরেকটি চিন্তার বিষয় হল এই যে কাজের মধ্য দিয়ে শেখার বিষয়টি খুবই সময়সাপেক্ষ হয়ে উঠতে পারে এবং এর ফলে শিক্ষককে অনেক বেশি সময় দিতে হবে। অবশ্যই এই পদ্ধতিটি কার্যকর করতে পরিকল্পনা ও কাজের প্রস্তুতির জন্য সময় নির্ধারণ করতে হবে। প্রাথমিকভাবে শিক্ষকদের উচিত কাজগুলিতে শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বস্তু ও স্থানের ব্যবহার সম্পর্কে কিছু নিয়ম বেঁধে দেওয়া।

* বিবিধ ক্ষমতাসম্পন্ন, বিভিন্ন স্তরের অথবা তির্যক সমাপতনে গঠিত একটি শ্রেণীকক্ষে নির্দেশের কার্যকর ব্যবস্থাপণার সঠিক চাবিকাঠি হল, ব্যক্তিগত স্তরে ছোট ছোট দলে এবং সমগ্র দলভিত্তিক কাজের জন্য যথাযথ উপাদন - সম্পদের যোগান দিতে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করা।

* শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক / শিক্ষিকাদের প্রচলিত নিয়মনীতি, ব্যবহৃত উপাদান এবং অনুসৃত মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি এদের অন্তর্বস্তুর বিচারে অবশ্যই পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

### ২.৪.৫ সমালোচনামূলক শিক্ষাদান

শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যেকার সম্পর্ক শ্রেণীকক্ষে জটিল হয়ে দাঁড়ায় কারণ এই সম্পর্কের জোরেই নির্দিষ্ট হয় কার জ্ঞান স্কুলসংক্রান্ত জ্ঞানের অংশবিশেষ হয়ে উঠবে এবং কার কণ্ঠস্বর সেগুলিকে আকার দেবে। ছাত্রদের শুধুমাত্র ছোট বলে গণ্য করা চলবে না যাদের জন্য বড়রা সমাধান নির্দেশ করে দেবে। তারা নিজস্ব শর্ত ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি নির্দিষ্টভাবে সচেতন হবে এবং শিক্ষা ও ভবিষ্যতৎ সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত আলোচনা ও সমস্যার সমাধানগুলিতে তাদের অংশগ্রহণ করা উচিত। তাই এইটি বোঝানো খুব জরুরি যে তাদের অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিকোণ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং নিজস্ব মানসিক দক্ষতা, চিন্তাশক্তি ও স্বতন্ত্র যৌক্তিকতা তৈরি করতে তাদের উৎসাহিত করতে হবে ও মতবিরোধ প্রকাশ করার সাহস যোগাতে হবে। শিশুরা যা স্কুল থেকে শেখে — তাদের দক্ষতা, শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা, এবং জ্ঞানের ভিত্তি — এবং যা স্কুলে নিয়ে আসে তা শিক্ষার প্রক্রিয়াটিকে আরও বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে। কিন্তু এটি অবদমিত প্রেক্ষাপট থেকে আসা শিশুদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মেয়েদের বেলায় আরও সঙ্কটময় হয়ে দাঁড়ায় যেহেতু তাদের বাস্তবতা এবং তাদের বসবাসের পৃথিবীটা স্কুল থেকে লব্ধ জ্ঞানের মধ্যে প্রকাশ পায় না বললেই চলে।

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক দিকগুলির নিরিখে বিভিন্ন বিষয়গুলিকে সমালোচনার দৃষ্টিতে প্রতিফলিত করার সুযোগ নেয়। এটি সামাজিক বিষয়ের প্রতি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে মান্যতা দেয় এবং মিথস্ক্রিয়ার গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি অনুগত। আমাদের স্কুলগুলির বহুমুখী পরিপ্রেক্ষিতের দিক থেকে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি ছিদ্রান্বেষী পরিকাঠামো শিশুদের সামাজিক বিষয়গুলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে ও তাদের নিজেদের জীবনে সেগুলির যোগসূত্র খুঁজে পেতে শেখায়। উদাহরণস্বরূপ গণতন্ত্রকে বাঁচার পদ্ধতি হিসাবে বুঝতে গেলে জীবনকে এমন একটি পথে চালিত করতে হবে যাতে প্রতিফলিত হয়, শিশুরা অন্যদের (বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী, অপর লিঙ্গ, বড়রা ইত্যাদি) কেমন শ্রদ্ধা করে, কেমনভাবে তারা বেছে নেয় (যেমন নানা ধরণের কাজ, খেলাধুলা, বন্ধুবান্ধব, জীবিকাঅর্জন ইত্যাদি) এবং কেমন করে তারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে বিকশিত করে। একইভাবে, মানবাধিকার, জাত, ধর্ম এবং লিঙ্গ সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে শিশুদের মধ্যে কার্যকরীভাবে প্রতিফলিত করে বোঝা যায় যে তাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় কীভাবে এই বিষয়গুলি জড়িয়ে আছে, কীভাবে অসাম্যের বিভিন্ন দিকগুলি একত্রিত হয়ে চিরকালীন হয়ে ওঠে। সমালোচনামূলক শিক্ষাদান মুক্ত আলোচনা এবং বিভিন্ন মতামতকে চিহ্নিত করো ও তাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সহজ করে দেয়।

**কেন নতুনত্বহীনতা বজায় থাকে?**

একটি ভাবনার বিষয় হল প্রান্তিজগোষ্ঠীগুলি বিশেষত: দলিত ও উপজাতি সমাজের মানুষের, যাদের ঐতিহ্যে স্কুলের পঠনপাঠন অথবা শিক্ষালাভ বা স্বাক্ষরতার সুযোগ ছিল না, তাদের শিশুদের ক্ষেত্রে বাঁধাধরা মনোভাব। এই সমাজের শিক্ষার্থীদের ঐতিহাসিক ভাবেই শিক্ষার অযোগ্য, উচ্চশিক্ষার অনুপযুক্ত, পিছিয়ে পড়া এমনকি শিক্ষার ভয়ে ভীত ইত্যাদি বিশেষণ অভিহিত করা হয়েছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে একই মনোভাব দেখা যায়। যার ফলে এই ধারণা তৈরি হয় যে মেয়েরা খেলাধুলা বা অঙ্ক এবং বিজ্ঞানে আগ্রহী নয়। এছাড়াও প্রতিবন্ধী শিশুদের সম্পর্কের একইরকম মানসিকতা দেখা যায় যে তাদের সুস্থ শিশুদের সাথে শিক্ষা দেওয়া যায় না। এই মনোভাবের কারণ হিসাবে বলা যায় যে লিঙ্গ, জাত, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে অসাম্য এবং বিকৃষ্টতার সমস্যাগুলি থাকে। সংখ্যার বিচারে কিছু কিছু সাফল্যের কাহিনী সত্ত্বেও বেশিরভাগই অসফল হয় ও নিজেদের খামতি নিয়ে বিচলিত থাকে। সংবিধানের সাম্যের মূল বোধগুলিকে স্মরণ করা সম্ভব যদি আমরা সব শিশুদের সমান চোখে দেখার মতো করে শিক্ষকদের প্রস্তুত করি। এজন্য আমাদের শিক্ষকদের সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক বৈচিত্র্যকে বুঝতে ও নিজেদেহ সেই ধাঁচে পরিণত করতে সাহায্য করা উচিত, যা শিশুরা বিদ্যালয়ে নিয়ে আসে।

আমাদের অনেক স্কুলগুলিতে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী, শিক্ষাদানকে পুনর্বিবেচনা করা উচিত যখন শিশুর বাড়ি থেকে নিয়মমাফিক পড়াশুনার প্রতি সমর্থন থাকে। প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে স্কুলের উপর নির্ভর করে — তাদের পড়াশোনা, লেখালেখির দক্ষতা এবং পাঠের রুচি, স্কুলের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে মিলেমিশে যাওয়ার জন্য বিশেষ করে যদি বাড়ির ও স্কুলের ভাষা আলাদা হয়। বাড়ির কাজে সহায়তা সেক্ষেত্রে অতি সামান্য বা নেই বললেই চলে। অনেক শিশুই বাড়ির অবস্থার জন্য কুণ্ঠিত যার জন্য তারা সময় মেনে না চলা, অনিয়মিত হওয়া শ্রেণীকক্ষে অমনোযোগিতা ইত্যাদি করে থাকে। স্থান বিশেষে শিশুদের মুক্ত করার প্রচেষ্টা এবং এই সমস্ত বিষয়গুলির প্রতি সহানুভূতিশীল পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।

অংশগ্রহ্যণকারী শিক্ষা এবং শিক্ষাদান, আবেগ ও অভিজ্ঞতার একটি নির্দিষ্ট এবং মূল্যায়ন স্থান থাকা উচিত শ্রেণীকক্ষে। অংশগ্রহণ একটি শক্তিশালী কৌশল দীপ্ত যখন তা সংস্কার হয়ে দাঁড়ায় তখন তার শিক্ষাদান সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে বলা যায় শিক্ষককের নিজস্ব অভীষ্টে পৌছনোর উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃত অংশগ্রহণ শুরু হয় ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের অভিজ্ঞতা থেকে।

যখন ছাত্ররা ও শিক্ষকেরা তাদের সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ভাগ করে নেয় ও প্রতিফলিত করে, বিচারের ভয় না করে তারা পরস্পরের সম্পর্কে জানার সুযোগ পায় যেটি হয়ত তাদের নিজস্ব সামাজিক সত্যতা অংশ নয়। এর ফলে তারা ভীত হওয়ার পরিবর্তে পার্থক্যগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়। যদি শিশুদের সামাজিক অভিজ্ঞতাগুলিকে শ্রেণীকক্ষে আনতে হয়, দ্বন্দ্বের বিষয়গুলি উত্থাপিত হবেই। শিশুদের জীবনে দ্বন্দ্ব একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। ওরা সর্বক্ষণ নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে যায় যা নৈতিক বিচার ও সক্রিয়তাকে আহ্বান করে, হতে পারে সেটি আত্মপ্রকাশের দ্বন্দ্বের অভিজ্ঞতা যাতে যুক্ত থাকে সে নিজে তার পরিবার তথ্য সমাজ অথবা হতে পারে বর্তমান পৃথিবীর কোনো বিধ্বংসী দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বকে শিক্ষা কৌশল হিসাবে ব্যবহার করতে গেলে শিশুদের এটির চরিত্র সম্পর্কে ও জীবনে তার ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে এবং পাশাপাশি তাকে দ্বন্দ্বের সাথে মোকাবিলা করতে দিতে হবে।

'প্রতিটি পাঠ্য বিশদে পড়তে' শেখা, প্রাপ্ত জ্ঞানকে তীব্র প্রশ্নে জর্জরিত করা তা সে জ্ঞান 'একপেশে' পাঠ্যপুস্তক বা অন্যান্য সাহিত্যিক উৎস যোগান থেকেই পাওয়া যাক না কেন — এই সমস্ত ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে মতামত দেওয়া, তুলনা করা, বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা করা অর্থাৎ তার চারপাশে যা কিছু রয়েছে সর্ব বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশে উৎসাহিত করতে হবে। মহিলা এবং দলিত শিক্ষাবিদরা গানকে আলোচনা, মতামত প্রকাশ এবং বিশ্লেষণের একটি শক্তিশালী মাধ্যমগুলি যেহেতু জ্ঞানের আধার বর্তমান, দূরদর্শন বিজ্ঞাপন, গান, ছবি ইত্যাদি শিক্ষার্থী ও তাদের মধ্যে গতিময় মিথস্ক্রিয়ার সৃষ্টি প্রয়োজন আছে।

এমন একটি শিক্ষাপদ্ধতি যা কিনা লিঙ্গ, শ্রেণী, বর্ণ এবং আন্তর্জাতিক অসাম্যের প্রতি অনুভূতিশীল, যেটি শুধুমাত্র বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অভিজ্ঞতাকে মর্যাদাই দেয় না একই সঙ্গে শক্তির বিশালাকায় কাঠামোর মধ্যে একে স্থাপন করে এবং নানান প্রশ্ন তোলে যেমন কাকে কার পক্ষে কথা বলার অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে?

কার অভিজ্ঞতার মূল্য সবচেয়ে বেশি? এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন শিক্ষার্থীর জন্য বিভিন্ন কৌশল সৃষ্টি করা। উদাহরণস্বরূপ কোনো কোনো ছাত্রের ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষে কথা বলাকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন আবার অন্যদের ক্ষেত্রে হয়তো অপরের বক্তব্য শোনার প্রয়োজন আছে।

শিক্ষকের ভূমিকা হল ছাত্রদের জন্য নিরাপদ ব্যাপ্তিস্থানের সৃষ্টি করা যাতে তারা নিজেদের প্রকাশ করতে পারে ও পাশাপাশি মিথস্ক্রিয়ার কিছু নির্দিষ্ট রূপ গড়ে তুলতে পারে, তাদের প্রয়োজন ' নৈতিক পণ্ডিত'-এর ভূমিকা থেকে বেরিয়ে এসে হৃদয় দিয়ে এবং বিচারকের ভূমিকা না নিয়ে ছাত্রদের কথা শোনা এবং ছোটদের পরস্পরের কথা শুনতে আগ্রহী করা। শিক্ষার্থীর বোঝার সীমারেখাকে ছোট করা বা গঠনমূলকভাবে বড় করার সময় শিক্ষকদের সচেতন থাকা প্রয়োজন যে কিভাবে পার্থক্যগুলিকে প্রকাশ করা হয়। শ্রেণীকক্ষে বিশ্বাসের আবহাওয়া তৈরী হলে ছাত্ররা নিরাপদে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারবে। দ্বন্দ্বের সৃষ্টি এবং গঠনমূলকভাবে তাকে প্রশ্ন করতে পারবে এবং সেখানে সমাধান, যদিও সাময়িক, পারস্পরিক প্রক্রিয়ায় খুঁজে পাওয়া যাবে। নির্দিষ্ঠভাবে বললে অবদমিত সামাজিক গোষ্ঠীর মেয়েদের ও শিশুদের ক্ষেত্রে স্কুল এবং শ্রেণীকক্ষগুলিকে ব্যাপ্তিস্থান হয়ে উঠতে হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনার জন্য। সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তিকে প্রশ্ন করার জন্য এবং তথ্যসমৃদ্ধ নির্বাচন প্রক্রিয়া তৈরি করার জন্য।

## ২.৫ জ্ঞান ও বোঝাপড়া

'ছোটদের কী শেখানো হবে' এই প্রশ্নটি আরও গভীর প্রশ্নের জন্ম দেয়, যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন লক্ষ্যগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত — এটি একটি দূরদর্শী ভাবনা যে প্রতিটি ব্যক্তির দক্ষতা ও মূল্যবোধ থাকবে এবং সমাজের জন্য একটি সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে। কোনো বিচ্ছিন্ন লক্ষ্য নয়, একাধিক লক্ষ্যের সমষ্টি। তাই নিব্যাচিত বিষয়টির সম্পূর্ণ সমষ্টির সঙ্গে সঠিক আচরণ প্রয়োজন, এর ফলে এটি বৃদ্ধি পাবে ও ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছবে। পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা যা যুক্তি দিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতার সম্পর্কে প্রগতিশীল উপস্থাপনার মাধ্যমে, নিয়ম, নান্দনিক বোধ, অন্যের প্রতি অনুভূতিপ্রবণতা দিয়ে পৃথিবীকে বোঝার মাধ্যমে, অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় কাজ করে ও অংশগ্রহণ করে জ্ঞানের ভিত্তি তৈরী করবে। এই অংশটিতে জ্ঞানের প্রকৃতি ও রূপ নিয়ে আলোচনা করব যা তথ্যপূর্ণ পাঠ্যক্রমের নির্বাচন বিষয়ের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন।

> কথা-বলা চিত্র / ছবি
>
> সমগ্র শ্রেণীকে একটি গৃহস্থালির চিত্র দেখান যেখানে পরিবারের বিভিন্ন সদস্যেরা বিভিন্ন দায়িত্বশীল কর্মে নিযুক্ত। শুধুমাত্র পার্থক্য হল যে, বাবা রান্না করছেন, মা একটি বৈদ্যুতিক আলো আটকাচ্ছেন, মেয়েটি সাইকেলে চেপে বিদ্যালয় থেকে ফিরছে, ছেলেটি গরুর দুধ দুইছে, এদের অন্য বোন আমগাছে চড়ছে, অন্য ভাই ঘর মুছছে। ঠাকুরদাদা বোতাম সেলাই করছেন আর ঠাকুমা খাতায় হিসাব কষছেন।
>
> চিত্রটি সম্বন্ধে শিশুদের কিছু বলতে বলুন।
>
> কোন 'কাজগুলিকে' তারা সনাক্ত করতে পারে?
>
> ওদের কি মনে হয় এমন কোনো কাজ আছে যেটি ঐসব মানুষের করা উচিত নয়?
>
> কেন?
>
> শ্রমের মর্যাদা, সাম্য এবং লিঙ্গ সংক্রান্ত আলোচনায় তাকে যুক্ত করুন। প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষের স্বাবলম্বী এবং পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠার গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করুন।
>
> অনুরূপ কথা-বলা চিত্রের সাহায্যে অন্যান্য অনেক বিষয়ে, যেমন, ভালো এবং মন্দ কাজ, গতানুগতিক বর্ণবিভাজন, কাজের মূল্যপ্রযুক্ত চরিত্র —ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।

জ্ঞান হল কতকগুলি গ্রন্থিত অভিজ্ঞতার সমষ্টি, ভাষার মাধ্যমে চিন্তাধারার মধ্যে (অথবা ধারণার গড়বে) যা অর্থ প্রকাশ করে এবং যেটি পরিবর্তে আমাদের বসবাসের পৃথিবীকে বুঝতে সাহায্য করে। এটিকে আবার সক্রিয়তা বা চিন্তাশক্তি সহ শারীরিক ক্ষমতা বলে গণ্য করা যায়, যা পৃথিবীতে কাজ করতে ও সৃষ্টিতে সহায়তা করে। সময়ের সাথে সাথে মানুষ শরীর ও জ্ঞান এই দুই সম্পদের সমষ্টি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যার মধ্যে কতগুলো কর্মশালা রয়েছে চিন্তাধারার অনুভূতির এবং কাজ করার এবং আরও জ্ঞান অর্জন করার, সমস্ত শিশুকেই তাদের মধ্যে থাকা এই সম্পদের একটি অংশকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সৃষ্টি করতে হয় যেহেতু এটি ভবিষ্যত চিন্তাভাবনাকে সঠিকভাবে বাস করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও জ্ঞান সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়, অর্থ নির্দেশে এবং কাজের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে শেখাও গুরুত্বপূর্ণ। এই বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞান-কে আত্মস্থ করা আমাদের চালিত করে জ্ঞানের মূল্যায়ণের গুরুত্বের দিকে, শুধুমাত্র উৎপাদিত বস্তু হিসাবে নয়, এটি সৃষ্টির ভিত্তিস্বরূপ নিয়মাবলী, একত্রীকরণ, ব্যবহার এবং এর প্রয়োজনীয়তা। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে পাঠ্যক্রমের মধ্যে শিক্ষার প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তায়

এবং জ্ঞানের পুর্ণগঠনে যতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়, সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুর উপর।

অপরদিকে, জ্ঞানকে যদি একটি 'উৎপাদিত বস্তু' হিসাবে গণ্য করা হয়, তবে এটি তথ্যের আকারে সজ্জিত যা শিশুর মস্তিষ্কে 'বিকিরিত' হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে মানুষের জ্যানের ভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিকিরণের প্রতি একাগ্র হওয়া উচিত। জ্যানের এই দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষার্থীকে পরোক্ষ প্রাপক হিসাবে গণ্য করা হয়, যেখানে আগের দৃষ্টিকোণে পর্যবেক্ষণ, অনুভব, প্রতিফলন, ক্রিয়া এবং ভাবনা করে নেওয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর সাথে একটি গতিময় একাত্মতা ছিল।

পাঠক্রম হল দক্ষতা বাড়িয়ে তোলার একটি পরিকল্পনা যা নির্দিষ্ট ক্ষাগত লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। মানুষের ক্ষমতার প্রসার যথেষ্ট বিস্তৃত এবং শিক্ষার মাধ্যমে তার সবযুকুকে আমরা গড়ে তুলতে পারিনা। তাই মূল চিন্তা হ'ল যা প্রয়োজনীয় এবং আমাদের লক্ষ্যের প্রতি ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য তাৎপর্যময়।

### ২.৫.১ : প্রাথমিক দক্ষতা

শিশুদের প্রাথমিক দক্ষতা হল বোঝাপরা, মূল্যবোধ ও দক্ষতা দিয়ে তৈরি করা একটি বিস্তৃত ভিত্তি।

ক) ভাষা এবং প্রকাশের অন্যান্য রূপগুলি অর্থ সন্ধান ও অন্যের সাথে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার ভিত্তিহিসাবে কাজ করে। এগুলি বোঝাপড়া এবং জ্ঞানের ও অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির সামর্থ গড়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়, প্রকাশের ক্ষমতা দেয়, মুদ্রাকারে প্রকাশ করে তাকে মনে রাখে। শিশুর ক্ষেত্রে ভাষা গড়ে ওঠা বোঝাপড়া ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তৈরি হওয়ার সমার্থক এবং অন্যের সাথে সম্পর্কস্থাপনের ক্ষমতা শুধুমাত্র লিপিসহ মৌখিক ভাষা নয়, লিপিহীন ভাষা, সাঙ্কেতিক ভাষা, এবং Performing Art-এর লিপি অর্থসন্ধান ও প্রকাশের ভিত্তি তৈরি করে।

খ) সম্পর্ক তৈরি করা এবং বজায় রাখা : সমাজের সাথে প্রকৃতির সাথে এবং নিজের সাথে, আবেগের গভীরতার সাথে, অনুভূতি এবং মূল্যবোধের সাথে, এটি জীবনের অর্থ বহন করে; আবেগের বিষয়বস্তু ও কারণ সরবরাহ করে, এটি আবার নৈতিকতার ভিত্তি।

গ) কাজ ও সক্রিয়তার ক্ষমতা বলতে বোঝায় শারীরিক চলাফেরা, চিন্তা এবং নির্বাচন সহ; দক্ষতা ও বোঝাপড়া সৃষ্টি করা এবং কোনোকিছু অর্জন করতে বা সৃষ্টি করতে তাকে পরিচালিত করা। এছাড়াও এটি যন্ত্র ও প্রকৌশলের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা ও অন্যান্যবিষগুলিকে সজ্জিত করে ও নিপুণভাবে পরিচালনাকরে আদানপ্রদানের জন্য।

কোনো শিল্প যেমন কাষ্ঠ শিল্পের জন্য প্রয়োজন ধারণা এবং যে বস্তুটিতৈরি হবে তার পরিকল্পনা এবং সমাজে (সামাজিক-সাংস্কৃতিক, নান্দনিক এবং অর্থনৈতিক তাৎপর্য, তার মূল্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া। উপকরণের প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান এবং দাম ও গুণাগুণের নিরিখে এর কার্যকারিতা ব্যাপারে সচেতনতা, নিবারণের উৎস সম্পর্কে জ্ঞান, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা ও উৎপাদিত বস্তুর চলতি কায়দা বজায় রাখা, প্রয়োজনের নিজস্বদক্ষতা এবং অন্যের থেকে প্রয়োজনীয় দক্ষতার খবর নেওয়া ও যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ হল আশ্যিক, শৈল্পিক ক্ষমতা মান, সৃজনশীলতা ও সৃষ্টির অসাধারণত্বকে মূল্যায়ণের জন্য। কাবাডির মত খেলায় দক্ষতা শারীরিক দৃঢ়তা এবং সহিষ্ণুতা, খেলার নিয়মকানুন সম্পর্কে জ্ঞান এবং শারীরিক দক্ষতা এবং ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা, দল পরিচালনা ও পরিকল্পনার ক্ষমতা, অন্য দলকে মূল্যায়ণ করার ক্ষমতা ও জেতার কৌশল নির্ধারণ-এ সবকিছুই বর্তমান।

মৌখিক এবং শিল্পের ঐতিহ্যঃ মৌখিক এবং শিল্পের ঐতিহ্য হল বিশেষ বৌদ্ধিক সম্পত্তি, বৈচিত্র্যময় ও সূক্ষ্ম, আমাদের সমাজের অগণিত মহিলা, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এবং উপজাতি সম্প্রদায় দ্বারা রক্ষিত, সব শিশুদের পাঠ্যক্রমে এগুলিকে যুক্ত করলে আমরা জ্ঞানের জন্য বোঝাপড়া এবং ধারণায় মর্মবস্তু , দক্ষতা ও ক্ষমতা লাভের জানলা খুলে দিতে পারি যাতে তারা বিভিন্ন উদ্ভাবনের দ্বারা তাদের জীবন ও সমাজকে সমৃদ্ধ করতে পারে। স্কুলগুলি শিক্ষিত মানুষকে এই সুযোগ দেয় কিন্তু তা বলে মৌখিক সংস্কৃতিকে অবহেলা করতে পারে না। স্থানীয় সাক্ষরতাকে যেকোনোভাবে বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.৫.২ বাস্তব অবস্থায় জ্ঞানঃ

মানুষের কাজকর্ম, নৈপুণ্য ও কাজের প্রকৃতির এক বিশাল জালবুনন সামাজিক জীবন এবং সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেকেছে। বুনন, কাঠের কাজএবং মৃৎশিল্প, চাষ ও দোকানদারি একই সাথে বিভিন্ন ধরণের দৃশ্যকলা এবং Performing Art-এর সৃষ্টি করে এবং জ্ঞানের একটি মূল্যবান রূপ গঠিত হয়। জ্ঞানের এই রূপ বাস্তব প্রকৃতির, অকথিত এবং শুধুমাত্র আংশিকভাবে বিকশিত। এদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিকশিত ক্ষমতাকে ব্যবহার করা হয়, এর মধ্যে পড়ে ধারণায় নেওয়ার ক্ষমতা, ব্যবহারযোগ্য বা নান্দনিক বস্তুর কল্পনা, উপাদানকে কেতাদুরস্ত বানাতে প্রয়োজনীয় বস্তু সম্পর্কে ধারণা ও সেটি নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা এবং নিজের কাজ সম্পর্কে ধারণা, সমাগত কাজ, টিকে থাকার মনোভাব এবং অনুশাসন এগুলি কোনো বস্তুকে কেতাদুরস্ত বানাতে যেমন প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন দর্শকের কাছে কোনোকিছু উপস্থাপনা করতে।

এই সমস্ত কাজগুলি শুধুমাত্র যে দক্ষতা সংযুক্ত রয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু সামাজিক ও প্রাকৃতিক জগৎ সম্বন্ধে বোঝাপড়া ও নিজের সম্পর্কে জানা —এই সমস্ত দিকগুলির দিকে দৃটি আকর্ষণ করেনা। মান্যতাপ্রাপ্ত তত্ত্বমূলক বিষয়ের মতই শিক্ষা ও বাণিজ্যেরও নিজস্ব ঐতিহ্য ও দক্ষ কলাকুশলী আছে। এই ধরণের যে-কোন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, কাজ ও শিল্পের ধরর একত্রে গড়ে ওঠেএবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সঞ্চারিত হয় ও পরবর্তী প্রজন্মের কারিগরদের কাছে প্রতিফলিত হয় তাই এর প্রত্যেকটিই বাস্তব জ্ঞানের বিষয়। এই ধরণের শিল্পের বাস্তব জ্ঞানের ভারতীয় ঐতিহ্য বিশাল, বৈচিত্র্যময় এবং সমৃদ্ধ। উৎপাদনীল দক্ষতা হিসাবে এগুলি আমাদের অর্থনীতি একটি অমূল্য অংশবিশেষ। এই বাস্তব বিষয়গুলির জ্ঞানতত্ত্বীয় গঠনকে বুঝতে গেলে আরও প্রতিফলন ও গবেষণার প্রয়োজন। যেহেতু প্রচলিত জীবিকাগুলি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও লিঙ্গের মানুষের সাথে জনিত তাই তাদের অভ্যাস ও শিক্ষা এবং শিক্ষাকে রূপদানের বিষয়টি বুঝতে গেলে সমাজতত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন। তাদের শিক্ষার তাৎপর্যকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। তাদের শিক্ষার তাৎপর্যকে উপলব্ধি করা প্রয়োজনঙ্গ শুধুমাত্র কাজের ধরণ হিসাবে নয়, জ্ঞানের ধরণ হিসাবেও এবং অন্যান্য কিছু জানার মাধ্যম হিসাবেও। মানবিক জ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি স্কুলপাঠ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হওয়া উচিত।

**২.৫.৩ঃ বোঝাপড়ার রূপঃ** জ্ঞানের নির্দিষ্ট বিবরণ ও অর্থের মাধ্যমে এবং যৌক্তিকতা ও ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার প্রক্রিয়া দ্বারা বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা যায়। প্রত্যেকটি ভাগের নিজস্ব সমালোচনামূলক ভাবনাই রয়েছে, জ্ঞানের যথার্থতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষা করার নিজস্ব পদ্ধতি ও নিজস্ব সৃজনশীলতা রয়েছে। অঙ্কের স্বতন্ত্র স্পষ্ট ধারণা বর্তমান যেমন —মুখ্য সংখ্যা, বর্গ, ভগ্নাংশ, Integalএবং) এবং অপেক্ষক, এক্ষেত্রেও নিজস্ব অকাট্য সিদ্ধ করার প্রক্রিয়া রয়েছে যেমন স্তরের মাধ্যমে বা যা প্রতিঠো করতে হবে তার প্রয়োজনীয়তা তার প্রদর্শণী। অঙ্কের নিজস্ব পদ্ধতি একেবারেই তথ্যনির্ভর নয় কিংবা পর্যবেক্ষণ বা গবেষণা ধর্মীও নয়, একেবারেই প্রদর্শনমূলক কিন্তু যথাযথ স্বতঃসিদ্ধ সংজ্ঞার মাধ্যমে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলি ও অঙ্কের মতই নিজস্ব ধারণা রয়েছে, অনেক সময় সেগুলি তত্ত্বের মাধ্যমে পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত এবং প্রাকৃতিক জগৎকে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করাই মূল লক্ষ্য। ধারণার মধ্যে পড়ছে পরমাণু, চৌম্বক ক্ষেত্র, কোষ এবং নিউরণ। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজন পর্যবেক্ষণ

এবং গবেষণা, তত্ত্ব দ্বারা কৃত ভবিষ্যৎ বাণীর যথার্থতা যাচাই— সেটি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে করা হয়। তত্ত্বের গঠন এবং মডেল তৈরির ক্ষেত্রে অনেকসময় অঙ্কের সাহায্যের দরকার পড়ে কিন্তু সেটি অবশ্যই পর্যবেক্ষণের নিরিখে এবং সেখানে গাণিতিকভাবে নিখুঁত অবস্থায় সত্যকে যাচাই করা যায় না। এক্ষেত্রে এমন একটি ভাষ্য তৈরি করার প্রচেষ্টা করা হয় যা বাস্তব-কে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় প্রকাশ করে। সমাজবিজ্ঞানের নিজস্বধাণা রয়েছে যেমন গোষ্ঠী, আধুনিকতা, সংস্কৃতি, অস্তিত্ব এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা, সমাজবিজ্ঞাণের বিভিন্ন শাখার মূল বক্তব্য , সমাজের বর্ণনা— বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎবাণীঙ্গ সমাজবিজ্ঞাণের প্রকল্পগুলি সমষ্টিগতভাবে বাঁচার ক্ষেত্রে মানুষের আবরণ সংক্রান্ত এবং তার যথার্থতা চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে সামাজিক পর্যবেক্ষণের উপর।

জ্ঞানের বিকাশের প্রক্রিয়াঅনুযায়ী ভাবতে গেলে প্রাকৃতিক ও সমাজবিজ্ঞান প্রায় সমদর্শী। কিন্তু দুটি পার্থক্য রয়েছে যেগুলি পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত সমাজবিজ্ঞানের মানুষের আচরণকেপর্যালোচনা করে যা যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। দ্বিতীয়ত, সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন অনুসন্ধানে প্রায়শঃই নৈতিকতা এবং আশা-আকাঙ্খার প্রশ্ন ওঠে কিন্তু প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে বোঝা যায়, সেক্ষেত্রে নৈতিক প্রশ্ন তখনই ওঠেযখন অতি মানবিক ক্রিয়ায় প্রবেশ করে।

ইতিহাস সমাজবিজ্ঞানের থেকে আলাদা এবং অবশ্যই গণিত এবং বিজ্ঞান থেকেও যেহেতু এটি একটি গঠনমূলক বিষয় যাকে বর্তমানে সীমিত প্রামাণিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল, নির্দিষ্ট মানবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি ধারাভাষ্য, যেহেতু মানুষের ক্রিয়াকর্মের কথাই বর্ণনা করা আছে, মানসিকভাবে উদ্দীপ্ত করা ধারণা বিশেষভাবে গড়ে তোলা তাত্ত্বিক ধারণার থেকে ভাষ্যের ক্ষেত্রে বেশি অর্থবহ। '' সত্যের প্রতিষ্ঠাক্ষ ভাষ্যের গঠনে একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

কলা ও নন্দনতত্ত্ব কিছু পরিচিত শব্দের ব্যবহার করে— যেমন ছন্দ, মিশ্র রচনা, প্রকাশভঙ্গিমা এবং ভারসাম্য যদিও নতুন ও নতুন অর্থে সেগুলিকে প্রয়োগ করা হয়। শিল্পের ফসলকে বাস্তেব বা সত্যতার নিরিখে যাচাই করা যায়না। যদিও শিল্পকলার ক্ষেত্রে

**বোঝাপড়ার স্তরবিজ্ঞান**

**উপলব্ধি:** ভাষা এবং বক্তব্যের ভাষাতত্ত্বগত বিষয়বস্তুগুলিকে বোঝা।

**নির্দেশ:** কি বলা হচ্ছে সেটিকে বোঝা - কি ধারণা বা পরিভাষা নির্দেশ করা হচ্ছে।

**জ্ঞানতত্ত্বীয়:** কাকে প্রামানিক তথ্য হিসাবে ধরা হচ্ছে কি একটি বিবৃতিকে সত্যতা দেয়, কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় এবং সত্যতা বিচার করতে হয় তাকে বোঝানো।

**আপেক্ষিক ও তাৎপর্য্যপূর্ণ:**

বিভিন্ন ঘটনা এবং ধারণার মধ্যেকার যোগসূত্রগুলিকে বোঝা এবং তাদের ''পরিচিত বিষয়''-এর জালবুননে অংশগ্রহণ করা, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যোকার সম্পর্ককে এবং অপরের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রত্যেকের তাৎপর্য্য বোঝা।

নৈতিকতা সমস্ত মানবিক মূল্যবোধ, নিয়মনীতি এশব এবং আকর্ষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা তাকে প্রমাণিত করে। ক্রিয়া ও নির্বাচনের সাথে নৈতিকতা-কে যে-কোনোরকম বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে প্রধান গুরুত্ব নেওয়া উচিত। নৈতিক বোঝাপড়ার মধ্যে পড়ে বিচারের যুক্তিগুলোকে বোঝা— কোন কিছু ঠিক এবং কিছু বেঠিক- এতে যুক্তি মানুষের ভূমিকা সম্পর্কে না জেনেই। আরও বিশদভাবে বললে, সেই যুক্তিগুলি যে-কোনো কারও জন্যই যুক্তিই, যুক্তি, সমতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাই গভীরভাবে সংযুক্ত ধারণা।

দর্শকের মূল লক্ষ্য অন্য একদিকেজীবনের পরিপ্রেক্ষিতেউপরোক্ত বোঝাপড়ার বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণাত্মক সচ্ছতা, মূল্যায়ন এবং সংশ্লেষণাত্মক সমন্বয় এবং অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে চূড়ান্ত অর্থ নির্ণয় ও সর্বোৎকৃষ্টি।

আঞ্চলিক দক্ষতাসমূহ, অভ্যাসের জ্ঞান এবং বোঝাপড়ার বিভিন্ন ধারণাগুলি হল জ্ঞান বিষয়কার মাধ্যমে মানুষের অভিজ্ঞতা ঐতিহাসিক সময় ধরে বৃদ্ধি পেয়েছে। সবধরণের অথচ সবচেয়ে সরল কাজগুলি এব উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছেস্বাধীন জীবিকা, পারিবারিকবিদ্যা ও ব্যবসা-বাণিজ্য। এরা মানবীয় সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র। বোঝাপড়া ও নৈতিকতার বিকাশ এবং আরো অবশ্যই কল্পনা এবং সমালোচনামূলক ভাবনাচিন্তার সঙ্গে সংযুক্ত।

জ্ঞানের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের সম্পর্কযুক্ত একটি বিশেষ শব্দভাণ্ডার, ধারণা তত্ত্ব, বর্ণনা এবং প্রমালী, প্রত্যেকটি একধরণের চশমার কাজ করে যার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীকে দেখি, বুঝি ব্যস্ত থাকি এবং ক্রিয়া করি। এই বিষয়গুলি গড়ে উঠেছে এবং গঠন প্রক্রিয়া এখন চলছে, অতীতের মানুষের আদানের মাধ্যমে। যদিও তাদের গঠন এবং প্রাধান্যের দিনগুলি পরিবর্তিত হয়েছে। এই সমস্ত ধারণাগুলিকে মানতে গেলে বুদ্ধিসত্ত্বার ও জ্ঞানের বিভিন্ন দিকগুলি একসাথে কার্যকর হয়: স্পষ্ট যৌক্তিকতা এবং তাচ্ছিল্যতার 'নিয়মমাফিক প্রণালী' তথ্য সংগ্রহ ও তার মূল্যায়ন, অভিজ্ঞতামূলক, নির্রাক শিক্ষা কাজের ও অভিজ্ঞতার মধও দিয়ে, সমন্বয়গামী, পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তব কাজকর্ম, একা বা অন্যের সাথে কোনো কিছু তৈরি করতে বা অর্জন করতে কোনো কাজের বর্ণনা করার সময় অসুবিধা ও বিষয়গুলি সম্পর্কে বলতে। সৃষ্টিশীলতা এবং দক্ষতা জ্ঞানের ও জানার সমস্ত ক্ষেত্রেই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

মানবীয় সংস্কৃতি ও জ্ঞানের এক শ্রীভবন এবং সেগুলিকে জানার ও কাজকরার পদ্ধতিগুলি হল মানব সভ্যতার ঐতিহ্যের একটি মূল্যবান অংশ। আমাদের সমস্ত সন্তানের এই জ্ঞানের প্রতি অধিকার রয়েছে, তাদের সাধারণ ধারণাশক্তিগুলিকে সমৃদ্ধ করার ও নিজেদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য যাতে তারা নিজেদের গড়ে তুলতে পারে এবং প্রকৃতি ও পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ এবং নিজেদের অনুসন্ধান করতে পারে, এই সমস্ত উপকরণ এবং দূরবীনের মাধ্যমে।

## ২.৬ জ্ঞানের পুর্নসৃজন

এই সব দক্ষতা, অভ্যাস এবং সক্ষমতার বোধই আমরা বিদ্যালয় পাঠক্রমের মধ্যে বিকশিত করে তুলতে চাই। এদের মধ্যে কয়েকটি সহজেই বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়, যেমন গণিত, ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং দৃশ্যকলার জগতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। অন্যগুলি, যেমন নৈতিক বোধ, সেটিকেই শিশুদের পাঠ্যবিষয়ও কর্মকান্ডের মধ্যে পড়ানোর সুযোগ খুলে দিতে হবে। ভাষার মৌলিক দক্ষতা এই দুটি দিকেরই প্রয়োজন। সেকারণে নান্দনিক বোধ একই সঙ্গে উভয় দিকটিকেই তাদের মনে সহজেই সঞ্চারিত করে দেয়। সবকটি ক্ষেত্রে পরিকল্পিত কর্মকান্ড (Project), অধ্যয়নের আন্ত-বিষয়ী এবং তাত্ত্বিক অংশ, মান-পর্যায়ে কাজ, পাঠাগার ও গবেষণাগার ব্যবহার এই সমস্ত সুবিধা থাকা প্রয়োজন।

জ্ঞানের এই দৃষ্টি ভঙ্গিতে 'ঘটনা' থেকে সরে আসার প্রয়োজন হয় কেননা এটি তার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। যেভাবে সেগুলি আমাদের কাছে পরিচিত তারই মধ্যে ঘটনাকে খুঁজে নিতে হয়। ঘটনার উপরিতলা থেকে আরো গভীরে ডুব দিয়ে এদের মধ্যেকার গভীরতার সংযোগটির সন্ধান করতেহয় এবং তারই নিরিখে এদের অর্থবহ এবং তাৎপর্যময় করে তুলতে হয়।

ভারতে আমরা পাঠক্রম সংগঠনের ক্ষেত্রে বিষয় ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করি, কেবলমাত্র নির্দিষ্ট চর্চায় বিষয়গুলিতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি। এই ভঙ্গিমায় জ্ঞানকে পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে 'প্যাকেট জাত' করে উপস্থাপনার প্রবণতা রয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে পরীক্ষা পদ্ধতির আনুষ্ঠানিকতা এবং বিভিন্ন বিষয়ে ক্ষেত্রে নম্বর দিয়ে যোগ্যতার বিচারে । দেখার এই ভঙ্গি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক ক্ষতি করেছে। প্রথমত, যেমন ক্ষেত্রগুলির পাশে সরিয়ে রেখে 'বাড়তি' অথবা সহ-পাঠক্রম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে পাঠক্রমের মূল অংশের সঙ্গে একত্রিত করে এগুলিকে দেখা হয় না। জ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা যেমন কাজ যেটির সাথে ব্যাবহারিক বুদ্ধিমত্তা জড়িয়ে থাকে, সেটি পুরোপুরি উপেক্ষিত এবং এই সব ক্ষেত্রে জ্ঞান, দক্ষতা এবং মনোভাবের বিকাশে সহায়ক একটি পর্যাপ্ত পাঠক্রমের তত্ত্ব আমরা আজও প্রস্তুত করে উঠতে পারিনি।

দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট বিষয় গুলি যে একটি দম বন্ধ করা প্রকোষ্ঠ ফলে, আন্তসর্ম্পকিত এবং সংহত হয়ে ওঠার পরিবর্তে জ্ঞান খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে আছে। শিশুর চোখে বাইরের পৃথিবীটা কেমন সেটির প্রবর্তে এই সব নির্দিষ্ট বিধিতে সমাজবদ্ধ বিষয় শুরুর পাঠ হয়ে উঠেছে। তাই বিদ্যালয়ে অর্জিত এবং বাইরের জগতের জ্ঞানের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গিই বাটার প্রাচীর তুলে দিয়েছে।

তৃতীয়ত, শিশু জ্ঞান নিমার্ণের নিজস্ব ক্ষমতা এবং জানার জগতে তার নিজস্ব অভিযানকে দমিত করে ইতিমধ্যেই যা জানা হয়ে গেছে তারাই ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানের মাথায় চেপে বসেছে ভাগ্য, তার জন্য বিশাল পাঠ্যপুস্তক লেখা হচ্ছে, বোধের ধারণা আর সমস্ত সমাধানের চেয়ে 'কুইজ'- এর চটজলদি পদ্ধতি আর যান্ত্রিক পুনরুদ্ধার। তথ্যকেই জ্ঞান ভেবে আমরা পাঠক্রমে অবিরাম হাজার হাজার ঘটনা আর তথ্য ঠুসে দিচ্ছি যেগুলো সবই স্মৃতিতে ধরে রাখতে হবে।

চতুর্থত,'নতুন বিষয়' অন্তর্ভুক্তির একটি হিড়িক পড়েছে। সমসাময়িক পৃথিবীর পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই করে নতুন বিষয়ের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চয়ই গুরুত্ব পূর্ণ। কিন্তু বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অত্যন্ত ভূল পদ্ধতিতে প্রায়ই এই সব 'নতুন বিষয়' সৃষ্টি করা হচ্ছে। তারপর বদলে সেই বিষয়ে বিশালাকার পাঠ্যপুস্তকে প্রস্তুতি পরিকল্পনা এবং তাদের বিশ্লেষণের জন্য আবার নতুন নতুন কর্মকাণ্ড। যদি পাঠক্রমে ইতিমধ্যেই সেসব বিষয় বা নির্দিষ্ট কর্মকান্ড সংযোজিত তার মধ্যেই যদি এই সব নতুন জ্ঞানের জন্য পরিসর সন্ধান করা যেতো তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে। বলাই বাহুল্য যে নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্তিতে পাঠক্রমে কেবল ভারই চাপছে এবং জ্ঞান অকারণে অবাঞ্ছিত খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

**জ্ঞানের নির্বাচন**

জ্ঞানের সাম্রাজ্য প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই পাঠক্রমে এর কোনগুলি নেওয়া হবে সেটি নির্বাচন করা দরকার।

প্রাসঙ্গিকতা: এই পথে এগোলে আমরা কাজভিত্তিক পছন্দের খপ্পরে পড়ে যাই। ফলে পরবর্তী পরিণত জীবনে যেসব বিষয় কাজে লাগবে ভ্রমক্রমে সেই উপযোগিতার ধারণা তৈরি হয়ে যায়। বর্তমানে শিশুদের জ্ঞান নির্মাণের ক্ষেএে সেগুলি মোটেই মানানসই হয় না

এবং তাদের ভবিষ্যত জীবনেও এই শেখা কোনো কাজে আসে না।

আগ্রহ : অত্যন্ত উপযোগী পদ্ধতি কিন্তু একে শিশুর কী পছন্দ করে যেমন কার্টুন ছবি কিংবা কম্পিউটরের খেলা— এই সব ধারণার সঙ্গে মিশিয়ে অতিসরলীকরণ করে ফেললে চলবে না। বরং একটি শিশুকে যাতে পাঠে নিবদ্ধ করা যায়, তার মনে আগ্রহ সঞ্চারিত করা যায় এমন পদ্ধতির সন্ধান করতে হবে এবং হাতে কলমে কাজ করার জন্য তাকে স্বতঃপ্রণোদিত করে তুলতে হবে।

অর্থপূর্ণ : সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণপদ্ধতি, যদি শিশুটি কেবল পাঠের মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠতেপারে কিংবা জ্ঞান যদি অর্থপূর্ণভাবে শেখানো হয় তবেই পাঠক্রমে এর সংযুক্তির ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

পরিশেষে, পাঠক্রমে অর্ন্তভুক্তির জন্য যেভাবে জ্ঞানকে নির্বাচন করা হয় সেটি মোটেই কোন কাজে আসে না। সেখানে উন্নয়নমূলক যথার্থতা, যৌক্তিক ক্রমবিন্যাস, বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে যোগাযোগ এবং সামগ্রিক গতির এসব বিষয়ে বিচার বিবেচনার পরিমান অপর্যাপ্ত এবং পুরোনো ধারণায় ফিরে যাওয়ার সামান্য সুযোগই রয়েছে, কখনো আবার কোন সুযোগই নেই। তার ওপর, সে সমস্ত ধারণাগুলি পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সংযুক্ত নয়।

## ২.৭ শিশুদের জ্ঞান এবং স্থানীয় জ্ঞান

শিশুর গোষ্ঠী এবং স্থানীয় পরিবেশ উভয়ে মিলে প্রাথমিক আধার গড়ে তোলে তারই মধ্যে শিক্ষাদান পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং জ্ঞানত তার তাৎপর্য অর্জন করে। পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় শিশুর নির্মিত জ্ঞান অর্থ খুঁজে পায়। অথচ সাধারণ ভাবে পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে ধারণা গঠনের সময় কিংবা চিরাভ্যস্ত শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এই যে ক্ষেএটিই সম্পূর্ণ অবহেলিত রয়ে যায়। সুতরাং এই দলিলে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে ধারণা গঠনে তাৎপর্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। শিশুর প্রসঙ্গে শিক্ষার অবস্থিতির ধারণা এবং বিদ্যালয় ও তার প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের মাঝখানে একটি সছিদ্র প্রাচীর গঠন। যে-কোন বিষয়ে জ্ঞান অধ্যয়নের ক্ষেএে যেহেতু সর্ব শ্রেষ্ঠ 'প্রবেশ পথ' হল স্থানীয় পরিবেশ এবং শিশুর আপন অভিজ্ঞতা, তাই এই ধারণা গঠন প্রয়োজনীয় তা না, জ্ঞান শব্দের অর্থ হল পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত হওয়া। এই কারণেই তা আরো প্রয়োজন। এটা শেষে পৌছোঁবার কোনো পথ নয়। বরং বলা যায় এটি পথ এবং শেষ দুইই। এরজন্য আমাদের জ্ঞানকে কার্যনির্ভর এবং একেবারে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাসঙ্গিক করার জন্য তাকে সংকুচিত করার প্রয়োজন হয় না বরং এরই মাধ্যমে জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে উপলব্ধি করতে হয়।

পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত প্রসঙ্গের সঙ্গে শিক্ষার্থী তার ব্যক্তি দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থানকে এবং জ্ঞানের সঙ্গে তার সমাজের অভিজ্ঞতার সম্পর্ককে যদি অনুধাবন করতে না পারে তবে অর্জিত জ্ঞান নিছকই তথ্যে পরিণত হয়। শিক্ষা কীভাবে গোষ্ঠী জীবনে ভবিষ্যত দর্শনের সঙ্গে যুক্ত হয় তা যদি আমরা পরীক্ষা করে দেখতে চাই, তবে **কোনকিছু জানা অর্থে কী বোঝায়** এবং কেমন করে আমরা যা শিখেছি তাকে ব্যবহার করতে পারি—এই ধরণের প্রতিফলনে শিক্ষাথীকে উৎসাহিত করাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একজন শিক্ষার্থীকে অবশ্যই নিজেস্ব শিক্ষার উদ্দীপক অংশগ্রহণকারীহিসাবে গণ্য করতে হবে। দিনের পর দিন শিশুরা তাদের বিদ্যালয়ের চারপাশের জগৎ থেকে আরদ্ধ জ্ঞান সঙ্গে নিয়ে আসে। যে গাছে তারা চড়েছে যে ফল তারা খেয়েছে যে পাখিদের প্রশংসা তারা করতে চেষ্টা করেছে সবই এই জ্ঞানের আওতায় পড়ে দিন ও রাতের প্রাকৃতিক বৃত্তের মধ্যে এই আবহাওয়ার ঘেরাটোপে,

এই জল উদ্ভিদ পশুপাখি যা কিছু তাদের ঘিরে আছে এই সবের মাঝখানে শিশুদের ক্ষুদ্রজীবন আবর্তিত হয়। শিশুরা যখন প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার পায় তখন ইতিমধ্যেই তাদের মননে ভাষার একটা সমৃদ্ধ ভিত তৈরি হয়ে গেছে। ছোট ছোট সংখ্যা তাদের যোগবিয়োগের আদিম পদ্ধতি ইতিমধ্যেই তার মননে স্থান পেয়েছে। তবুও শ্রেণীকক্ষে যে জ্ঞান সে আহরণ করে আনে কদাচিৎ তার কথা আমরা মনে রাখি। কদাচিৎ আমরা পড়াশোনার সময় কিংবা তাদের পাঠ দেবার সময় সে সব বিষয় প্রাধান্য দিই কিংবা বিদ্যালয়ের বাইরে যে জগৎ বহমান তার কথা উল্লেখ করি। এর বদলে আমরা কী করি? আমরা মুদ্রিত জগতের সুবিধাই কাজে লাগাই, সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশের ছবি দেখাই। কিন্তু এসবইতো প্রাকৃতিক জগতের নিছক নমুনা মাত্র। এর চেয়েও খারাপ হল বর্তমানে কম্পিউটার সমৃদ্ধ শিক্ষায় বাইরের সজীব পৃথিবী খাট মাপে পুতুলের মতো চেহারার অ্যানিমেশনের ছবিতে আমাদের সামনে নড়ে চড়ে বেড়ায়। আর আমাদের প্রত্যাশা যে শিশুরা তাদের কম্পিউটার পর্দায় এগুলিই দেখবে। জড় বা সজীব বস্তুর বিষয় পড়াশোনার আগে কোনো শিক্ষক যদি তাদের বিদ্যালয়ের পাশের মাঠে শিশুদের একটু বেড়াতে নিয়ে যান এবং ফিরে এসে যদি প্রতিটি শিশুকে দশটি সজীব এবং দশটি জড় বস্তুর নাম লিখে ফেলতে বলেন তাহলে তিনি দেখতে পাবেন যে এর ফলাফল বিস্ময়কর। তামিলনাড়ুর মহাবলীপুরমের একটি শিশুর এই তালিকায় সামুদ্রিক ঝিনুক নুড়িপাথর আর মাছ থাকতে পারে আবার দণ্ডকারণ্যের কাছেই যে ছত্তিশগড় সেখানকার শিশুর তালিকায় থাকবে পাখির বাসা, মৌমাছির চাক আর নুপূর। এসব না করে তার বদলে শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে মুখ গুজে কোন ছবি কিংবা একগুচ্ছ শব্দের তালিকা দেখতে বলা হয় তারপর তাকে সেই তালিকা থেকে জড় আর সজীব বস্তুকে আলাদা করতে হয়। জল দূষণের পাঠ করার সময় শিশুরা তাদের অঞ্চলে অবস্থিত জলের উৎস আর জলের প্রকৃতি পরীক্ষা করতে পারে তারপর জলদূষণের বিভিন্ন রকমফেরের সঙ্গে তাকে মেলাতে পারে। এর বদলে তারা দূষিত জলের ছবি দেখবে আর সেবিষয়ে মন্তব্য করবে এমনই আমাদের প্রত্যাশা। যখন চাঁদ আর চাঁদের কলা বিষয়ে পাঠ দেওয়া হবে তখন কজন শিক্ষক আর শিক্ষার্থীদের বলেন যে রাতে চাঁদ দেখবে আর কাল সে বিষয়ে কিছু বলবে? স্থানীয় পাখি আর গাছপালার নাম না জিজ্ঞাসা করে পাঠ্যপুস্তকে কিছু সর্বোব্যাপি বস্তুর নাম পড়ানো হয়। ধরে নেওয়া হয় যে তারা সর্বত্র আছে। অথচ তারা কোথাও নেই। অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা যদি তার চারপাশের জগতের সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকে লেখা 'সালোক সংশ্লেষ' প্রক্রিয়াকে সম্পর্কিত করতে পারতো তবে তারা নিজেরাই প্রশ্ন তুলত 'আচ্ছা, জয়পাল গাছের পাতা তো রঙিন, ওদের তো সবুজ পাতা নেই, তাহলে ওরা কী করে সালোক সংশ্লেষ করে? একমাত্র বাইরের এই সজীব পৃথিবী ও দের শ্রেণীকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে যখন গুণাগুণ বিচার প্রতিফলনে জীবন্ত হয়ে উঠবে, একমাত্র তখনই ওরা নিজেরাও পরিবেশের হাজারো প্রশ্নে প্রাণবন্ত হবে, সেসব জিজ্ঞাসাকে মনের মধ্যে লালন পালন করবে।

### জ্ঞানোৎপাদনে অংশগ্রহণ

সহজাত বিচিত্রতার কারণে পরিবেশের প্রতিটি উপস্থাপনাই এক অর্থে অনন্য হয়ে ওঠে। ধ্রুপদী বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় ব্যাপক পুনরাবৃত্তি, শুধুমাত্র সেই জাতীয় পরীক্ষা-নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে এ বিষয়ে কোনো অনুভব বা বোধে উপনীত হওয়া যায় না। বরং এর বিপরীতে, এহেন জটিল ব্যবস্থা সম্পর্কিত বোধের জন্য স্থান এবং কাল সাপেক্ষে ব্যাপক নিরীক্ষা, তথ্যাদির সমস্ত নথিভুর্ক্তিকরণ এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থার তুলনামূলক বিচারের ভিত্তিতে অন্তর্লীন প্রক্রিয়া ও এর গড়নের একটি বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ভারতের পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা যেমন, ভূগর্ভস্থ ভৌম জলের গভীরতা ইত্যাদি বিষয়ে উত্তম গুণসম্পন্ন দলিল বর্তমানে পাওয়াই যায় না। অথচ, ছাত্র / ছাত্রীদের কর্ম পরিকল্পনার ভিত্তিতে এহেন দলিল প্রস্তুত করা মোটেই অসাধ্য নয়। সর্বসাধারণের অধিগম্য একটি ওয়েবসাইটে, এ জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার ফলাফল সমূহ সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব এবং এর ফলে ভারতের পরিবেশ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ এবং বোধগম্য তথ্যসমৃদ্ধ দলিল প্রস্তুত করা সম্ভব।

কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞদের নয়, আগ্রহী সমস্ত নাগরিককে এ জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনার মূল্য-নির্ধারণ এবং ওদের ফলাফল সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ বিশ্লেষণের আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি আত্ম-সংশোধনী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায়। ফলে ভারতীয় পরিবেশসঞ্জাত দৃশ্যপট বিষয়ে আমাদের বোধের সংগঠিত বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা অগ্রসর হতে পারি এবং ইতিবাচক কর্মসূচী গ্রহণের পথটি দৃঢ় করে তুলতে পারি। বৎসরের পর বৎসর নির্দিষ্ট পর্যায়ে বার্ষিক তথ্য সংগ্রহ একটি অঞ্চলের সঙ্গে অপর অঞ্চলের তুলনামূলক আলোচনা ও তথ্যবিনিময়, এবং কেন্দ্রীয় স্তরে সকল তথ্যের সংযুক্তির ফলে পরিবেশগত পরিবর্তন বিষয়ে তাৎপর্যময় বোধ সৃষ্ট হয় এবং তুলনার মাধ্যমে কী ঘটছে এবং কেন ঘটছে সংক্রান্ত একটি দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হয়। শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ার একটি অংশ হিসাবে এহেন জ্ঞান-উৎপাদনী কর্মকাণ্ডকে যুক্ত করে শিক্ষাজনিত অভিজ্ঞতার নানা গুণাবলীও প্রভূত পরিমাণে বর্ধিত করা যায়।

সে কারণে, শ্রেণীকক্ষের পাঠ পরিকল্পনার সময় কোন কোন বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং কোন নির্দিষ্ট উদাহরণ এতে উল্লিখিত হওয়া উচিত সে প্রশ্নে স্বাভাবিক জ্ঞানের যে উৎস সাধারণ জীবন যাপনে দাড়িয়ে আছে তার সুবিধা অবশ্যই নিতে হবে। এর অর্থ হল স্থানীয় প্রসঙ্গের ভিত্তিতে কোন ধারনাটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা-ও বিচার করা যায়। এর অর্থ এই নয় যে, শ্রেণীকক্ষে কেবলমাত্র স্থানীয় প্রসঙ্গই আলোচিত হবে। কিন্তু কেরালায় যারা বাস করে সেই শিশুদের যখন রাজস্থানের মরু অঞ্চলের উদ্ভিদকুল সম্পর্কে পড়ানো হবে তখন সে বর্ণনা এমন সমৃদ্ধ হতে হবে যাতে শিশুরা অনুভব করতে পারে যে ওখানে কেবল মরূদ্যান আর উটেরা নেই, স্বাভাবিক জগৎ তার বিশেষত্বে, তার বৈচিত্রে ওগানেও সজীব রয়েছে। তারা অবাক হয়ে ভাববে, কেমন করে ঐ প্রচন্ড উত্তাপে মানুষ অল্প পোশাক পরে না বেশি পোশাক পরে।

শিক্ষার্থী তখন সেখানকার জীবনের সঙ্গে তাদের চারপাশের স্থানীয় গোষ্ঠীর জীবনকে অবশ্যই তুলনা করতে পারবে এবং কেমন করে এই বিষয়গুলি একইরকম ভাবে ঘটে, কেন ঐগুলি অন্যরকম, এ জাতীয় হাজারো প্রশ্ন তাদের মনে ভিড় করে আসবে।

স্থানীয় পরিবেশ কোনো ভৌত বা প্রাকৃতিক জগতে গড়া নয়, এর মধ্যে সামাজিক সাংস্কৃতিক জগতও রয়েছে। সমস্ত শিশুরাই বাড়িতে সোচ্চারে কথা বলে এবং তাদের সেই কণ্ঠস্বর বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যেও যাতে ধ্বনিত হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। পার্থিব সম্পদে গোষ্ঠীজীবন উপচে পড়ে। স্থানীয় গল্প, গান, তামাশা এবং ঠাট্টা এর সঙ্গে শিল্পকলা সবই বিদ্যালয়ের জ্ঞান ও ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে পারে। মৌখিক ইতিহাসের একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডারও তাদের রয়েছে। আমরা নীরব থেকে শিশুদের বাঙ্ময় করে তুলতে পারি।

**স্থানীয় জ্ঞানের পরম্পরা**

ভারতে বসবাসকারী অনেক গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিমানুষ এ দেশের পরিবেশ সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ে একটি সমৃদ্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডার হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। বংশপরম্পরায় এ জ্ঞান তারা অর্জন করেছে এবং ঐতিহ্যের অঙ্গ হিসাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে তা হস্তান্তরিত হয়েছে। সেইসঙ্গে একজন ব্যক্তিমানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতায় অর্জিত জ্ঞানও এর মধ্যে যুক্ত হয়েছে। এ জাতীয় জ্ঞান বিবিধ ক্ষেত্রে বিস্তৃত : উদ্ভিদের নামকরণ ও শ্রেণীবিভাগ অথবা ফসল-উৎপাদন এবং জল-সংরক্ষণের পদ্ধতি কিংবা সহনশীল কৃষির চর্চা। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে সংশ্লিষ্ট যে দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষিত হয়, তার তুলনায় কখনো কখনো বাস্তবে ব্যবহৃত এই সমস্ত পথ বা পদ্ধতি অনেকটাই অন্যরকম হয়। পূর্বে, এগুলি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। এমত পরিস্থিতিতে, স্থানীয় ঐতিহ্য এবং সাধারণ মানুষের

পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তব জ্ঞানের ভিত্তিতে অধ্যয়নের বিবিধ কর্মপরিকল্পনা যাতে শিশুরা বিকশিত করতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষক / শিক্ষিকারা তাদের সাহায্য করতে পারেন; বিদ্যালয়ে পঠিত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এদের তুলনামূলক বিচারও এই পরিকল্পনার অন্তভুর্ক্ত হতে পারে। কয়েকটি ক্ষেত্রে যেমন উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাজনের প্রসঙ্গে, দুটি ঐতিহ্য নিছকই সমান্তরাল হতে পারে এবং ভিন্ন ভিন্ন গুণাগুণের ভিত্তিতে লব্ধ এই দুটি বিভাজনই তাৎপর্যময় হিসাবে গণ্য করা হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, রোগ-নিরূপণ এবং তার শ্রেণী বিভাজনে স্থানীয় বিশ্বাসের সঙ্গে মতপার্থক্য ঘটে এবং কখনো কখনো এটিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বানও করতে হয়। অবশ্য, সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং নীতির মাধ্যমেই সমস্ত ধরনের স্থানীয় জ্ঞানের মধ্যস্থতা করা উচিত।

## ২.৮ বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত জ্ঞান এবং গোষ্ঠী সমাজ

সমাজ ও সংস্কৃতির জগতে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাও পাঠক্রমের একটি অংশ হওয়া প্রয়োজন। পাঠ্যপুস্তকে ববৃত জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্যে শিশুরা মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবনের ছবি এবং উপস্থাপনার সন্ধান যেন অবশ্যই পায়। এই সব চিত্ররূপে একটি বিষয় সুনিশ্চিত করতে হবে, কোন গোষ্ঠী বা বর্গ যেন অতিসরল উপস্থাপনায় এবং বিচারে চিহ্নিত না হয়। সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যাংশ হিসাবে শিশুরা যদি তাদের সামাজিক গোষ্ঠী বা দলের চিত্ররূপ তৈরি করতে পারে এবং নিজেরাই তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি অধ্যয়ন করতে পারে, এমনকি সেটিও অনেক ভালো পদ্ধতি হতে পারে। তখন তারা সরাসরি বিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে পারবে। তিনি হয়তো তাদের সঙ্গে বিকেন্দ্রীকরণের ফলে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কী কী সুবিধা হয়েছে এবিষয়ে আলাপ করবেন। আঞ্চলিক এবং জাতীয় ইতিহাসের সঙ্গে স্থানীয় মৌখিক ইতিহাসকেও যুক্ত করতে হবে। কিন্তু সামাজিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির জন্য শিক্ষক এবং পাঠক্রম রচয়িতাদের প্রভূত সামাজিক সচেতনতা এবং সামাজিক প্রক্রিয়ায় তাদের যথেষ্ট সংযুক্তি থাকতে হবে। লিঙ্গ, বর্ণ, শ্রেণী এবং ধর্মের গোষ্ঠীভিত্তিক পরিচিতি শিশুদের প্রাথমিক পরিচয়। কিন্তু এই পরিচয়ের কারণেই তারা শৈশবেই নিপীড়ক এবং এই সামাজিক অসাম্য এবং প্রভুত্বকামী ব্যবস্থার ঘোর সমর্থক হয়ে উঠতে পারে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাদের হাতে একটি আতশ কাঁচ তুলে দিতে যার মাধ্যমে শিশুরা তাদের সামাজিক বাস্তবতায় একটি গুণাগুণ বিচারী বোধ গড়ে তুলতে পারে। এতে তাদের বাড়ির অভিজ্ঞতা এবং উদ্বেগ সম্পর্কেও কথা বলায় পরিসর দেওয়া যেতে পারে।

বিদ্যালয় পাঠক্রমে কোন বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করা না করার বিষয়ে গোষ্ঠী সমাজ প্রশ্নও তুলতে পারে। সেক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে গোষ্ঠীর বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐ বিশেষ সিদ্ধান্তের মূল্য তাদের সামনে বিশ্লেষণ করে সঠিকভাবে বিষয়টিকে দেখার জন্য তাদের অনুরোধ করতে হবে। এবিষয়ে বিদ্যালয়কে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। সে কারণে এই শিক্ষকেরা অবশ্যই জানবেন যে কোন একটা বিষয় কেন পাঠক্রমে রয়েছে এবং কোনটি কেনই বা নেই। শিক্ষকরা তাদের ছোটখাট ব্যবহারে শিক্ষার্থীর পিতামাতার বিশ্বাস ও আস্থা সহজেই অর্জন করতে পারবেন। যেমন, বিদ্যালয়ে বাড়ির ভাষায় কথা বলার অনুমতি দিয়ে কিংবা যৌনতা অথবা প্রজননের শিক্ষা দিয়ে অথবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলার ছলে পড়িয়ে অথবা ছেলেদের গান করতে এবং নাচতে উৎসাহিত করে। সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্তই রাজ্য স্তরে নেওয়া হয়— এই কথা বলে কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টা মোটেই ভালো নয়। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা যদি সুনিশ্চিতই করতে হয়, তবেই আমরা আমাদের পাঠক্রমের নির্বাচন বিষয়ে অন্যদের সঙ্গে কথা বলতেই হবে। অন্যেরা অর্থে আইনগতভাবে শিক্ষার বেশির অংশ যাদের জিম্মায় রাখা আছে।

## ২.৯ কিছু উন্নয়নমূলক বিবেচনা

শিশুদের আগ্রহ, শারীরিক দক্ষতা, ভাষিক ক্ষমতা এবং বিমূর্ত ও সাধারণী ধারণার ক্ষমতা এ সমস্তই তার বিদ্যালয় জীবনের সমগ্র বছরগুলিতে প্রাক-বিদ্যালয় পর্ব থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিকশিত হয়। এই সময়টি প্রচণ্ড বৃদ্ধি এবং বিকাশের পর্ব এবং এছাড়া অনেক মৌলিক বদল এবং আগ্রহ ও সক্ষমতার পরিবর্তনও ঘটে এই পর্বে। কাজেই এই পর্যায়ে পাঠক্রম কেমন হবে, তার দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে, কীভাবে ক্ষেত্রগুলির বাছাই ও সংগঠিত করার কাজ হবে— এই সমস্ত বিষয় নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ স্তর এই পর্বটি।

জ্ঞান সৃজন এবং পুনর্সৃজনের জন্য একটি পরীক্ষামূলক ভিত্তি, ভাষিক দক্ষতা এবং অন্যান্য মানুষজন ও প্রাকৃতিক জগতের মুখোমুখি হবার প্রয়োজন হয়। প্রথম যারা বিদ্যালয়ে এল সেই সব শিশুরা ইতিমধ্যেই পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞানের ভাণ্ডার গড়ে তুলতে শুরু করেছে। কাজেই এর পরে যা কিছু তারা শিখবে সবই তারা তাদের বিদ্যালয়ে বয়ে আনা জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত করে নেবে। সেই জ্ঞান হল সহজাত। এই সহজাত জ্ঞানের ভিতের ওপরেই বিদ্যালয় আরো সচেতন, আরো সংযুক্ত ভাবনার স্তরে জ্ঞানের পাঠ নেবার সুযোগকরে দেয়। শিক্ষার একেবারে প্রাথমিক স্তরে প্রাক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বছরগুলিতে পাঠক্রমের সমস্ত কর্মকাণ্ডে ভাষা এবং গণিতকে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতেই হবে। বিষয়গুলির মধ্যে বিভাজন এই স্তরে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং উপরে জ্ঞানের যে ক্ষেত্রগুলি আলোচিত হয়েছে সেগুলির পরিবেশ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার যে শিক্ষা, তারই আঙ্গি কে শিশুদের সামনে উপস্থাপনা এবং সম্পূর্ণ সংহত করা সম্ভব। প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সমৃদ্ধ মিথষ্ক্রিয়া এবং সেই সম্পর্কিত বোধ, হাতেকলমে কাজ কাজ করা, সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার বিষয়ে জ্ঞান, ব্যক্তিগত নান্দনিক দক্ষতা— এসমস্তই শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত। প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কিত এই সংহত প্রাথমিক অভিজ্ঞতা এটিই পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী বছরগুলিতে বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞান এই দুটি নামে বিভাজিত হয়ে যায়।

উপরে বর্ণিত জ্ঞানের আঙ্গিকটি বিচার করলে উচ্চ প্রাথমিক কিংবা বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী স্তরটি অনেক ভালভাবে সংজ্ঞায়িত বিষয়ক্ষেত্রের উদ্ভাবনের স্থল হতে পারে। এই পর্বে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে এমন পরিসর সৃষ্টি সম্ভব যেখানে প্রাকৃতিক, সামাজিক, গাণিতিক বা ভাষিক সবরকমের তথ্য সংগ্রহ, তাদের শ্রেণী বিভাজন প্রক্রিয়ায় শিশুরা যুক্ত থাকবে এবং কয়েকটি জ্ঞানের এলাকা, যেমন নৈতিক বোধ এবং গুণাগুণ বিচারী চিন্তন তার মাধ্যমে ঐ একই বিষয়কে বিশ্লেষণ করা যাবে। সীমারেখা রহিত জ্ঞান এবং সামাজিক দাবিসমূহের প্রশ্নে বিশদ পরীক্ষার জন্য সৃষ্ট পরিসর এই পর্বে যৌক্তিক চিন্তনকে উৎসাহিত করে অনেক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে পারে।

এরই মধ্যে ছেলেমেয়েরা শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছে যায় এবং ততদিনে জ্ঞানের ভিত্তি, অভিজ্ঞতা, ভাষিক দক্ষতা এবং তাদের পূর্ণ অনুভবে জ্ঞানের বিভিন্ন রূপ যেমন, ধারণা, দেহের গঠন কাঠামোর জ্ঞান, তদন্তের পদ্ধতি, বৈধতার নিয়ম কানুন— এদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরিপক্কতা— সবকিছুই তারা যথেষ্ট পরিমাণে অর্জন করেছে। অতএব উপরের তালিকা ভুক্ত মৌলিক রূপের সঙ্গে বিষয়গুলি ঘনিষ্ঠ বাঁধনে যুক্ত। আর শিক্ষায় বিষয়গুলি ইতিমধ্যে স্বীকৃত।

জ্ঞানের বিভিন্ন রূপের সবকটির পর্যাপ্ত উপস্থাপনার দাবি উঠেছে। আর বিষয়ের ক্ষেত্রটি যখন সুস্পষ্টভাবেই সংজ্ঞায়িত, তখন সমরূপতা, বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তাদের মধ্যে সম্ভাব্য ও সবচেয়ে বিস্তৃত আন্তসংযোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

## বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার সংগঠন :

ক) সাধারণ কর্মকাণ্ড:

১) সমাবেশ
২) উদযাপন ও বিশেষ কর্মকাণ্ড
৩) ক্রীড়া
৪) অবাধ খেলার সময়
৫) সংলাপ , বিতর্ক এবং আলোচনা
৬) প্রশাসনিক এবং সাংগঠনিক কাজে অংশ গ্রহণ।

খ) বিষয় ক্ষেত্র ভাষা : নির্দেশের মাধ্যম, ইংরেজি, তৃতীয় ভাষা

৭) গণিত
৮) বিজ্ঞান
৯) সামাজিক বিজ্ঞান ও ইতিহাস
১০) শিল্পকলা
১১) চারুকলা এবং কাজ

## পাঠক্রমে জ্ঞান সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গে কয়েকটি নীতি :

* বিষয়ভিত্তিক বস্তুজ্ঞানের মধ্যে পাওয়া লেন্সের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক বাস্তবতার প্রশ্নে একটি বিচারধর্মী প্রেক্ষাপট অর্জন

* বিদ্যালয়ের বাইরে কোন একজনের অভিজ্ঞতাকে পুনরায় সুদৃঢ় করতে জ্ঞানকে তার আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠা করতে, এবং প্রাসঙ্গিকতা এবং অর্থপূর্ণ অবস্থান অনুভব করে স্থানীয় এবং বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানকে সংযুক্ত করা।

* নির্দিষ্টভাবে চর্চিত বিষয়গুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন এবং জ্ঞানের আন্তসংযুক্তি আবিষ্কার।

* অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসার মুক্তভঙ্গিমা কার্যকারিতা এবং সত্যের অস্থায়ী চরিত্র অনুধাবন।

* স্থানীয় অঞ্চলে 'স্থানীয় জ্ঞান'/ দেশজ ও অভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং যেখানে সম্ভব বিদ্যালয়ের জ্ঞানের সঙ্গে তাকে সম্পর্কিত করা।

* প্রশ্নকে উৎসাহিত করা এবং আরও নতুন প্রশ্নের অনুগমনের জন্য জায়গা ছেড়ে রাখা।

* শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন কাজ কর্মে ' সাম্য' এর প্রশ্নে সংবেদনশীল হওয়া সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত গতানুগতিকতা এবং কয়েকটি জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর শেখার ক্ষমতা সংক্রান্ত বৈষম্যের প্রসঙ্গে সচেতনতা ( যেমন মেয়েদের মাঠে পর্যায়ে গবেষণার কাজ না দেওয়া, অন্ধদের গণিতের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি)

কল্পনার বিকাশ, কল্পনা এবং কল্পকাহিনীকে সজীব রাখা

## তৃতীয় অধ্যায়

# পাঠক্রমের ক্ষেত্রসমূহ, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তর এবং মূল্যায়ন



পাঠক্রম পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলি দীর্ঘকাল ধরে একই ভাবনায়, একই অবস্থানে অনড় অটল হয়ে রয়েছে। অথচ আমাদের চারপাশে সামাজিক প্রত্যাশায় কত সব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। নানান বিস্তৃত বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অতএব পাঠক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনেক গভীর স্তর পর্যন্ত আমাদের ব্যাপক পরিভ্রমণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে প্রতিনিয়ত উদ্ভূত সামাজিক চাহিদার বয়ানে যেগুলিকে পাঠক্রমে যুক্ত করতে হবে তাদের নির্দ্দিষ্টভাবে সনাক্ত করা যাবে। এই প্রসঙ্গে শিল্পকলা ও শরীরী শিক্ষার মর্যাদা ও ভূমিকা বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। কেননা এগুলি 'অতিরিক্ত-পাঠক্রম'-এ চিহ্নিত এই অদ্ভুত শিরোনামে প্রায় শতাব্দী যাবৎ আবদ্ধ হয়ে আছে। অথচ নান্দনিক সংবেদনশীলতা এবং অভিজ্ঞতা বাড়ন্ত শিশুর বিকাশের প্রাথমিক ক্ষেত্র হয়ে ওঠার কথা। শিল্পকলাকে সরাসরি পাঠক্রমের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, প্রাসঙ্গিক স্তরগুলিতে যখন তাদের মধ্যে নিজস্ব পরিচয়ের বোধ জন্মানোর প্রক্রিয়া চলছে, তখনই তাদের মনে শিল্পকলার অনুভব সঞ্চারিত করতে হবে। কাজ, শান্তি এবং শরীর শিক্ষা এদের বিষয়েও ঐ একই কথা বলতে হয়। আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ব্যক্তিক বিকাশের জন্য ঐ তিনটি বিষয়েরই মৌলিক তাৎপর্য রয়েছে। আত্মবিশ্বাসী, সম্পদশালী এবং শান্তি অভিমুখী মূল্যবোধ ও স্বাস্থ্যে ভরপুর এক সংস্কৃতির মধ্যে যাতে শিশুদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল হয়, তা নিশ্চিত করতে বিদ্যালয়গুলিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেই হবে।

### ৩.১ ভাষা

এই দলিলে ভাষা দ্বি বহুভাষিকতার ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে। আর ঘরের ভাষা বা মাতৃভাষা অর্থে বাড়ির মধ্যে, বিস্তৃত বৃহত্তর আত্মীয় সম্পর্কে, রাস্তায় এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে ব্যবহৃত ভাষা অর্থাৎ একটি শিশু তার ঘর-বাড়ি এবং সামাজিক পরিবেশ থেকে স্বাভাবিকভাবে যে

ভাষাগুলিতে দক্ষ হয়ে ওঠে তাদের কথাই বলা হয়। ভাষার সহজাত দক্ষতা নিয়ে শিশুরা জন্মগ্রহণ করে। আমাদের প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, বেশিরভাগ শিশুই, এমনকি তাদের বিদ্যালয়ের পাঠ শুরু হবার আগেই, প্রচণ্ড জটিল এবং নিয়ম-অনুসারী ব্যবস্থা যার নাম ভাষা, সেটিকে তারা আত্মস্থ করে এবং পূর্ণ ভাষিক দক্ষতার অধিকারী হয়। অনেকক্ষেত্রে, শিশুরা যখন বিদ্যালয়ে আসে, তখন ইতিমধ্যেই তারা বাচিক ও শ্রুতির স্তরে দুই বা তিনটি ভাষার অভিজ্ঞতা সঙ্গে নিয়ে আসে। কেবলমাত্র সঠিকভাবে নয় একেবারে যথাযথ স্থানে তারা এই সব ভাষা প্রয়োগ করতে পারে। এমনকি ভিন্ন প্রতিভাসম্পন্ন শিশুরা যারা কথ্যভাষা ব্যবহার করে না, তারাও অভিব্যক্তি এবং ভাব বিনিময়ের জন্য অনুরূপ জটিল চিহ্ন ও সংকেতের এক বিকল্প ব্যবস্থাতন্ত্র বিকশিত করে নেয়।

একজন মানুষের আপন জীবনে সৃষ্ট এবং তার সহবক্তাদের থেকে উত্তরাধিকারে অর্জিত সংকেত এবং স্মৃতির এক মজুতভাণ্ডার আমাদের সামনে উপস্থিত করে ভাষা। ব্যক্তি মানুষের চিন্তন এবং আত্মপরিচয়ের মধ্যে নিবিড় বন্ধনে জড়িয়ে থাকার কারণে, বেশির ভাগ জ্ঞানই ভাষার মাধ্যমে নির্মিত হয়। বস্তুত, আত্মপরিচয়ের সঙ্গে তার এমনই ঘনিষ্ঠআত্মীয়তা যে কোনো শিশুর মাতৃভাষাকে অস্বীকার করা বা তাকে মুছে ফেলার অর্থ হল আত্মবোধের মধ্যে অনধিকার অনুপ্রবেশ। ভাষার কার্যকর বোধে এবং ব্যবহারে শিশু ভাবনা বা আদর্শ, মানুষ এবং বস্তুর মধ্যে সংযোগসূত্র গড়ে তুলতে এবং তার চারপাশের জগৎকে যুক্ত করতে সক্ষম হয়।

বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষাদানের জন্য কোনো বিচক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণের বাসনা যদি আমাদের হয়, তবে শিশুদের সহজাত এই ভাষিক ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সেই সঙ্গে স্মরণে রাখতে হবে যে, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্তরে নির্মিত হয় ভাষা এবং আমাদের দিন প্রতিদিনের ঘাত-প্রতিঘাতে সেটি অবিরত রূপবদল করে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমস্ত সম্পদের ভিত্তিতে আদর্শগত স্তরে ভাষা নির্মাণ করা হয় এবং শিক্ষাগত জ্ঞানার্জনের জন্য সাক্ষরতার বিকাশে (ব্রেইল লিপি সহ) একে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা চালানো হয়। ভাষার ক্ষেত্রে যেসব শিশুদের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তাদের একটি আদর্শ চিহ্ন ভাষার সঙ্গে পরিচিত করানো উচিত, যাতে তারা নিজেদের ক্রমান্বয়ী বৃদ্ধি এবং বিকাশকে পূর্ণমাত্রায় সাহায্য করতে পারে। শিক্ষার্থীদের ভাষিক দক্ষতার স্বীকৃতিতে তাদের নিজেদের প্রতি এবং সাংস্কৃতিক শিকড়ের প্রতি বিশ্বাস সঞ্চারে উৎসাহিত করা যায়।

### ৩.১.১ ভাষা শিক্ষা

ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্য আমাদের এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় বটে কিন্তু সেই সঙ্গে সুযোগের এক বিস্তৃত পরিসর প্রসারিত করে। বিপুল সংখ্যক ভাষায় মানুষ এখানে কথা বলে, কেবলমাত্র সে কারণেই ভারত অনন্য নয়; এই সমস্ত ভাষার মধ্যে যে অসংখ্য এবং বিচিত্র ভাষা-পরিবার উপস্থাপিত হয় তারই সুবাদে এ দেশ বিশিষ্ট। পৃথিবীতে এরকম আর কোনো দেশ নেই যেখানে পাঁচটি বিভিন্ন ভাষা পরিবারের অস্তিত্ব রয়েছে। এমনকি গঠনগত বিচারে এরা এত পৃথক বৈশিষ্টসম্পন্ন যে, বিভিন্ন ভাষা-পরিবার যেমন, ইন্দো-আর্য, দ্রাবিড়ীয়, অস্ট্রো - এশিয়, তিব্বতী - বর্মা এবং আন্দামানী এইভাবে তাদের শ্রেণীবিভাজন করা যায়, তবুও অবিরত তারা পরস্পরের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতে মিলিত হয়। ভাষাবিদ্যাগত এবং সামাজিক ভাষাবিদ্যাগত এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে, সব ভাষার মধ্যেই যার সন্ধান মেলে। এই নিরীক্ষায় একটি যে তথ্যের সাক্ষ্য মেলে তা হল, ভারতবর্ষে অনেক শতাব্দী যাবৎ এইসব বিবিধ ভাষা ও সংস্কৃতি সহাবস্থান রয়েছে এবং এরা একে অন্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ধ্রুপদী ভাষাসমূহ যেমন, লাতিন, আরবি, ফার্সি, তামিল এবং সংস্কৃত প্রত্যেকটিই তাদের বিভক্তি-প্রত্যয় নির্ভর ব্যাকরণের কাঠামো এবং নান্দনিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ। এরা আমাদের জীবনকে উদ্ভাসিত করতে পারে কেননা অনেক ভাষার শব্দভাণ্ডারই এদের কাছে ঋণী।

> কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, দ্বিভাষিক দক্ষতায় ধারণাশক্তির বৃদ্ধি, সামাজিক সহনশীলতা, বহুমুখী চিন্তন এবং পাণ্ডিত্য অর্জনের স্তরটি উন্নীত হয়। সামাজিক বা জাতীয় স্তরের বহুভাষিকতা হল অন্যান্য জাতীয় সম্পদের প্রতিতুলনায় আর একটি সহায়ক সম্পদ।

আজ আমরা নিশ্চিত জানি যে, ধারণশক্তির ক্ষেত্রে দ্বিভাষিকতা বা বহুভাষিকতার কয়েকটি নির্দিষ্ট সুবিধা রয়েছে। ভারতের ভাষাগত পরিস্থিতির সুবিধাকে কাজে লাগানো ও তার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট উদ্যোগ হল এই ত্রি-ভাষা-সূত্র। এটি এমনই এক কৌশল যেটি প্রকৃতপক্ষে আরো ভাষা শিক্ষার উদ্যমী পাটাতন হিসেবে অবশ্যই কাজ করবে। এ বিষয়টি অক্ষরে - অক্ষরে এবং মর্মে-মর্মে অনুসরণ করা প্রয়োজন। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল বিবিধ ভাষা শিক্ষা এবং জাতীয় ঐক্যের প্রচার। এই লক্ষ্য অর্জনে নিম্নলিখিত নির্দেশিকাবলী আমাদের সাহায্য করতে পারে।

* শিশুদের কতগুলি ভাষা শেখানো যাবে তার নিরিখে ভাষাশিক্ষা বহুভাষিক হয় না, বরং বহুভাষাভাষী একটি শ্রেণীকক্ষকে সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করে নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবনের প্রক্রিয়াতেই ভাষাশিক্ষাদান বহুভাষিক হয়ে ওঠা জরুরি।

* শিশুদের বাড়ির ভাষা, ৩.২ অংশে যার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, সেটিই তার বিদ্যালয়-শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত।

* যদি উচ্চতর স্তরে বাড়ির ভাষায় শিক্ষাদানের সুযোগ কোনো বিদ্যালয়ে না থাকে, তবু সেক্ষেত্রেও প্রাথমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ অংশটি বাড়ির ভাষাতেই শেখাতে হবে। শিশুর বাড়ির ভাষাকে শ্রদ্ধা করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য। আমাদের সংবিধানের ৩৫০ ধারা অনুসারে, 'প্রতিটি রাজ্য এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকেই রাজ্যের মধ্যে বসবাসকারী ভাষার বিচারে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজ নিজ মাতৃভাষায় নির্দেশ শোনার পর্যাপ্ত সুবিধা দানে উদ্যোগী হতে হবে।'

* একেবারে প্রারম্ভিক সময় থেকেই শিশুরা বহুভাষিক শিক্ষা পাবে। বিবিধ ভাষাভাষী একটি দেশের ক্ষেত্রে, নানান ভাষায় ভাববিনিময়ের দক্ষতা প্রসারের মূল নীতিতে ত্রি-ভাষা-সূত্রের প্রয়োগ জরুরি।

* অ-হিন্দী ভাষাভাষী রাজ্যগুলিতে, শিশুরা হিন্দী শিখবে। আর হিন্দী ভাষাভাষী রাজ্যে শিশুরা সে অঞ্চলে প্রচলিত নয় এমন একটি ভাষা শিখবে। অন্যান্য ভাষার সঙ্গে আধুনিক ভারতীয় ভাষা হিসাবে সংস্কৃত অধ্যয়ন করা যাবে।

* পরবর্তী স্তরে, ধ্রুপদী এবং বিদেশী ভাষা শিক্ষার প্রবর্তন করা যেতে পারে।

**৩.১.২ প্রথম ভাষাশিক্ষা অথবা মাতৃভাষায় শিক্ষা**

এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, শিশুরা তাদের সহজাত ভাষা-কুশলতা এবং নিজ-পরিবার ও চারপাশের অন্যান্য মানুষজনের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে তাদের ভাষায় অথবা অনেক ক্ষেত্রে ভাষাসমূহে পূর্ণ-বিকশিত ভাব-বিনিময়ী দক্ষতা সহ বিদ্যালয়ে আসে। বিদ্যালয়ে প্রবেশকালে তারা শুধুমাত্র হাজার-হাজার শব্দভাণ্ডারই বহন করে আনে না, সেই সঙ্গে ধ্বনি, শব্দ, বাক্য এবং কথোপকথনের স্তরে যে নীতিসমূহ দ্বারা ভাষার জটিল এবং সমৃদ্ধ কাঠামোটি পরিচালিত হয়, তাদেরও পূর্ণ-নিয়ন্ত্রণ এইসব শিশুদের আয়ত্তাধীন থাকে। নিজের ভাষায় কেমন করে সঠিক ভাবে কথা বলতে বা বুঝতে হয়, কেবলমাত্র সেটিই নয়, কীভাবে যথাযথ স্থানে তাকে প্রয়োগ করতে হয় তাও শিশুটি জানে। স্থান-কাল-পাত্র ও বিষয়ের নিরিখে সে তা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ধ্বনির ঘনঘটা থেকে ভাষার এই চরমতম জটিল ব্যবস্থাতন্ত্রটি পৃথক করার ধারণা সহজাত দক্ষতা তার অবশ্যই রয়েছে। প্রথম-ভাষা-শিক্ষার উদ্দেশ্য হল এই সব দক্ষতার নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে ভাব-বিনিময় এবং ধারণাশক্তির ক্ষমতাকে অগ্রগামী স্তরে উন্নীত করার জন্য ক্রমাগত উৎসাহ দেওয়া। তৃতীয় শ্রেণী থেকে শিক্ষা এবং উচ্চস্তরের ভাববিনিময়ী ক্ষমতা ও যুক্তিবিচারী চিন্তন বিকাশের জন্য কথন এবং সাক্ষরতা কার্যকরী হাতিয়ার হয়ে উঠবে। প্রাথমিক পর্বে, শিশুর ভাষাকে সংশোধনের কোনো চেষ্টা না করে সে যেমন বলছে, সেভাবেই কথাটি গ্রহণ করা প্রয়োজন চতুর্থ-শ্রেণী থেকে যদি সমৃদ্ধ এবং

আগ্রহোদ্দীপক রচনার সঙ্গে পরিচয় ঘটানো যায়, তবে শিশু নিজেই ভাষার আদর্শ মান এবং বিশুদ্ধ বানানের সঠিক নিয়মটি অনুধাবন করতে পারবে। কিন্তু এক্ষেত্রেও, শিশুর বাড়ির ভাষা / মাতৃভাষার প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান যেন দেখানো হয় সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। ভুল যে শিক্ষালাভের প্রক্রিয়ার একটি প্রয়োজনীয় অংশ এবং শিশু যখন নিজেই এ বিষয়ে প্রস্তুতি লাভ করবে তখনই যে এ ভুল সে সংশোধন করে নেবে, এ বিষয়টি অবশ্যই মেনে নিতে হবে। সর্বক্ষণ কেবল তার ভুলগুলির এবং শিক্ষার 'কঠিন দিকগুলি'-র প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পরিবর্তে শিশুদের বোধগম্য, আগ্রহোদ্দীপক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বানকারী বা চ্যালেঞ্জিং শিক্ষাদানে সময় ব্যয় করাই অধিকতর উত্তম কাজ।

> সাহিত্য শিশুর আপন সৃষ্টিশীলতার একটি উদ্দীপনাও হয়ে উঠতে পারে। একটি গল্প, কবিতা বা গান শোনার পর শিশুরা নিজেরাই কিছু লেখার বিষয়ে উৎসাহিত হতে পারে। সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তির বিবিধ রূপকে একত্রিত বা সংহত করার কাজেও তারা উৎসাহিত হতে পারে।

বিদ্যালয়ে বাড়ির ভাষা শিক্ষার গুরুত্বকে অতিরিক্ত মর্যাদা দেওয়াও বস্তুত কঠিন। শিশুরা যদিও পারস্পরিক ভাববিনিময়ের প্রাথমিক দক্ষতায় কুশলী হয়েই বিদ্যালয়ে আসে, তবুও সঠিক ধারণাশক্তির অর্জনে বিদ্যালয়ে ভাষাসংক্রান্ত উচ্চতর শিক্ষার স্তরটি তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। বিষয়বস্তুর বিচারে সমৃদ্ধ যে পরিস্থিতি, যেখানে ধারণাশক্তির দক্ষতা তেমন প্রয়োজনীয় নয় যেমন, সঙ্গীদের মধ্যে দলগত আলাপ - আলোচনায়, তর্ক-বিতর্কে-যেখানে ভাষাগত প্রাথমিক দক্ষতাই পর্যাপ্ত। কিন্তু যে পরিস্থিতি বিষয়বস্তুর বিচারে তেমন সমৃদ্ধ নয় অথচ ধারণাশক্তির দক্ষতা যেখানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যেমন বিমূর্ত কোনো বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনায়-সেক্ষেত্রে ভাষার এপর উচ্চস্তরের দক্ষতা সহজেই যে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় স্থানান্তরিত হতে পারে এ তথ্য একন পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাসমূহের সুদূরপ্রসারী শিক্ষাদানকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু করা আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য।

ভাষাশিক্ষা কখনোই ভাষার জন্য নির্ধারিত ঘণ্টায় আবদ্ধ থাকে না। বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান এবং অঙ্কের জন্য নির্ধারিত সময়েও শ্রেণীকক্ষে, এক অর্থে, ভাষা শিক্ষাই দেওয়া হয়। এই সমস্ত বিষয়গুলি শিক্ষার অর্থ হল, এদের নির্দিষ্ট পরিভাষাগুলি জানা, বিষয় সংক্রান্ত ধারণাগুলি অনুধাবন করা এবং যুক্তিবিচারী দৃষ্টিভঙ্গিতে এ সমস্ত বিষয়ে আলাপ - আলোচনা ও লেখনে সক্ষম হওয়া। কিছু কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে, পুস্তকের সাহায্য নেওয়া বা বিভিন্ন ভাষায় অন্যান্য মানুষজনের সঙ্গে কথা বলা কিংবা ইন্টানেট থেকে ইংরাজি ভাষায় নানান উপাদান সংগ্রহ করা-এই সমস্ত কাজে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা উচিত। সমগ্র পাঠক্রমে ভাষার ক্ষেত্রে এহেন নীতি গ্রহণে বিদ্যালয়ে প্রকৃত অর্থেই বিবিধ ভাষাচর্চাকে মর্যাদা দেওয়া যাবে। সেই সঙ্গে ভাষার ঘন্টাতেও কিছু অনবদ্য সুযোগ থাকতে হবে। গল্প, কবিতা,গান এবং নাটক শিশুদের তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে এবং নিজ অভিজ্ঞতাকে বুঝতে ও অন্যের প্রতি সহমর্মিতা বিকাশের ক্ষেত্রে তাদের সামনে প্রভূত সুযোগ এনে দেয়। এছাড়া আরো একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় যে কঠিন এবং কখনো কখনো একঘেঁয়ে ব্যাকরণ শিক্ষার পরিবর্তে, একত্রে শিশুরা অনায়াসেই এই সমস্ত কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যাকরণ এবং তার নিয়মাবলীকে পৃথক করতে পারে।

বিভিন্ন দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অনেকে যখন সাধারণ সামাজিক আলাপ - আলোচনার মাধ্যমে ভাষার প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন করে, তখন এরই সঙ্গে বিশেষভাবে পরিকল্পিত উপাদান তারা পেয়ে যেতে পারে। যেগুলি তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশের উন্নতিসাধনে সহায়ক হয়। কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই এমন শিক্ষার্থীদেরও চিহ্ন ভাষা এবং ব্রেইল অধ্যায়নের সুযোগ এই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে পারা যায়।

### ৩.১.৩ দ্বিতীয় ভাষার শিক্ষা গ্রহণ

ভারতের মতো এমন এক বহু ভাষাভাষী দেশে ইংরাজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। শিক্ষকের ইংরাজি ভাষার দক্ষতা এবং বিদ্যালয়ের বাইরে ছাত্রছাত্রীদের ইংরাজির সঙ্গে আলাপ - পরিচয় — এই দুটি কারণে বিচিত্র এবং দূরপ্রসারী ইংরাজি শিক্ষাদানের পরিস্থিতি এখানে বর্তমান। ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তনার স্তরটি এখন শিক্ষাগত বা কার্যকারিতার বিচারে নিরূপণের বিষয় নয়, বরং এটি বর্তমানে সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার বিষয়। আর পাঠ্যক্রমে এরা প্রবর্তনার স্তরটির প্রশ্নে সাধারণ মানুষের পছন্দকে মর্যাদা দিতেই হবে। তবে কর্ম সম্পাদনে অপারগ হয়ে আমাদের শিক্ষার মানকে নিম্নগামী করে না তোলে।

দ্বিতীয় ভাষা - শিক্ষার পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য দ্বিবধ: স্বাভাবিক ভাষাশিক্ষায় যেমন দক্ষতা অর্জিত হয় তেমনি প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন এবং সাক্ষরতার মাধ্যমে (উদাহরণ স্বরূপ) বিমূর্ত চিন্তন এ জ্ঞানার্জনের জন্য হাতিয়ার হিসাবে ভাষার বিকাশ ঘটানো । ফলে অন্তঃপাঠক্রমী এক জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষে যুক্তিবিস্তার করা যায় যেটি ইংরাজি ও অন্যান্য বিষয় এবং ইংরাজি ও অন্যান ভারতীয় ভাষার মধ্যে বিভেদের প্রাচীর ভেঙে ফেলে। প্রাথমিক পর্বে, ইংরাজি শিক্ষাকার্যক্রমের জন্য সাহায্যে জগৎ সম্পর্কে শিশুর সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়। পরবর্তী পর্যায়ে ভাষার সাহায্যে সমস্ত বিষয়ের পাঠ নিতে হয়। উচ্চতর - মাত্রায় ভাষাগত দক্ষতা অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে প্রসারিত হয়, পঠন (উদাহরণস্বরুপ) একটি স্থানান্তরণ যোগ্য দক্ষতা। একটি ভাষায় এই দক্ষতার উন্নতিসাধন করলে, অন্য ভাষার ক্ষেত্রেও তা প্রসারিত হয়। ঠিক যেমন, কোনো শিক্ষার্থী নিজস্ব ভাষায় পঠনের দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হলে, দ্বিতীয় ভাষা পঠনের ক্ষেত্রেও তার বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

> সাংবিধানিক ভাবে প্রতিটি শিশুকে আটবছরের যে শিক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে তারই মধ্যে প্রায় চার বছরের পরিসরে ইংরাজি ভাষায় প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন সম্ভব হতে পারে। বিদ্যালয় জীবনের একেবারে সূচনাপর্ব থেকেই বিবিধ ভাষা শিক্ষাদানের দৃষ্টিভঙ্গি নানান ক্ষতি কারক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে যেমন, শিশুর নিজস্ব ভাষা হারিয়ে যাওয়া এবং প্রবল অবোধ্যতার ভার।

ইংরাজি কখনো একাকী তার পায়ের নীচে জমি পায় না। ইংরাজি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হল বিবিধ ভাষাবিদ মানুষ গড়ে তোলা যারা আমাদের সরকটি ভাষাকেই সমৃদ্ধ করতে পারে। জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি মান্য করার এটিও একটি উপায়। বিভিন্ন রাজ্যে, অন্যান্য ভারতীয় ভাষাসমূহকে মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন। 'ইংরাজি - মাধ্যম ' বিদ্যালয়গুলির তুলনামূলক সাফল্যে প্রতিভাত হয় যে ভাষাকে যখন ভাষা হিসাবে না শিখিয়ে বিভিন্ন অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিতির মাধ্যম হিসাবে শেখানো হয়, তখন ভাষাটি শেখা যায়। এইভাবে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অবস্থানে ইংরাজিকে অবশ্যই দেখতে হবে, সমগ্র পাঠ্যক্রমে একেবারে বুনিয়াদী বা প্রাথমিক শিক্ষায় ভাষাশিক্ষার বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে সমস্ত শিক্ষাই এক অর্থে ভাষাশিক্ষা,'বিষয় হিসাবে ইংরাজি' এবং 'মাধ্যম হিসাবে ইংরাজি' এই দুয়ের মাঝে সেতুবন্ধ রচনা করমব এই দৃষ্টিভঙ্গি। এইভাবে আমরা 'ভাষা- শিক্ষা ' এবং 'নির্দেশের মাধ্যম হিসাবে ভাষার ব্যবহার ' এদের মধ্যে পার্থক্য টানে না এমন একটি সাধারণ বিদ্যালয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে অবশ্যই অগ্রবর্তী হতে পারব।

প্রথম বা দ্বিতীয় যে ভাষাই হোক না কেন, অন্তমুখী সরবরাহে সমৃদ্ধ ভাব - বিনিময়ী পরিবেশ হল সেই ভাষা শিক্ষার প্রাক - প্রয়োজনীয় শর্ত। এই অন্তমুখী সরবরাহ বা জোগানের অন্তর্ভুক্ত হল পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষার্থীর নির্বাচিত

পাঠ্য, এবং শ্রেণী পাঠাগার, বিচিত্ররকম উপাদানের অনুমতি: মুদ্রিত উপাদান ( উদারণস্বরূপ অল্পবয়সি শিক্ষার্থীদের জন্য বিরাট বিরাট বই), একাধিক ভাষায় সমান্তরাল গ্রন্থ এবং উপাদান, মাধ্যম - সহায়তা ( শিক্ষার্থীর সাময়িকী - — দৈনিক সংবাদ-পত্রের স্তম্ভ সমূহ, রেডিও - অডিও ক্যাসেট) এবং ' প্রামানিক ' উপাদান। অসুবিধার মধ্যে থাকা শিক্ষার্থীদের ভাষাসংক্রান্ত পরিবেশ সমৃদ্ধ করার জন্য বিদ্যালয়কেই গোষ্ঠীগত শিক্ষাকেন্দ্রে বিকশিত করা প্রয়োজন। বিচিত্র এবং বিভিন্ন ধরনের সফল উদ্ভাবন রয়েছে যেগুলির সাধারণ গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে উৎসাহ এবং অনুসন্ধান প্রয়োজন। এই সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদ্ধতিসমূহ বিশিষ্ট হবার প্রয়োজন নেই বটে, কিন্তু একটি প্রশস্ত বোধগম্য দর্শনের ভিগোটস্কিয়, চমস্কিয় এবং পিয়াগেশিয় নীতি অগুসারী ) অভ্যন্তরে এদের পাবস্প রিক লেনদেন ও সহায়তা থাকতে হবে। মৌলিক যোগ্যতাসমূহ একবার সুনিশ্চিত করতে পারলেই উচ্চস্তরের দক্ষতাসমূহ ( সাহিত্যিক উপলব্ধি এবং লিঙ্গ-ধারণায় ভাষার ভূমিকা সহ) বিকশিত করতে পারা যায়।

প্রস্ত তিপর্বে শিক্ষক - শিক্ষিকাদেরও শিক্ষিত করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের শিক্ষাক্রমান্বয়ী এবং স্থানিক (প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক সহায়ক ব্যবস্থার মাধ্যমে) হওয়া প্রয়োজন। কার্যকারী দক্ষতা এবং পেশাগত সচেতনতা দুটিকেই সমানভাবে উৎসাহিত করতে হবে। আর শেষোক্তটির ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে শিক্ষক/শিক্ষিকার নিজস্ব ভাষায় প্রচার করতে হবে। সেকল শিক্ষক-শিক্ষিকারা ইংরাজি পড়াবেন তাঁদের সকলেরই ইংরাজি ভাষায় প্রাথমিক দক্ষতা থাকা উচিত। কীভাবে ভাষা শিক্ষা করতে হয় সেই সংক্রান্ত কিছু জ্ঞানের ভিত্তিতে সমস্ত শিক্ষক - শিক্ষিকারাই তাঁদের পরিস্থিতি এবং স্তরের পক্ষে যথাযথ এমন ভাবে ইংরাজি শেখানোর দক্ষতা অর্জন করবেন। তথ্য-সরবরাহে সমৃদ্ধ একটি পাঠ্যক্রম উপস্থাপিত করতে এমন বিবিধ বিচিত্র উপাদান সহজলভ্য করে তুলতে হবে, যাদের দৃষ্টি অর্থবহতায় কেন্দ্রীভূত।

কোনো একটি বিশেষ পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রে, ভাষাশিক্ষার মূল্যায়ন সামগ্রিক 'অর্জন'- এর সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজন নেই। তবে ভাষাগত দক্ষতার পরিমাণে এটিকে অবশ্যই পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে। শিক্ষালাভের প্রতিবন্ধক হিসাবে নয়, বরং মূল্যায়নকে শিক্ষার সক্ষমতার উপাদান করে তুলতে হবে। নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনী পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ী চলমান মূল্যায়নকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির লিপিবদ্ধ তথ্যে পরিণত করা যায়। ভাষাগত দক্ষতার জাতীয় মূল্যমানটি প্রাথমিক পর্বে এমনভাবে স্থির করা প্রয়োজন, যেখানে ঐচ্ছিক ইংরাজি পরীক্ষার একটি গুচ্ছ পরিকল্পনায় স্থান পাবে। এর ফলে যখন শংসাপত্র দেবার প্রয়োজন হবে, তখন মূল্যায়নের আদর্শ মানের পাঠ্যক্রমের ভারসাম্য থাকবে। আর বর্তমানে এই যে ইংরাজি (এবং সেই সঙ্গে অঙ্ক) কে দশম শ্রেণীর স্তরে অসাফল্যের প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে, তার প্রতিরোধেও একটা কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিদ্যালয়ের নিয়মিত পাঠক্রমের বাইরে যদি ইংরাজির শংসাপত্র (এবং সেকারণেই নির্দেশ) দেওয়ার একটি বিকল্প পথ থাকে, তবে একজন শিক্ষার্থীকে 'ইংরাজি ব্যতিরেকে উত্তীর্ণ' হবার অনুমতি দেওয়া যাবে।

### ৩.১.৪ পড়তে এবং লিখতে শেখা

আমরা যদিও অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ভাষাগত বিবিধ দক্ষতা গঠনের শিক্ষা দেবার জন্য একটি সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গির স্বপক্ষে প্রচার করছি, তবু আমাদের বিদ্যালয়গুলিকে, অনেক সময় বিশেষত শিক্ষার্থীর বাড়ির ভাষার ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র পড়তে এবং লিখতে শেখানোর বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাষা অথবা ধ্রুপদী বা বিদেশী কোন ভাষার ক্ষেত্রে, ভাব বিনিময়ী দক্ষতা সহ সবধরমের দক্ষতা অর্জন গুরত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সরলরৈখিক এবং সংযোজনী কোনো পদ্ধতি, প্রকৃতপক্ষে যা অর্থহীন, তার তুলনায় মনে হয়, শিশুদের কাছে অর্থবহ এমন কোনো সামূহিক পরিস্থিতির মধ্যে তাদের অনেক বেশি ভালো শেখানো যায়। সমৃদ্ধ এবং বোধগম্য তথ্য সরবরাহে,

ভাষার ভিন্নতর সমস্ত দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রস্তুত করা যাবে। অনেক ভাব- বিনিময়ী পরিস্থিতি, যেমন ধরা যাক দূরভাষে কারোর কথা শুনে তা লিপিবদ্ধ কর এমন সব কাজে অসংখ্য দক্ষতা একত্রে ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের আকাঙ্ক্ষা হল, শিশুরা তাদের আপন উপলব্ধিতেই লিখতে বা পড়তে শিখুক। দক্ষতা, চিন্তন, সংকেত এবং অস্তিত্বের চিহ্ন — এদের সমাবেশ হিসাবে ভাষা বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়সমূহ এবং বিষয়ক্রমের একেবারে অন্তঃস্থলে প্রোথিত। কথন এবং শ্রবণ, পঠন এবং লেখন এ-সমস্ত হল সাধারণ দক্ষতা আর এদের বিষয়ে শিশুর পাণ্ডিত্য তার বিদ্যালয় জীবনে সাফল্যলাভের চাবিকাঠি হয়ে ওঠে। অনেক পরিস্থিতিতে, এই সমস্ত দক্ষতা একত্রে ব্যবহার করতে হয়। ঠিক এই কারণেই বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষার প্রশ্নটি শুধুমাত্র ভাষা-শিক্ষক / শিক্ষিকার একক দায়িত্বের বিষয় না হয়ে বিদ্যালয়ের প্রত্যেকেরই আলোচ্য হয়ে ওঠা উচিত। অবশ্য ভাষা-সংশ্লিষ্ট দক্ষতার মৌলিক ভূমিকা প্রাথমিক বা বুনিয়াদী স্তরেই থেমে যায় না। বরং মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণীতে বিষয়গুলির ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রয়োজন উদ্ভূত হওয়ায় ভাষাগত দক্ষতার ভূমিকা ঐ স্তর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। প্রাত্যহিক জীবনের নানান দাবি ও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে জীবনের ধারাবাহিকতায় বিকশিত দক্ষতাসমূহ যেমন, যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তন, নৈর্ব্যক্তিক ভাব বিনিময়, আলাপ-আলোচনা/প্রত্যাখান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ / সমস্যার সমাধান এবং মানানসই ও আত্ম পরিচালন — এ ধরনের বিবিধ দক্ষতাও অত্যন্ত আবশ্যিক।

চিরাচরিত প্রথায় শিক্ষিত একজন ভাষা-শিক্ষক/শিক্ষিকা ভাষার অভিব্যক্তিময় এবং অংশগ্রহণকারী কার্যকারিতার পরিবর্তে বরং বাচনভঙ্গিতে উচ্চারণের 'সঠিকতা'-র শিক্ষাদানে অধিক যত্ন নেন। ঠিক এই কারণেই আমাদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায় শ্রেণীকক্ষে কথা-বলাকে অত্যন্ত নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়। আর শিশুদের শ্রেণীকক্ষে চুপ করিয়ে রাখতে বা নির্ভুল উচ্চারণে কথা - বলা শেখাতে শিক্ষক/ শিক্ষিকার বেশিরভাগ সময়ই খরচ হয়ে যায়। শিক্ষক / শিক্ষিকারা যদি একবার শিশুর এই কথা বলাকে গোলযোগ উদ্রেককারী না ভেবে সম্পদ হিসাবে বিচার করেন, তবে প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের এই বদ্ধ-চক্রটি অভিব্যক্তি-সংবেদন-চক্রে রূপান্তরিত হবার একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। শিশুর কথা-বলাকে কীভাবে সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে জ্ঞানের এক বিপুল ভাণ্ডার আমাদের রয়েছে। শিক্ষকদের কর্মজীবনের প্রাক্কালে এবং কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণের যে কর্মসূচী সেখানে অবশ্যই এই জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটাতে হবে। পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক নির্দেশিকা রচনার ক্ষেত্রে এমনভাবে পরিকল্পনা করা যায় যাতে এ বিষয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সংক্ষিপ্ত এবং বিবিধ পথ নির্দেশ দেওয়া যায় যেখানে, শিশুদের মধ্যে ছোট ছোট দলে কথা বলানো, সম এবং বিপরীতের তুলনামূলক বিচারের দক্ষতাকে পুষ্ট করবে এমন কর্মসূচী গ্রহণ, বিস্ময়বোধ এবং স্মৃতির উন্মীলন, অনুমান এবং চ্যালেঞ্জ, বিচার এবং মূল্যায়ন — এসবের সাহায্যে পঠিত বিষয়বস্তুকে আরো গভীর অনুধাবন করতে পারা যায়। শ্রবণের স্তরেও, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক/শিক্ষিকা নির্দেশিকায় যুক্ত করার জন্য অনুরূপ কর্মসূচীর বিশদ পরিকল্পনায় তাৎপর্যপূর্ণ দক্ষতা এবং মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে অনেক দূর অবধি অগ্রসর হওয়া যায়। এ পর্যায়ে মনোনিবেশ, অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব দেওয়া, অব্যক্ত উচ্চারণের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং যা বলা হচ্ছে তার অর্থবিষয়ে নমনীয় উপান্তে উপনীত হওয়া — এই সমস্ত দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত হয়। কথনের মতো শ্রুতি বা শ্রবণ ও এইভাবে দক্ষতা ও মূল্যবোধের জটিল জাল গড়ে তোলে। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে রয়েছে লোককাহিনী, গল্পকথন, গোষ্ঠী গীত এবং থিয়েটার। গল্পকথন কেবলমাত্র প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এমনকি পরবর্তী ক্ষেত্রেও এর বিশেষ তাৎপর্য আছে। মুখে-মুখে বলা কাহিনী যেহেতু কল্পনাশক্তিকে প্রসারিত করে এবং একজন মানুষের নিজের জীবনের থেকে দূরবর্তী কোনো পরিস্থিতিকে আপন অভিজ্ঞতা বিবেচনায় অংশগ্রহণের দক্ষতা বৃদ্ধি করে, সে-কারণে কথিত কাহিনীর সাহায্যে বৌদ্ধিক অনুভবের ভিত্তি স্থাপিত হয়। শিশুর বিকাশে কল্পকাহিনী এবং রহস্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভাষাশিক্ষার অপর ক্ষেত্র হিসাবে, সঙ্গীতের সাহায্যেও শ্রুতিকে সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন। সঙ্গীতের মধ্যে লোক-প্রচলিত, ধ্রুপদী এবং জনপ্রিয় সাবধরনের সুরসৃষ্টিই রয়েছে। লোকগাথা এবং সঙ্গীত ভাষার পাঠ্যপুস্তকে যথাযোগ্য মর্যাদা দাবি করতে পারে। কেননা এদের বিশিষ্ট চর্চা এবং কর্মসূচীর সাহায্যে এই সংক্রান্ত বিতর্ক বিকাশের ক্ষমতা লাভ করা যায়।

ভাষাশিক্ষার কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র হিসাবে যখন সবক্ষেত্রেই পঠনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তখনই আবার বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী তথ্যের ভারে আর মুখস্থ করার অনুশীলনে ভারাক্রান্ত। এমনই সে ভার পড়ার যে নিজস্ব আনন্দ সেটাই পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। পঠনের সংস্কৃতি বা অভ্যস্ততা প্রচার করার জন্য সমস্ত পর্যায়ে ব্যক্তিগত স্তরে পঠনের সুবিধা গড়ে তোলা প্রয়োজন। আর শিক্ষক/ শিক্ষিকাদেরও অবশ্যই এমন এক সংস্কৃতির সদস্য হবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। পঠনকে নিরুৎসাহিত করার প্রধান উপায়গুলিও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ের সমস্ত বিষয়গুলির সংশ্লিষ্ট এবং প্রতিটি পর্বে সহায়ক পাঠ্য উপাদানের সরবরাহ এবং বিকাশের প্রতি আশু মনোযোগ প্রয়োজন। এই সমস্ত উপাদানের গুণমানে যদিও অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে তবু এদের বৃহদাংশ বাজারে সহজলভ্য এবং কোনো একটি বিষয়ে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের সুযোগ বিস্তৃত করতে সুবিন্যস্ত পদ্ধতিতে এইসব উপাদান ব্যবহার করা যেতে পারে। এ সমস্ত উপাদানের সঙ্গে শিক্ষকদের পরিচিত করানোর জন্য এবং এদের কার্যকর নির্বাচন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মাপকাঠি দেবার জন্য শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের শিক্ষণ – কর্মসূচী প্রয়োজন।

### শিশুরা পড়তে শেখে না কেন?

* শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের বিবিধ বিষয় শিক্ষাদানে মৌলিক যোগ্যতার (শিক্ষার্থীরা কোন অবস্থায় আছে তা বোঝা, ব্যাখ্যা করা, যথাযথ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, পড়তে শেখার প্রক্রিয়া যেমন অক্ষর পরিচিতি এবং বর্ণ-ধ্বনির মিলমিশ থেকে সমগ্র অক্ষর-পরিচিতি এবং পাঠের অর্থ-নিরূপণ জাতীয় উপরিস্তরের প্রক্রিয়া অবধি প্রসারিত, সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বোধ) অভাব রয়েছে। শ্রেণী-পরিচালন দক্ষতার অভাবও তাঁদের মধ্যে প্রায়শই লক্ষিত হয়। কল্পনাপ্রসূত তথ্য এবং স্পষ্ট উচ্চারণের প্রতি নজর দেওয়ার পরিবর্তে, তাঁদের প্রবণতা হল কেবলই ত্রুটির বা কঠিন পাঠের প্রতি দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করা।

* প্রাক্-চাকুরি প্রশিক্ষণে পঠন সংক্রান্ত শিক্ষাদানের বিষয়ে শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সুযোগ থাকে না। আর চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণেও বিষয়টি উল্লেখ করা হয় না।

* পাঠ্যপুস্তকগুলি তৎকালীন ভিত্তিতে লিখিত হয়; সেখানে একটি পঠন-নির্দেশিকার সহজাত কর্মনীতি অনুসরণ করা হয় না।

* অসুবিধাজনক প্রেক্ষাপট থেকে আসা শিশুরা, বিশেষত প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা অনুভবই করতে পারে না যে, শিক্ষক/ শিক্ষিকাগণ তাদের উপস্থিতি অনুমোদন করেছেন, ফলে তারা পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে আপন চিন্তনকে যুক্ত করতে পারে না।

### পঠনের সূচনাপর্বে একটি কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গি

* শ্রেণীকক্ষে মুদ্রণ-সমৃদ্ধ পরিবেশ, চিহ্ন, তালিকা, কর্ম-পরিচালনা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদির প্রদর্শন যেগুলি শিক্ষাদানের অক্ষর-ধ্বনি সংক্রান্ত লিখিত তথ্যের সঙ্গে লিখিত সংকেতের 'চিত্রাঙ্কিত' স্বীকৃতির প্রচার ঘটায়— এই সমস্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

* কল্পনাসঞ্জাত পাঠের প্রয়োজন যেগুলি একজন যোগ্যতম শিক্ষক/ শিক্ষিকা যথাযথ শারীরিক মুদ্রা এবং নাটকীয় ভঙ্গিমা ইত্যাদির সাহায্যে পড়ে শোনাবেন।

* শিশুদের বর্ণিত অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করা এবং তারপর সেই লিখিত বিবরণ পাঠ।

* অতিরিক্ত উপকরণ পাঠ করা : কাহিনী, কবিতা ইত্যাদি

* প্রথম প্রজন্মের বিদ্যালয় পড়ুয়াদের অবশ্যই নিজস্ব পাঠ্যরচনা নির্মাণ করার সুযোগ দেওয়া উচিত এবং তাদের স্ব-নির্বাচিত রচনা শ্রেণীকক্ষে গ্রহণ করা উচিত।

লেখনের গুরুত্বের যথাযথ স্বীকৃতি প্রয়োজন। তবে এর উদ্ভাবনী ব্যবহারের ক্ষেত্র পাঠ্যক্রমে থাকা প্রয়োজন। শিশুরা যাতে সঠিক ভাবে লিখতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষক/ শিক্ষিকারা বিশেষ নজর দেন। লেখনের মাধ্যমে তারা আপন চিন্তা এবং অনুভব প্রকাশ করতে পারছে কিনা সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। উচ্চারণের ক্ষেত্রে অপরিণত অবস্থায় আরোপিত শৃঙ্খলায় যেমন শিশুরা আপন বাগধারায় অবাধে কথা-বলার প্রক্রিয়া আড়ষ্ট হয়ে যায়, ঠিক তেমনি, উদাহরণ-স্বরূপ যান্ত্রিকভাবে সঠিক পদ্ধতিতে লেখনের দাবি একজন মানুষের আপন ভাবনা লিখনের মাধ্যমে জানানো বা ব্যক্ত করার আগ্রহ ব্যাহত হয়। শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের মনে শৈল্পিক অভিব্যক্তির সঙ্গে একই মর্যাদায় লেখন স্থাপিত করার শিক্ষা দেওয়া এবং তাঁদের এ বিষয়ে প্রত্যয়ী করে তোলা প্রয়োজন। একে তাঁরা যেন শুধুমাত্র অফিসে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হিসাবে না দেখেন। বুনিয়াদী বছরগুলিতে কথন, শ্রবণ এবং পঠনের সঙ্গে একত্রে গভীর অনুভবের ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবে লেখনের ক্ষমতা বিকশিত করা উচিত। বিদ্যালজীবনের মধ্য এবং উচ্চ স্তরে, দক্ষতা-বিকাশী শিক্ষণচর্চা হিসাবে প্রতিবেদন রচনায় বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ব্ল্যাকবোর্ড, পাঠ্যপুস্তক ও সহায়কগ্রন্থ থেকে অন্ধের মতো যান্ত্রিকভাবে নকল করার অভ্যাসকে নিরুৎসাহিত করে এই প্রতিবেদন রচনার মাধ্যমে ভাষাশিক্ষায় অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যায়। চিঠি এবং নিবন্ধ রচনার মতো রুটিন কাজের অভ্যাস ভঙ্গিও প্রয়োজন যাতে শিক্ষাক্ষেত্রে কল্পনা এবং মৌলিকতা আরো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের সুযোগ পায়।

**বিদ্যালয়ের গণিত শিক্ষার কয়েকটি সমস্যা**

১) গণিত সম্বন্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশুর মনে ভয় আর অসাফল্যের অনুভব রয়েছে। অতএব, একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েই তারা হাল ছেড়ে দেয় এবং আরো গভীর গাণিতিক শিক্ষা মোটেই নেয় না।

২) গণিতের পাঠ্যক্রমটি যে কেবল এই সব অংশগ্রহণ না করা সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছেই হতাশাজনক তা নয়, প্রতিভাধর সংখ্যালঘিষ্টে এর মধ্যে কোনো চ্যালেঞ্জের সন্ধান না পেয়ে একইরকম হতাশ হয়ে পড়ে।

৩) সমস্যা অনুশীলনী এবং মাননির্ণয় পদ্ধতি বড় যান্ত্রিক এবং পৌনঃপুনিকতায় দুষ্ট এবং এতে গণনার বিষয়টিতে বড় বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গণিতের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি যেমন স্থান বা পরিসর বিষয়ক ভাবনা সেটি এই পাঠক্রমে যথেষ্ট উন্নত নয়।

৪) শিক্ষকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, প্রস্তুতি এবং সহায়তার অভাব।

## ৩.২. গণিত

গণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুদের আঙ্কিক প্রক্রিয়া-বিষয়ক দক্ষতার বিকাশ। বিদ্যালয়ের গণিতের লক্ষ্য সংকীর্ণ। এর উদ্দেশ্য কিছু ব্যবহারিক কাজকর্ম বিশেষত গণনের সংখ্যা, সংখ্যার কাজ, পরিমাপ, দশমিক এবং শতকরা এই সব বিষয়ে শিশুদের সক্ষম করে তোলা। আর উচ্চতর লক্ষ্যটি হল শিশুর জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করা যাতে সে গাণিতিক যুক্তি বিন্যাসে চিন্তা করতে পারে, অনুমানের পথ ধরে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারে এবং বিমূর্ত বিষয়গুলিকে আয়ত্তে আনতে পারে। কাজ করার পদ্ধতি, সমস্যার সূত্রায়ন ও সমাধানের সক্ষমতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি- এসবও এই উচ্চতর লক্ষ্যের অর্ন্তগত।

অতএব এমন একটি পাঠক্রমের প্রয়োজন যেটি একাধারে উচ্চাকাঙ্খী, সুসংগত এবং যাতে গণিতের প্রয়োজনীয় গাণিতিক সূত্রসমূহের পাঠও নেওয়া যায়। এই অর্থে এটি উচ্চাকাঙ্খী যে, গণিত শিক্ষার সংকীর্ণতর লক্ষ্যটির চেয়ে বরং উপরে উল্লেখিত উচ্চতর লক্ষ্যপূরণেই তার অধিক আগ্রহ। একে সুসংগত হতেই হবে— একথার অর্থ হল, পাঠক্রমের বিভিন্ন অংশে (পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি) খণ্ডে খণ্ডে অর্জিত বিবিধ পদ্ধতি এবং দক্ষতার সাহায্যে অন্যান্য এমন সমস্যার মুখোমুখি হবার দক্ষতা অর্জন করতে হবে, যেগুলি হয়তো উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অন্যত্র যেমন বিজ্ঞান বা সমাজবিদ্যার পাঠে ছড়িয়ে রয়েছে। এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন ছাত্ররাও অনুভব করে আর শিক্ষকরা ও ছাত্রদের দল উভয়েই এই সব সমস্যাকে এতই গুরুত্ব দেয় যে তাদের সমাধানের জন্য সময় ও শক্তি দুটোই ব্যয় করে থাকে। সেই অর্থেই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণিতের পাঠক্রমে দুটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়। প্রতিটি ছাত্রের মনে এই ভাব অধিকার করে গণিতের শিক্ষা কি করতে পারে এবং কেমন করে এটি ছাত্রদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে শক্তিশালী করতে পারে?

মাধ্যমিক স্তরে গণিত যেহেতু একটি আবশ্যিক বিষয়, সেকারণে উৎকৃষ্ট গণিত শিক্ষার অধিকার প্রতিটি শিশুর রয়েছে। শিক্ষাকে সার্বজনীন করার প্রসঙ্গে প্রথম যে প্রশ্ন মনে আসে তা হল, আট বছরের বিদ্যালয় জীবন যেখানে শিশুকে কেবলমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পঠনের উপযুক্ত করে তোলার চেয়ে বরং তাকে কাজের উপযোগী করে তোলা হয় সেখানে গণিত তাদের অতিরিক্ত কী-ই-বা করতে পারে, মাধ্যমিক গণিতে যে দক্ষতা শেখানো হয় তা অত্যন্ত দরকারী। উপরে যে 'উচ্চতর লক্ষ্যের' কথা বলা হয়েছে তারই সন্ধানে পাঠক্রম এমনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে যাতে শিশুরা বিদ্যালয়ে যে সময়টা কাটায় তাকে আরো ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়; তাদের সমস্যা সমাধানের এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতা গড়ে ওঠে; জীবনের বিচিত্র সব সমস্যা মেটানোর জন্য শিশুদের আরো ভালভাবে প্রস্তুত করা যায়। 'দীর্ঘ এবং সংকীর্ণ' পাঠক্রমের পরিবর্তে, এমন এক পাঠক্রম হবে যেখানে অনেক বেশী বিষয় থাকবে, অথচ যেটি মাটির খুব কাছাকাছি এবং যার ভিত্তি হবে আরও ব্যাপ্ত, ফলে সেটি আরো ভালভাবে বিভিন্ন পড়ুয়ার প্রয়োজন মেটাতে পারবে। (যেখানে একটি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন পরবর্তীর প্রাক শর্ত) একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকে আরো বেশি বিষয়সূচী পড়ানো শুরু করে আরো বিস্তৃত বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের স্বপক্ষে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা যায়।
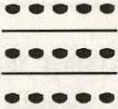
### ৩.২.১ বিদ্যালয় গণিতের জন্য ভবিষ্যত চিত্র

- শিশুরা যেন গণিতে ভয় না পেয়ে একে উপভোগ করে।
- গুরুত্বপূর্ণ গণিতের অংশগুলো শিশুরা শিখবে: গণিতে কেবল সূত্র আর যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নেই, তার চেয়ে ঢের বেশী কিছু রয়েছে।
- শিশুদের মনে গণিত এমন এক বিষয় হয়ে উঠবে যার সম্পর্কে কথা বলা যায়, ভাব বিনিময় করা যায় যার সাহায্যে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ আর আলোচনা করা যায় এবং একসঙ্গে কাজ করা যায়।
- গণিতের মৌলিক গঠনটি শিশুরা বুঝবে: পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি-এই চারটি হল বিদ্যালয় গণিতের মূল বিষয়বস্তুর এলাকা। সব কটিতেই বিমূর্ততা, রূপ কাঠামো এবং সাধারণীকরণের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতির প্রকরণ রয়েছে। প্রত্যেকেই গণিত শিখতে পারে এমন এক দৃঢ় প্রত্যয়ে শিক্ষকরা
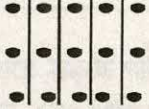
শ্রেণীকক্ষে প্রতিটি শিশুকে পাঠে যুক্ত করবেন।

সমস্যা সমাধানের অনেক সাধারণ কৌশল বিদ্যালয়ের বিভিন্নস্তরে পর্যায়ক্রমে শেখানো যায়, যেমন, বিমূর্ততা, রাশিগণন, অনুরূপ বা সদৃশ উদাহরণ, উদাহরণ বিশ্লেষণ, সরলতর পরিস্থিতিতে রূপান্তরণ এমনকি অনুমান এবং যাচাই করা, সবকটিই নানান সমস্যার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। শিশুরা যখন বিচিত্র ভঙ্গিমায় দেখতে শেখে (সময়ের সঙ্গে সঙ্গে), তাদের কাজের হাতিয়ার আরো সমৃদ্ধ হয় এবং কখন কীভাবে দেখা সবচেয়ে ভাল, সেটাও তারা শিখে যায়। শিশুদের কাছে গণিতকে সঠিক বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিপন্ন না করে নানান অনুসন্ধানে অনেকসময়, যাকে বলে হাতুড়ে উপায়ে সমস্যা সমাধানের পদ্ধতির সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটাতে হবে। পরিমাণের ধারণা এবং সমাধানের অনুমান এ দুটিও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দক্ষতা। এক জন কৃষক যখন বিশেষ ফসলের সম্ভাব্য পরিমান নির্ধারণ করেন তখন প্রয়োজনীয়তা অনুকূল পরিস্থিতির সর্বোচ্চ সম্ভাবনা নিরূপণের যথেষ্ট দক্ষতা ব্যবহৃত হয়।

সুস্পষ্ট ধারণার দৃশ্যরূপ এবং উপস্থাপনা এই দুটির দক্ষতা বিকাশে গণিত সাহায্য করতে পারে। পরিমাণ, আকার এবং রূপের ব্যবহারে যেকোন পরিস্থিতির আদর্শ মূর্তরূপ নির্মাণে গণিতকে সবচেয়ে ভালো কাজে লাগানো যায়। গাণিতিক ধারণাকে বহুবিধ উপায়ে উপস্থাপিত করা যায়। এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে উপস্থাপনাগুলি বিচিত্র উদ্দেশ্যসাধনে সহায়ক হয়। এ সবই গণিতের ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত। যেমন, কোন অপেক্ষককে বীজগাণিতিক আকারে কিংবা লেখ-চিত্র রূপে উপস্থাপিত করা যায়। আবার ঐ লেখচিত্র উপস্থাপিত $p/q$ একটি সমগ্র বস্তুর ভগ্নাংশকে চিহ্নিত করে, কিন্তু সেই সঙ্গে এটি দুটি সংখ্যা $p$ এবং $q$ এর ভাগফলও নির্দেশ করে। ভগ্নাংশের পাটীগাণিতিক মাননির্নয়ের চেয়ে ভগ্নাংশকে এইভাবে চিনতে পারার গুরুত্ব মোটেই কম নয়, বরং বেশিই হতে পারে। পাঠ্যসূচীর অন্যান্য বিষয় এবং গণিতের মধ্যে সংযোগ অত্যন্ত প্রয়োজন। শিশুরা যখন লেখচিত্র আঁকতে শিখবে তখন একইসঙ্গে বিজ্ঞানের বিশেষত ভূ-বিজ্ঞানের নানা অপেক্ষিক (functional) সম্পর্ক সেই লেখচিত্রের কাঠামোয় চিন্তনের কাজে তাদের উৎসাহিত করতে হবে। গণিত যে বিজ্ঞানের একটি কার্যকরী ব্যবহারিক হাতিয়ার এই সত্যটি আমাদের শিশুদের মনের গভীরে সম্প্রসারিত ভাবনায় স্থান পাওয়া প্রয়োজন।

আবার, গণিতের সুসংবদ্ধ যৌক্তিকতার গুরুত্ব কখনই বাড়তি মর্যাদা পেতে পারে না। কেননা নান্দনিকতা এবং চমৎকারিত্বের যে ধারণা গণিতে অত্যন্ত প্রিয়তর, সেটি এই সমস্ত পদ্ধতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে। প্রমাণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অবরোহী (কারণ থেকে কার্য) প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে, শিশুদের একথাও শিখতে হবে যে, কখন ছবি এবং গঠনকাঠামো নিজেই একটা প্রমাণ হয়ে ওঠে। প্রমাণ হল একটা প্রক্রিয়া যা সংশয়ী প্রতিকূলতায় আস্থাশীল করে; বিদ্যালয় গণিত যুক্তিবিন্যাসের সুসংবদ্ধ পদ্ধতি হিসাবেই প্রমাণের কাজে শিশুদের উৎসাহিত করবে। আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যুক্তিতর্ককে বিকশিত করা, বিভিন্ন তর্কে নিরূপণ, আনুমানিক ধারণা তৈরি করে তার অনুসন্ধান এবং এই কথাটা বোঝানো যে যুক্তি বিন্যাসেরও বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।

**সমস্যার উপস্থাপনা**

* ২৩৫ + ৩৬৭ = ৬০২ হলে
  ২৩৪ + ৩৬৯ কত হবে?
  উত্তরটি কি করে নির্ণয় করলে?
* ৫৩৮৪ সংখ্যাটি যে কোন একটি সংখ্যা চিহ্ন (digit) বদলে দাও। সংখ্যাটি বড় হল না ছোট হয়ে গেল? সংখ্যাটি কতটা বড় বা কতটা ছোট হল?

প্রকাশে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, এবং সূত্রায়নের কাঠিন্য ও ভাষার স্বচ্ছ ব্যবহারে সমৃদ্ধে গাণিতিক যোগাযোগ পদ্ধতি হল গাণিতিক আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। গণিতে ইচ্ছাকৃত, সচেতন এবং শিল্পিত ভঙ্গিতে দুর্বোধ্য, পারি ভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়। যথাযথ চিহ্নলিপিটি কী সে বিষয়ে গণিতজ্ঞরা আলোচনায় বসেন। কেননা একটি ভালো চিহ্নলিপিকে রেখে দেওয়া হয় এবং সেটিকে চিন্তনের সহায়ক বলে ভাবা হয়। শিশুরা যখন বড় হয়ে উঠবে তখন প্রকাশ ভঙ্গিমার এই সব চিরাচরিত প্রথা এবং ব্যবহারের গুরুত্ব যাতে তাদের কাছেও প্রশংসিত হয় সেই ভাবেই তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। যেমন এর অর্থ হল, সমীকরণ সমাধানের মত সমীকরণ গঠনের কাজ একই রকম মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য।

এরকম অনেক দক্ষতা এবং পদ্ধতি আলোচনার সময় আমরা দৃষ্টিভঙ্গী এবং পদ্ধতির বহুমুখীনতার উল্লেখ করেছি। কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে শেখা যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের প্রক্রিয়া ব্যবহার করার অত্যাচারী শাসন থেকে বিদ্যালয়গুলিকে মুক্ত করতে এই সবের ভূমিকা চূড়ান্ত।

### ৩.২.২ পাঠক্রম

প্রাথমিকের পূর্ববর্তী স্তরে শিক্ষামূলক ভাষাবিনিময়ের পরিবর্তে বরং খেলার মাধ্যমে সবকিছু শেখাতে হবে। যন্ত্রের মতো সংখ্যাক্রম মুখস্থ না করিয়ে ছোট ছোট দলের পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যার সার্বিক রূপ এবং গণনা, গণনা এবং পরিমাণ এই সমস্ত নিয়েই শিশুদের শেখানো এবং বোঝানো প্রয়োজন। এক একবার একটি মাত্রায় সাধারণ তুলনা ও শ্রেণীবিভাজন, আকার ও সাযুজ্যকেই চিহ্নিত করাএই সব দক্ষতা অর্জনে এটি হল যথার্থ সময়। নিজের আবেগ এবং চিন্তনকে স্বাধীন ভাবে ভাষার যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রকাশ করার জন্য শিশুদের উৎসাহিত করতে হবে। পূর্বাহ্নে নির্ধারিত পদ্ধতির পরিবর্তে এই পর্বে এবং আরো পরবর্তী স্তরে এইভাবে শিশুকে শেখানো অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক স্তরে গণিতের প্রতি ইতিবাচক এবং পছন্দের মনোভাব বিকশিত করা গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যায়ে জ্ঞানার্জনের যে দক্ষতা এবং ধারণার অধিকারী হয় তার চেয়ে এই বিকাশের কাজটি বেশি না হোক আদৌ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে গণিত আর প্রতিদিনের ভাবনার মধ্যে সম্পর্কস্থাপনে নানারকম গণিতের খেলা, ধাঁধাঁ ও গল্প খুবই সহায়ক হয়। আরেকটা বিষয় মনে রাখা জরুরী যে গণিত কেবলমাত্র পাটীগণিত নয়। সংখ্যা এবং সংখ্যার কারিগরী ছাড়াও আকার, পরিসর বা স্পেসের ধারণা, নানান নকশা, পরিমাণ এবং তথ্যকে কাজে লাগানো এই সব বিষয়কেও যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। পাঠক্রমে সুস্পষ্টভাবে সংখ্যার শ্রেণী এবং শ্রেণী ব্যবধান সংক্রান্ত এমন অংশ অর্ন্তভুক্ত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা বোধ বা ধারণাশক্তি অর্জনের সময় একেবারে মূর্ত থেকে বিমূর্তে পৌঁছুতে পারে। গণনের দক্ষতা অর্জন ছাড়াও নির্দিষ্ট ছক বা নক্শাকে সনাক্ত করা, তাদের প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করার বিষয়েও বিশেষ জোর দিতে হবে। এর সঙ্গে থাকবে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রায়িকতা এবং আনুমানিক হিসাব, ভাববিনিময় এবং যুক্তিবিস্তারের ক্ষেত্রে যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষমতা এবং ভাষিক দক্ষতার বিকাশ।

প্রাথমিকের উচ্চস্তরে, শিক্ষার্থীরা গণিতের শক্তির প্রথম আস্বাদ লাভ করবে। শক্তিশালী বিমূর্তধারণার সঠিক প্রয়োগেই একাজ করতে হবে। বিমূর্ততার শক্তি তাদের আগের জানা পাঠ এবং অভিজ্ঞতাকে সঙ্কুচিত করতে পারে। এর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে মূল ধারণা এবং দক্ষতা তারা অর্জন করতে শিখেছিল, সেগুলিকে সংহত করতে পুনরায় ফিরে দেখতে তারা সক্ষম হবে। সার্বিক সাক্ষরতা অর্জনের দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে একাজ অত্যন্ত আবশ্যিক। বীজগণিতের লিপিমালার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় ঘটাতে হবে। সেই সঙ্গে তারা সমস্যা সমাধানে এর ব্যবহার, সমস্যার সাধারণীকরণ, পরিসর ও আকারের সুসংবদ্ধ পাঠ শিখতে পারবে এবং তাদের পরিমাপ সংক্রান্ত ধারণা সুসংহত হবে। তথ্যকে কাজে লাগানো, উপস্থাপনা এবং তাদের বিশদে ব্যাখ্যা এ সবই অংশত সাধারণভাবে তথ্য নিয়ে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা গড়ে তোলে। এ হল এক আবশ্যিক আজীবন-দক্ষতা। এই পর্বের ছাত্রছাত্রীরা যা কিছু শেখে, সবই তাদের পরিচয় ও পরিসরসংক্রান্ত যৌক্তিকতা এবং মূর্ত-বিমূর্তকে দৃশ্যমান করার যে দক্ষতা, সেগুলিকে সমৃদ্ধ করার জন্য নানান সুযোগও সৃষ্টি করে।

মাধ্যমিক পর্বে, শিক্ষার্থীরা গণিতের কাঠামোকে একটি নিয়মবদ্ধ চর্চার বিষয় হিসাবে দেখতে শুরু করে। গাণিতিক যোগাযোগের বিষয়গুলির সঙ্গে সে পরিচিত হয়ে ওঠে; সযত্নে সঞ্জায়িত পরিভাষা, তাদের উপস্থাপনার সংকেত, সারাংশে বর্ণিত প্রস্তাবনাসমূহ এবং প্রস্তাবনা সমর্থনে লিখিত প্রমাণ। বিশেষত জ্যামিতির ক্ষেত্রেই এই ধারণাগুলি বিকশিত হয়। বীজগণিতের সাহায্যে সমস্যা সমাধানের সুবিধা তারা বুঝতে পারে। এই বোধ যে কেবল গণিতের সমস্যায় প্রয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়, গণিতের অভ্যন্তরে প্রমাণের ও সঠিক বিচারের যে বিশাল ক্ষেত্র রয়েছে সেখানেও বিচরণের সুযোগ তারা পেয়ে যায়। এই স্তরে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জনের সময় সে যা যা শিখেছে সেরকম অনেক ধারণা ও দক্ষতাকে সে এখন সংহত করতে পারে। গাণিতিক আদর্শনির্মাণ, তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা যা কিছু এই পর্বে শেখানো হয়, সবকিছুই একটি উচ্চস্তরের গাণিতিক সাক্ষরতায় সংহত হতে পারে। যথাযথ পদ্ধতি প্রকরণ করা হয় যার মধ্যে গণিতের গবেষণাগার ও কম্পিউটারে কৃত নির্দিষ্ট আদর্শ ছাঁচ রয়েছে, এসবের ব্যবহারে উৎসাহিত করতে পারা যায়।

এই পর্যায়ে নকশা এবং যোগসূত্রের একক এবং দলগত সন্ধান, চিন্তনের দৃশ্যরূপ কল্পনা ও সাধারণীকরণ, অনুমানের ভিত্তিতে ধারণা গড়ে তোলা আর তার প্রমাণ সবই গুরুত্বপূর্ণ। যথাযথ কাজের যন্ত্র যেমন কম্পিউটার বা বৈদ্যুতিন-মগজ এবং সুসংহত আদর্শ ও অন্যান্য সহায়তায় এই সমস্ত কাজে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা যাবে।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্বে গণিত পাঠক্রমের উদ্দেশ্য হল, গাণিতিক প্রয়োগের বিস্তৃত বিচিত্রতার বিষয়ে ছাত্রদের মনে প্রশংসা জাগিয়ে তোলা এবং প্রয়োগে এ জাতীয় সক্ষমতা অর্জনের জন্য যেসব মৌলিক কাজের যন্ত্র প্রয়োজন সেগুলির সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটানো। এই স্তরেই শিক্ষার ক্ষেত্রে গভীরতা বনাম বিস্তৃতির যে লড়াই প্রায়শই চোখে পড়ে, তারই নিরিখে পাঠক্রমের বিষয়গুলির সযত্ন নির্বাচনের প্রয়োজন। নির্দিষ্ট চর্চার বিষয় হিসাবে গণিতের দ্রুত বিস্ফোরণ, এবং তার প্রয়োগের সীমা এর আয়ত্তাধীন এলাকার বৃদ্ধিকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। যে বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, গাণিতিক বিচারে তাদের যা গুরুত্ব তারই নিরিখে পাঠক্রমের এই বৃদ্ধি নির্ধারিত হবে। যে প্রসঙ্গগুলি অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত স্বভাবতই সেগুলিকে গণিতের পাঠক্রমের বাইরে রাখতে হবে। বিষয় বিচার ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি উদ্দেশ্য থাকবে— গাণিতিক অন্তর্দৃষ্টি ও ধারণার মধ্যে যোগাযোগ । এটি স্বভাবতই শিক্ষার্থীদের আগ্রহ এবং কৌতূহল জাগাবে।

### ৩.২.৩ কম্পিউটার বিজ্ঞান

আধুনিক সমাজ গঠনে কম্পিউটার -প্রযুক্তির প্রবল কার্যকারিতা মানুষের কাছে প্রায় আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। সমাজ ও মানুষের আরো শ্রীবৃদ্ধির জন্য এই প্রযুক্তি সবচেয়ে কার্যকর উপায়ে ব্যবহার করা যাবে। অতএব বিদ্যালয় পাঠক্রমে জ্ঞানের এই নতুন সাম্রাজ্যটির জন্য স্থান সঙ্কুলানের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই আরো বেশি অনুভূত হচ্ছে।

এখানে তথ্য প্রযুক্তির (IT) পাঠক্রমের সঙ্গে কম্পিউটার বিজ্ঞানের (CS) সুস্পষ্ট পার্থক্য বুঝে নিতে হবে। তথ্য ও কম্পিউটারের বয়ঃক্রম সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির প্রয়োগ এবং ব্যবহার প্রথমটির অন্তর্ভুক্ত। আর দ্বিতীয়টিতে রয়েছে কীভাবে ঐ যন্ত্রপাতিগুলি নির্মিত এবং সজ্জিত হয় সেই সম্পর্কিত জ্ঞান। অবশ্য বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রমে উভয়েরই নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে।

অনেক দেশই তাদের বিদ্যালয় স্তরে CS এবং / কিংবা IT পাঠক্রম চালু করায় ভারতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে সে বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আমাদের প্রথম ভাবনার বিষয় হল কম্পিউটার বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র সম্পদের সংখ্যাল্পতা। হাতেকলমে কাজ করার মত যন্ত্রের ব্যবস্থা ছাড়া কম্পিউটার বিজ্ঞানের শিক্ষা অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। আর প্রতিটি শিশুকে কম্পিউটার ব্যবহার ও সংযোগের সুবিধাদান একটি ভয়ঙ্কর প্রাযুক্তিক এবং অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ। তবু যেভাবেই হোক না কেন, কম্পিউটার প্রযুক্তির এই ব্যাপক প্রভাবের পরিস্থিতিতে ভারতের গ্রাম ও শহরের বিদ্যালয়গুলির উপযোগী হার্ডওয়ার, সফটওয়ার এবং যোগাযোগ-প্রযুক্তির প্রসঙ্গে বাস্তবোচিত এবং উদ্ভাবনী বিকল্পের সন্ধান করে পরিকাঠামোগত এই চ্যালেঞ্জকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে চিহ্নিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

এক্ষেত্রে, কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং তথ্য প্রযুক্তিতে একটি বোধগম্য ও সুসঙ্গত পাঠক্রমের আদর্শ নকশা গড়ে তোলার বিষয়েও বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন যাতে শিক্ষাবিদ, প্রশাসক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এ প্রসঙ্গে পারস্পরিক আলোচনা শুরু করার ভিত্তি হিসাবে এটি কাজে লাগে। কয়েকটি CS এবং IT পাঠক্রমের মধ্যে কিছু সাধারণ মৌলিক উপাদান রয়েছে এবং একথা ভারতীয় বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এর মধ্যে রয়েছে পুনরাবৃত্ত প্রক্রিয়ার ধারণা ও রাশিগণন, গণনার থেকে উদ্ভূত কর্মসূচী সমাধানের সাধারণ সমস্যা, কম্পিউটার ব্যবহারের সম্ভাবনাসমূহ, আধুনিক সমাজে কম্পিউটারের অধিকৃত স্থান এবং এর ফলে উদ্ভূত সামাজিক প্রসঙ্গ সমূহ।

## ৩.৩ বিজ্ঞান

অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ প্রাকৃতিক এবং জৈবিক পরিবেশকে সযত্নে পর্যবেক্ষণ করেছে; অর্থপূর্ণ ধাঁচ এবং সম্পর্ক অনুসন্ধানে মগ্ন থেকেছে; প্রকৃতির সঙ্গে মোকাবিলায় তৈরি করেছে নতুন নতুন হাতিয়ার; ব্যবহারও করেছে তাদের এবং সর্বোপরি পৃথিবীকে সঠিক অনুধাবনের জন্য তাত্ত্বিক আদর্শসমূহ গড়ে তুলেছে—এ সমস্তই হল প্রকৃতি বিষয়ে মানুষের বিস্মিত এবং সশ্রদ্ধ প্রতিক্রিয়া। এই মানবিক উদ্যোগই আজ আধুনিক বিজ্ঞানে এসে পৌঁছেছে। বৃহৎ অর্থে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে অনেকগুলি আন্তঃসংযুক্ত ধাপ আছে: পর্যবেক্ষণ, অভ্যস্ত নিয়ম এবং গড়নের অনুসন্ধান, উপাত্ত নির্মাণ, গুণাত্মক বা গাণিতিক আদর্শ উদ্ভাবন, তাদের ফলাফল নিরূপণ, পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষাসমূহের মাধ্যমে তত্ত্বের পরখ অথবা মিথ্যা উপস্থাপন এবং এইভাবে প্রাকৃতিক জগৎ পরিচালনকারী নীতি, তত্ত্ব এবং সূত্রসমূহে উপনীত হওয়া। বিজ্ঞানের সূত্রাবলী কখনোই চিরন্তন সত্য হিসাবে পরিলক্ষিত হয় না। এমনকি বিজ্ঞানের সবচেয়ে অধিক প্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্বজনীন সূত্রাবলীও সর্বদা সাময়িক সত্য হিসাবে পরিগণিত হয় যেগুলি নতুন পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের সাপেক্ষে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন যোগ্য।

বিজ্ঞান হল গতিময়; প্রসারণশীল জ্ঞানের ভাণ্ডার। একটি প্রগতিশীল, অগ্রগামী দৃষ্টিসম সমাজে, বিজ্ঞান সাধারণ মানুষকে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের দুষ্টচক্র থেকে মুক্তিলাভে সাহায্য করে। সত্য অর্থেই পরিত্রাতার ভূমিকা পালন করতে পারে। বিজ্ঞান এবং কারিগরি উন্নতি কৃষি এবং শিল্পের মতো চিরায়ত কর্মক্ষেত্রেও ব্যাপক রূপান্তর ঘটাতে পারে এবং সামগ্রিকভাবে একটি নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে। বর্তমানে সাধারণ মানুষ এমন এক দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে যেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হল নমনীয়তা, উদ্ভাবনী শক্তি এবং সৃষ্টিশীলতা। বিজ্ঞান শিক্ষার রূপদানকালে এইসমস্ত বিবিধ অনুজ্ঞা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

**প্রশ্ন জিজ্ঞাসা**

'বাতাস সর্বত্র রয়েছে'— এ কথা প্রতিটি শিশুই শেখে। কিন্তু শিক্ষার্থীরা শিখবে যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অনেক ধরণের গ্যাস আছে কিংবা চাঁদে বাতাসের অস্তিত্বই নেই। ওদের যে কিছুটা বিজ্ঞানের ধারণা রয়েছে তাতে আমাদের সুখী হবার কথা। কিন্তু এই কথোপকথনের বিষয় বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর জন্য।

শিক্ষক : এই গেলাসে কি বাতাস আছে?

ছাত্রদল : (সমস্বরে) আছে!

'বাতাস সর্বত্র আছে' এই গতানুগতিক বিবৃতিতে দেখা যাচ্ছে এই শিক্ষিকা সন্তুষ্ট হন। তিনি একটি সহজ পরিস্থিতিতে ছেলেমেয়েদের নিজস্ব ভাবনা প্রয়োগ করতে বললেন এবং অপ্রত্যাশিতভাবে দেখলেন যে, তারা মনের মধ্যে কিছু 'বিকল্প ধারণা'ও গড়ে তুলেছে।

শিক্ষক : এখন আমি গেলাসটিকে উল্টে দিলাম। এখনো কি এর মধ্যে বাতাস আছে?

কয়েকজন ছাত্র ব লল 'হ্যাঁ', অন্যেরা বলল 'না', তবুও বেশ কয়েকজন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারল না।

প্রথম ছাত্র/ছাত্রী: বাতাস গ্লাস থেকে তো বেরিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় : গ্লাসে মোটেই বাতাস নেই।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিক্ষক একটা শূন্য গ্লাসের মধ্যে একটা জ্বলন্ত বাতি রেখেছিলেন এবং সেটি নিভে গিয়েছিল।

ছাত্রছাত্রীরা একটা সক্রিয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল । দু বছর পরে যা তাদের বিশদ স্মৃতিতে রয়ে গেছে । কিন্তু অল্প কয়েকজন অন্তত তার থেকে একটা ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল।

কিছুটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের আরো কিছু প্রশ্ন করতে লাগলেন। এই বন্ধ কাপবোর্ডের মধ্যে কি বাতাস আছে? মাটির ভেতরে? জলে? আমাদের শরীরের ভেতরে? আমাদের হাড়ের মধ্যে? প্রতিটি প্রশ্ন নতুন ভাবনার জন্ম দেবে এবং কিছু ভুল বোঝাবুঝি পরিষ্কার করতে একটা সুযোগ সামনে এনে দেবে। এই পাঠ আবার গোটা শ্রেণীর সামনে একটা বার্তা : বিনা বিচারে কোন বিবৃতি গ্রহণ কোরো না। প্রশ্ন করো। সব প্রশ্নের উত্তর হয়ত পাবে না কিন্তু তুমি আরো বেশি শিখতে পারবে।

বিজ্ঞানের সঠিক শিক্ষা শিশু, জীবন এবং বিজ্ঞান— সকলের কাছেই সত্য হয়ে ওঠে। এই সরল পর্যবেক্ষণই একটি বিজ্ঞান পাঠক্রমের অকাট্য-সিদ্ধতার প্রশ্নে নিম্নলিখিত মৌলিক গুণাবলী আমাদের সামনে উপস্থিত করে :

১) জ্ঞানের সিদ্ধতার জন্য সেই সব বিষয়বস্তু, প্রক্রিয়া, ভাষা এবং বিবিধ বিদ্যা অভ্যাস পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন, যেগুলি দীর্ঘকাল যাবৎ যথাযথ হিসাবে গণ্য এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন ক্ষমতার আয়ত্বাধীন।

২) বিষয়গত সিদ্ধতার জন্য পাঠক্রমকে অবশ্যই সঠিক তাৎপর্যময় এবং নির্ভুল বৈজ্ঞানিক-বিষয় সংবাহী হতে হবে। শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন ক্ষমতার যে স্তর তার উপযোগী করার প্রয়োজনেও বিষয়গুলিকে কখনোই এমনভাবে সরলীকৃত করা যাবে না যাতে সেগুলি মৌলিকস্তরে ত্রুটিপূর্ণ এবং/বা অর্থহীনরূপে প্রতিভাত হয়।

**কোন জীববিদ্যা শিক্ষার্থীরা শেখে!**

"এইসব শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানই বোঝে না... ওরা একেবারে বঞ্চিত, অজ্ঞাত পরিবেশ থেকে আসে!" প্রায়শই গ্রামীণ কিংবা আদিবাসী পরিবেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে এই ধরণের মতামত শোনা যায়। বেশ তাহলে এইসব ছেলেমেয়েরা প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতা থেকে কী শেখে সেটি বিচার করা যাক :

জনাবাঈ সহ্যাদ্রি পর্বতের একটি ছোট গ্রামে বাস করে। সে ধান ও জোয়ার চাষের মরসুমী কাজে তার পিতামাতাকে সাহায্য করে। কখনোসখনো ভায়ের সঙ্গে ছাগলগুলোকে চরাতে বনে নিয়ে যায়। তার ছোট বোনটির দেখা শোনায় মাকে সাহায্য করে। এখন সে প্রায় আট কিলোমিটার হেঁটে প্রতিদিন সবচেয়ে কাছের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সংযোগ। খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানী কাঠ, রঙ এবং ঘর তৈরির উপাদানের মজুত ভাণ্ডার হিসাবে সে বিভিন্ন গাছপালা ব্যবহার করেছে। গৃহস্থালী কাজে, নানা ধর্মীয় আচারে এবং উৎসবর উদ্‌যাপনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উদ্ভিদের নানা অংশ পর্যবেক্ষণ করেছে। বিভিন্ন বৃক্ষের মধ্যে যে সূক্ষ্মতম পার্থক্য তার পরিচিত এবং বিভিন্ন মরসুমে আকার, আয়তন, পাতা ও ফুলের বিন্যাসে, গন্ধে এবং চেহারায় কী কী পরিবর্তন হয় তাও সে লক্ষ্য করে। তার জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক যত বিচিত্র উদ্ভিদ চেনেন তার চেয়ে শতগুণ বেশি বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ তার পরিচিত— সেই শিক্ষক যিনি বিশ্বাস করেন যে জনাবাঈ খুবই খারাপ ছাত্রী।

আমরা কি জানাবই-এর এই সমৃদ্ধ বোধের ভাণ্ডারকে জীব বিজ্ঞানের প্রথাবদ্ধ ধারণার ভাণ্ডারে অনুবাদ করার কাজে সাহায্য করতে পারি? আমরা কি তাকে এই বলে আশ্বস্ত করতে পারি যে বিদ্যালয়ে জীবন বিজ্ঞান কেবলমাত্র লম্বা লম্বা পাঠ্যাংশে নানান পরিভাষা সম্বলিত কোন এক অবাস্তব জগতের কথা বলে না; যে খামারে সে কাজ করে, যে পশুদের সে চেনে, যে অরণ্যের সে পরিচর্যা করে, যার মধ্যে দিয়ে রোজ সে হেঁটে আসে, এসব তাদের নিয়েই লেখা? কখনো যদি তা পারি, একমাত্র তখনই সে প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞান শিখবে।

৩) প্রক্রিয়ায় সিদ্ধতার জন্য পাঠক্রমে শিক্ষার্থীকে পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ার ধারণা হাতে কলমে অর্জনের কাজে যুক্ত করা প্রয়োজন। এটি তাকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উদ্ভব এবং সিদ্ধতার পথে পরিচালিত করবে; বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিক কৌতুহল এবং সৃজনশীলতাকে পুষ্ট করবে। প্রক্রিয়ার সিদ্ধতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কেননা এটি ছাত্রছাত্রীদের কেমনভাবে বিজ্ঞান 'শেখা যায় তা শিখতে' সাহায্য করে।

৪) ঐতিহাসিক সিদ্ধতার জন্য পাঠক্রমে বিজ্ঞানের নানান তথ্যকে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপিত করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে বিজ্ঞানের ধারণা সমূহ বিবর্তিত হয়েছে সেটি অনুধাবনে সক্ষম হবে। সেই সঙ্গে বিজ্ঞানকে একটি সামাজিক বিষয় হিসাবে দেখতে এবং কীভাবে সামাজিক উপাদানগুলি বিজ্ঞানের বিকাশকে প্রভাবিত করে তা বুঝতে এটি শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবে।

৫) পরিবেশগত সিদ্ধতার জন্য শিক্ষার্থীর স্থানীয় এবং সার্বিক পরিবেশের বিস্তৃততর প্রসঙ্গের মধ্যে বিজ্ঞানকে স্থাপিত করতে হবে, যাতে সে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমাজের পারস্পরিক নির্ভরতার প্রশ্নগুলিকে মর্যাদা দিতে পারে এবং কর্মজগতে প্রবেশের উপযোগী দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে।

৬) নৈতিক সিদ্ধতার জন্য পাঠক্রমে থেকে সততা, নৈর্ব্যক্তিকতা, সহযোগিতা, ভয় ও সংস্কার মুক্ত স্বাধীনতা সংক্রান্ত মূল্যবোধগুলির সোচ্চার উপস্থাপনা এবং সেইসঙ্গে শিক্ষার্থীর মনে পরিবেশ রক্ষা, জীবনের প্রতি মমত্ব বিকশিত করা প্রয়োজন।

### ৩.৩.১ বিভিন্ন পর্বে পাঠক্রম

উপরের বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে, বিভিন্ন পর্বের পাঠক্রমের উদ্দেশ্য, বিষয়, শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং মূল্যায়ণ নিম্নে ব্যক্ত হল :

প্রাথমিক স্তরে শিশু আনন্দিত চিত্তে তার পারিপার্শ্বিক জগতে অভিযাত্রী হবে এবং তারই সুরে নিজের জীবনের সুরটি বেঁধে নেবে। এই পর্বে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, এ জগত সম্পর্কে (প্রাকৃতিক পরিবেশ, শিল্পকৃতি এবং মানুষজন) শিশুর কৌতুহলকে লালিত পালিত করা। পর্যবেক্ষণ, শ্রেণী বিভাজন, অনুমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে মৌলিক জ্ঞান ও মানসিক ক্রিয়ায় পেশী সঞ্চালনের দক্ষতা অর্জনের জন্য শিশুকে নানান উদ্ভাবনে নিয়ত যুক্ত রাখা এবং সরাসরি তাকে হাতে কলমে কাজ করতে শেখানো; নকশা এবং অলংকরণ, পরবর্তী পর্বে প্রাযুক্তিক এবং পরিমাণগত দক্ষতা বিকাশের মুখবন্ধ হিসাবে আনুমানিক হিসাব ও পরিমাপ— এই সব ক্ষেত্রে গুরুত্ব দান, ভাষার মৌলিক দক্ষতা বিকশিত করা; কেবলমাত্র বিজ্ঞান বিষয়ে নয় বরং বিজ্ঞানের মাধ্যমে কথন, পঠন এবং লেখনের পাঠ দেওয়া। স্বাস্থ্যকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞানকে বর্তমানে 'পরিবেশ বিজ্ঞান'-এর মধ্যে একত্রিত ও সংহত করা উচিত। সমগ্র প্রাথমিক পর্বে, কোথাও কোন বাঁধাধরা পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না। কোন পুরস্কার বা মূল্যায়ন নম্বর দেওয়া কিংবা কোন শ্রেণীতে কাউকে অনুত্তীর্ন হিসাবে আটকে রাখা চলবে না।

উচ্চ প্রাথমিকের স্তরে, শিশু নিজের হাতে সরল প্রযুক্তির যন্ত্র বা প্রকরণ নির্মাণে এবং পরিচিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিজ্ঞানের নীতিসমূহ শেখার কাজে যুক্ত থাকবে। অবিরত সে নানান কর্মকাণ্ড এবং নিজস্ব ব্যাপক নিরীক্ষণে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে আরো বেশি কিছু জানবে। সক্রিয়তা এবং পরীক্ষা, প্রধানত এ দুটির ভিত্তিতেই বৈজ্ঞানিক ধারণা উদ্ভূত হয়। এ পর্যায়ে তার বৈজ্ঞানিক ধারণাকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিজ্ঞানেরই তরলিত পাঠ হিসাবে গণ্য করলে হবে না। বিদ্যালয়ে এবং প্রতিবেশী অঞ্চলে দলগত কর্মকাণ্ড, সহ-শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা, ব্যাপক নিরীক্ষণ, তথ্যের সংগঠন এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাদের উপস্থাপন ইত্যাদি হল বিবিধ বিদ্যা শিক্ষাদানের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ পর্বে পর্যায়ক্রমিক এবং সেই সঙ্গে ধারাবাহিক মূল্যায়ণ (স্বল্প সময়ান্তে এবং পর্যায়স্তরে পরীক্ষা) থাকা উচিত। 'প্রত্যক্ষ' মর্যাদামানের পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু অকৃতকার্য হিসাবে কাউকে কোন শ্রেণীতে আটকে রাখা চলবে না। ধারাবাহিক আট বছর যারা বিদ্যালয়ে আসবে সেইরকম প্রতিটি শিশুই নবম শ্রেণীতে পাঠ গ্রহণের উপযুক্ত হিসাবে অবশ্যই বিবেচিত হবে।

মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই বিজ্ঞানের শিক্ষাকে নিয়মবদ্ধ চর্চার অধীন একটি যৌগিক বিষয় হিসাবে গণ্য করবে যেখানে উচ্চ প্রাথমিক পর্বের চেয়েও আরো বেশি উন্নত প্রযুক্তির স্বয়ংসম্পূর্ণ যন্ত্রে হাতে কলমে কাজ করা যায় এবং স্বাস্থ্য ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের নানান প্রশ্নে বিশ্লেষণ ও কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়া যায়। তাত্ত্বিক নীতিগুলিকে আবিষ্কার ও যাচাই করার হাতিয়ার হিসাবে প্রণালীবদ্ধ পরীক্ষা এবং স্থানীয়ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ পরিকল্পিত কর্মসূচীতে কাজ করার বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক সাক্ষরতার (STL) আদর্শরূপ এই পর্বের পাঠক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করবে।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষা প্রযুক্তি এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে একটি পৃথক নিয়মবদ্ধ চর্চার বিষয় হিসাবে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিজ্ঞানের পরিচয় ঘটাতে হবে। NPE 1986 অনুসরণে প্রবর্তিত শিক্ষার পাঠ্যনির্ভর (Academic) এবং পেশাগত এই দুটি প্রচলিত ধারাকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আর একবার পর্যালোচনা করা উচিত। যদিও প্রতিটি বিদ্যালয়ে সব কটি বিষয়ে শিক্ষাদানের সুযোগ দেওয়া কার্যত সম্ভবপর নয়, তবু যতটা পারা যায়, ছাত্রছাত্রীদের আপন পছন্দমত স্বাধীনভাবে বিষয় নির্বাচনের সুযোগ দিতে হবে। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠক্রমের মধ্যে পার্থক্যের গতি বা ঢালটি যাতে খুব কঠিন না হয় সেইভাবে যৌক্তিক বিচারে পাঠক্রম প্রস্তুত করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রেও আমাদের পাঠক্রমে যাতে আন্তর্জাতিক স্তরে গৃহীত বর্তমান আদর্শের সঙ্গে সমঝোতা করতে না হয় সে বিষয়েও যথেষ্ট যত্নবান হওয়া উচিত। এই পর্যায়ে, কোনো একটি বিশেষ বিষয়-চর্চার ক্ষেত্রে, সেই বিষয়ে বর্তমানে যে অগ্রগতি ঘটেছে সেগুলি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়ে, মূল পাঠ্যসূচী অত্যন্ত যত্নসহকারে নির্ধারিত করা এবং যথাবিহিত কঠোর ও গভীর অনুধাবনে কাজটি করা উচিত। ঐ নির্দিষ্ট বিষয়-চর্চায় ভাসা-ভাসাভাবে অধিকসংখ্যক পাঠ্যবিষয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা বর্জন করতে হবে।

### ৩.৩.২ দৃষ্টিভঙ্গি

ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষার জটিল চিত্রপটে দৃষ্টিনিবদ্ধ করলে, তিনটি প্রশ্ন সামনে আসে। প্রথমত, আমাদের সংবিধানে শিক্ষার ক্ষেত্রে সমতাসূচক যে লক্ষ্য অর্জনের কথা মুদ্রিত রয়েছে, বিজ্ঞান শিক্ষা তার থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থিত। দ্বিতীয়ত, ভারতের বিজ্ঞান শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের যোগ্য করে তোলে বটে কিন্তু তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবেশেও উদ্ভাবন এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করে না। তৃতীয়ত, একেবারে মৌলিক স্তরে না হলেও প্রায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষার মূল সমস্যা হল পরীক্ষাতন্ত্রের বিপুল অপরিমিত শক্তিমত্ততা।

আর্থিক শ্রেণী, লিঙ্গ, বর্ণ, ধর্ম এবং অঞ্চল ভিত্তিক বিভেদ হ্রাস করে সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে বিজ্ঞান-পাঠক্রমকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। সাম্যের প্রাথমিক উপায় হিসাবে অবশ্যই আমাদের পাঠ্যপুস্তককে ব্যবহার করতে হবে। কেননা আমাদের বিপুল সংখ্যক বিদ্যালয়ে-যাওয়া শিশুর কাছে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষকদের কাছে, শিক্ষার রসদ হিসাবে একমাত্র ঐ পাঠ্য পুস্তকগুলিই সহজলভ্য এবং সুলভ। জাতীয় পাঠক্রমের কাঠামো নির্ধারিত ব্যাপক নির্দেশিকা অনুসারে দেশের মধ্যেই নানা বিকল্প পাঠ্যপুস্তক রচনার বিষয়টিকে উৎসাহিত করা উচিত। নানান কর্মকাণ্ড, পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষাকে এইসব পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তথ্য নির্ভর শিক্ষার চেয়ে বরং চারপাশের জগতের সঙ্গে শিশুকে যুক্ত করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধি করতে হবে। কর্মশিক্ষার বই, সহায়ক পাঠ এবং শিশুর বিশ্বপরিচয় এগুলিকেও সংযুক্ত করে তথ্য এবং ভাবনার জগতকে শিশুর হাতের নাগালে এনে দিতে হবে। এর ফলে শিশুকে সব বিষয়ে পাঠ্য পুস্তক হাতড়াতে হবে না; তার ওপর আরো পাঠ্যসূচীর বোঝাও চাপাতে হবে না অথচ বিভিন্ন পরিকল্পিত কর্মশিবিরে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তার শিক্ষার পরিধিকে সমৃদ্ধ করা যাবে। আঞ্চলিক ভাষায় সমৃদ্ধ দৃশ্যায়ণে এইসব উপাদানের উপচে পড়া ভাণ্ডার আমাদের হাতে রয়েছে।

বিজ্ঞান শিক্ষায় সমতার সুযোগ সৃষ্টির অন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল গ্রামাঞ্চলে বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট স্থান গড়ে তোলা এবং পরীক্ষাগার ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষারসামগ্রীর সুবিধা দান। সামাজিক বিভাজন রেখার এপার ওপারে সেতু গড়ার কাজে তথ্য ও সংযোগ প্রযুক্তি (ICT) একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। ICT কে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে এটি একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তথ্য, সংযোগ এবং গননের রসদ সরবরাহ করে সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ICT যদি শিক্ষক এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে, তবে বিজ্ঞানী এবং তাদের কাজ সম্পর্কে মনগড়া রহস্যের ধারণা দূর করতে সেটি সহায়ক হবে।

বর্তমান পরিস্থিতির যে কোনো গুণাত্মক পরিবর্তনের জন্য ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষায় একেবারে যুগান্তকারী দিকবদল ঘটাতে হবে। বিকৃত শিক্ষাকে পুরোপুরি নিরুৎসাহিত করতেই হবে। পরিমাণাত্মক দক্ষতা, নকশা এবং ভাষার সাহায্যে অনুসন্ধিৎসু দক্ষতাকে শক্তিশালী এবং সাহায্য করতে হবে। সহ্য এবং অতিরিক্ত পাঠক্রম যার উদ্দেশ্য হল তদন্তের দক্ষতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং সৃজনশীলতাকে উদ্দীপ্ত করা, সেটি বহিপরীক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত না হলেও ঐ ক্ষেত্রটিতে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমানে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে যেখানে শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এ জাতীয় কার্যসূচী ব্যাপক প্রসারিত হওয়া উচিত। বিদ্যালয়গুলিতে উৎসাহিত করতে এবং এই জাতীয় আন্দোলনে শিক্ষকদেরও সামিল করতে জাতীয় স্তরে বৃহৎ মাত্রায় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মেলায় আয়োজন করা যেতে পারে। এই আন্দোলন ভারতের প্রতিটি কোণায় অবশ্যই ছড়িয়ে পড়বে, তারপর দক্ষিণ এশিয়া পেরিয়ে যাবে। এর ফলে অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে ও শিক্ষকদের মধ্যে সৃজনশীলতা এবং বৈজ্ঞানিক মনোভাবের ঢেউ সৃষ্টি হবে।

উচ্চ-গুণ-সম্পন্ন মানবিক সম্পদ এবং আর্থিক অনুদানের সহায়তায়, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী এবং শিক্ষকদের একটা সাধারণ সমঝোতায় এনে নতুন করে শিক্ষার্থীদের পরখ করার জন্য পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার করতে হবে। এতে শিক্ষার উচ্চস্তরে পরীক্ষা সম্পর্কিত চাপ কমবে। অসংখ্য প্রবেশিকা পরীক্ষার পাগলামির বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিবিচারের প্রতিযোগিতার চেয়ে বহুমুখী ক্ষমতা যাচাই করার বিভিন্ন পদ্ধতির বিষয়ে গবেষণা শুরু হবে।

অবশ্য এই সংস্কারের জন্য মূলত শিক্ষকদের ক্ষমতা-বৃত্তের নিত্যনতুন খিলানেরও সংস্কার প্রয়োজন। যদি বেশিরভাগ শিক্ষককে সংস্কারের প্রস্তাবগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা না দেওয়া যায় তবে কোনো সংস্কার, তা সে যতই আন্তরিক কিংবা সুপরিকল্পিত হোক না কেন মোটেই তা সফল হবে না। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে, উপরে প্রস্তাবিত সংস্কার আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সকল পর্বে বিভিন্ন ধারায় ফলদান করতে পারবেন।

### ৩. ৪ সমাজ বিজ্ঞান

সমাজের বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের মধ্যেই সমাজ বিজ্ঞানের বিচরণ যেমন ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা এবং নৃতত্ত্ব। একটি ন্যায়নিষ্ঠ এবং শান্তিপূর্ণ সমাজের জন্য জ্ঞানের ভিত্তি নির্মাণে সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি এবং জ্ঞান অপরিহার্য। পরিচিত সামাজিক বাস্তবতাকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করে যৌক্তিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তোলাই পাঠ্য বিষয়বস্তুর লক্ষ্য হওয়া উচিত। সমাজ সম্পর্কে একটি যৌক্তিক বোধ বিকশিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে যাতে সক্ষম করে তোলা যায়, সেইমতো নির্বাচন ও বিন্যাসে উপাদানসমূহকে অর্থপূর্ণ পাঠ্যবস্তুতে রূপান্তরিত করা, সেকারণেই, অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের কাজ।

কেননা সামাজিক বিজ্ঞানকে একটি অকার্যকর বিষয় হিসাবে প্রতিপন্ন করার প্রবণতা দেখা যায় এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তুলনায় এটিকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। একটি ক্রমবর্ধমান আন্তঃ নির্ভরশীল বিশ্বে মানানসই হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বিশ্লেষণধর্মী দক্ষতা অর্জনের সুযোগ যে এই সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যেই থাকে, এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

সামাজিক বিজ্ঞান নিছকই তথ্য পরিবেশন করে এবং পাঠ্যবস্তুটির প্রতি এর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত এমন বিশ্বাস করা হয়। সে কারণে পরীক্ষার জন্য তথ্যগুলিকে কণ্ঠস্থ করার চেয়ে বরং ধারণা সংক্রান্ত অনুধাবনের বিষয়ে অধিক মনোনিবেশ প্রয়োজন। 'ভারবিহীন শিক্ষা (১৯৯৩)'-র প্রস্তাবনা পুনরাবৃত্তি করে, কোনো বিষয় না বুঝে নিছক তথ্য মনে রাখার পরিবর্তে সমাজ-রাজনৈতিক বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা এবং সেই সংক্রান্ত

ধারণা বিকাশের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা সামাজিক বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা লাভ করে তাদের জন্য জীবিকার ক্ষেত্রে উন্নতির বিশেষ সুবিধা নেই এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে। অথচ ঘটনা ঠিক বিপরীত। দ্রুত প্রসারণশীল পরিষেবা ক্ষেত্রে এবং সেইসঙ্গে বিশ্লেষণাত্মক ও সৃজনশীল দক্ষতা বিকাশের বিভিন্ন কাজে এখন সামাজিক বিজ্ঞানই ক্রমশ অধিকতর প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

আমাদের মতো একটি বাস্তববাদী সমাজে সমস্ত অঞ্চলগুলি এবং সামাজিক গোষ্ঠী যাতে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পারে, সে বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রাসঙ্গিক স্থানীয় বিষয়বস্তু অবশ্যই স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে পরিচালিত কর্মসূচীর মধ্যে আদর্শগতভাবে পরিবাহিত হয়ে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ার একটি অংশ হয়ে উঠবে।

বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা এবং সেইসঙ্গে নির্দিষ্ট কয়েকটি পথ যেখানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুসৃত পদ্ধতি আরো সুস্পষ্ট (কোনো অবস্থাতেই প্রাকৃতিক এবং ভৌত বিজ্ঞানের চেয়ে শূন্য নয়) হয়ে ওঠে— তাদের কাছে প্রাকৃতিক ও ভৌত বিজ্ঞানের মতো যে সামাজিক বিজ্ঞানও অধিক পরিমাণে ঋনী, এ বিষয়টির স্বীকৃতি দানও প্রয়োজনীয়।

প্রধানত স্বাধীনতা, আস্থা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং বৈচিত্র্যের প্রতি সম্ভ্রম — এই সমস্ত মানবিক মূল্যবোধের গাঢ়তর অনুভব সৃজনের সাধারণ দায়িত্ব বহন করে এই সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ। অতএব সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীর মনে একটি যুক্তিনিষ্ঠ নৈতিক এবং মানসিক শক্তি উদ্ভুত করা যার ফলে যে সমস্ত সামাজিক শক্তি এইমতো মূল্যবোধকে আঘাত করে তাদের সম্পর্কে তারা সতর্ক থাকতে পারে।

যে সমস্ত নির্দিষ্ট বিষয়সূচী যেমন, ইতিহাস ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতির সমন্বয়ে এই সামাজিক বিজ্ঞান গঠিত হয়, তাদের প্রত্যেকটিরই এমন কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি-প্রকরণবিদ্যা রয়েছে যার সাহায্যে প্রায়শই এদের বিভাজন রেখা-গুলির ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করা যায়। একই সঙ্গে, যেসব ক্ষেত্রে আন্তঃবিষয়ী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা সম্ভব তাদেরও চিহ্নিত করা উচিত। একটি সক্ষম পাঠ্যক্রমে, এমন কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ভাবনা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যেখানে এই আন্তঃবিষয়ী চিন্তন উৎসাহিত হয়।

### ৩.৪.১ প্রস্তাবিত জ্ঞান-তত্ত্বের গঠনকাঠামো

জনপ্রিয় ধারণা এবং সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের অধ্যয়নে নির্দেশিত দাবিগুলির উপরোক্ত বিচারের ভিত্তিতে, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাদান সংক্রান্ত জাতীয় কোন গোষ্ঠীর প্রস্তাবনা হল যে, পরিমার্জিত পাঠ্যসূচীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে মৌলিক বা বুনিয়াদী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। (পাঠ্যপুস্তকগুলিকে আরো অধিক জিজ্ঞাসা সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করার উপায় হিসাবে দেখা উচিত এবং পাঠ্যপুস্তকের বাইরে আরো বেশি পঠন ও পর্যবেক্ষণে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা উচিত।)

কোঠারি কমিশনের প্রস্তাবনা অনুযায়ী, সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যক্রমে বর্তমানে বিকাশশীল বিষয়ের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এ কাজও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আদর্শগত মাত্রা যেমন সাম্য, ন্যায় এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদার মতো বিষয়গুলি অনুধাবনের ক্ষেত্রে এটি মোটেই যথেষ্ট নয়। এই 'বিকাশ'-এর ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিমানুষের ভূমিকা প্রায়শই একটু বাড়িয়ে দেখানো হয়। ভারতীয় জাতিসত্তার কল্পনায় বিবিধ উপায়কে স্থান দেবার জন্য জ্ঞানের একটি তাত্ত্বিক স্থানান্তরণের প্রস্তাবনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলের উল্লেখে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সঠিক ভারসাম্যের প্রয়োজন। আবার একই সঙ্গে ভারতের ইতিহাস কখনো বিচ্ছিন্নভাবে পড়ানো উচিত নয় এবং বিশ্বের

বিভিন্ন অংশে কোথায় কী উন্নতি ঘটছে সে বিষয়েও সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

'পৌরবিজ্ঞান'-এর পরিবর্তে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহারের প্রস্তাবনা করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক যুগে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মধ্যে ক্রমবর্ধমান 'আনুগত্যহীনতা'-র প্রেক্ষাপটে ভারতীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে 'পৌরবিজ্ঞান' বিষয়টি প্রবর্তিত হয়। বশ্যতা এবং বাধ্যতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চাবিকাঠি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই নাগরিক সমাজকে এমন এক বৃত্তে বিচার করে তার ফলে অনুভবী, প্রশ্ন উত্থাপনকারী, সুচিন্তক এবং রূপান্তরক্ষম নাগরিকের জন্ম হয়।

কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সমসাময়িক বিষয় আলোচনার অখণ্ড অংশ হিসাবে নারী দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে লিঙ্গ-প্রশ্নটি উত্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে সামাজিক শিক্ষার বিবিধ তথ্যে যেভাবে অধিক পরিমাণে পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য রয়েছে সেখানে থেকে একটি তাত্ত্বিক সরণ এক্ষত্রে প্রয়োজন।

শিশুদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় এবং সেই সঙ্গে বয়ঃসন্ধিকালে তাদের মধ্যে পিতামাতা, সঙ্গীসাথী, বিপরীত লিঙ্গ এবং সাধারণভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের জগতের সঙ্গে দৃশ্যমান পরিবর্তনের যে ঘটনাগুলি বিকাশ এবং পরিবর্তনের সামাজিক দিকগুলির সঙ্গে যুক্ত, তাদের যথাযথ উল্লেখ প্রয়োজন। বিভিন্ন স্তরে গৃহীত নীতি এবং কর্মসূচীর মাধ্যমে শিশু এবং বয়ঃসন্ধির কিশোর-কিশোরী/পুরুষ-যুবতীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনের প্রতি সযত্ন সংবেদন এই বিষয়ে একটি ঘনিষ্ঠ উপাদান।

মানবাধিকারের তত্ত্বটির একটি সার্বিক নির্দেশতন্ত্র আছে। শিশুরা যাতে তাদের বয়স-অনুপাতে যথাযথ উপায়ে এই সার্বিক মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিত হয় সে বিষয়ে বাধ্যতা থাকা উচিত। দিন-প্রতিদিনের বিষয়গুলি, যেমন জলের সমস্যা ইত্যাদি নানা উল্লেখ্য বিষয়ের আলোচনা করা যেতে পারে যাতে অল্পবয়সি শিক্ষার্থীরা মানব-মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নগুলিতে সচেতন হয়ে ওঠে।

### ৩.৪.২ পাঠক্রমের পরিকল্পনা

প্রাথমিক স্তরের ক্ষেত্রে ভাষা এবং গণিতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ ব্যাখ্যা করতে হবে। ভৌত, শারীরিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক নানান বৃত্তের বিবিধ উদাহরণের মাধ্যমে পরিবেশকে অনুধাবন করার নানান কর্মকাণ্ডে শিশুদের যুক্ত করা উচিত। ব্যবহৃত ভাষা মর্যাদা লিঙ্গ-সুবেদী হবে। শিক্ষাদান পদ্ধতি অংশগ্রহণভিত্তিক এবং আলোচনা নির্ভর ধাঁচের হওয়া উচিত।

তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর মধ্যে পরিবেশ-অধ্যয়ন বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত পারে। প্রাকৃতিক পরিবেশের অধ্যয়নে, এর সংরক্ষণ এবং অবক্ষয় থেকে রক্ষার আশু প্রয়োজনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। দারিদ্র্য শিশুশ্রম, নিরক্ষরতা, গ্রাম ও শহর এলাকায় বর্ণ ও শ্রেণী অসাম্য— এ জাতীয় সামাজিক প্রশ্নে শিশুদেরও সংবেদী করে তোলার কাজ শুরু করতে হবে। শিশুদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এবং তাদের জীবন ও জগৎ বিষয়বস্তুর মধ্যে অবশ্যই প্রতিফলিত হবে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে সামাজিক অধ্যয়ন ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতি থেকে তার বিষয়বস্তু আহরণ করবে। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ঘটনা এবং বিকাশ সংক্রান্ত অংশের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিকাশের ইতিহাস তার আলোচনায় স্থান দেবে। স্থানীয় থেকে সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন স্তরে সম্পদ ও বিকাশ এবং পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির সঙ্গে একটি ভারসাম্য রক্ষাকারী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে ভূগোল আমাদের সাহায্য

করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানেন, স্থানীয়, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে সরকারের গঠন এবং পরিচালন ব্যবস্থা, আর অংশগ্রহণকারী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটাতে হবে। অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ শিক্ষার্থীদের পরিবার বাজার এবং রাষ্ট্রের মত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যবেক্ষণে দক্ষ করে তুলবে। অবশ্য এমন আর একটি বিভাগও থাকা উচিত যেখানে এই সমস্ত চিন্তনের ক্ষেত্রে বিবিধ বিদ্যার আর্ন্তঃসম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

মাধ্যমিক স্তরে, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতি সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত হবে। সমসাময়িক ভারতের ওপরই মূল দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে এবং রাষ্ট্র বর্তমানে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তারই গভীর অনুধাবনে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রস্তাবিত তাত্ত্বিক সরণকে বজায় রেখে তপশিলী জাতি-উপজাতি সমূহে এবং ভোটাধিকারহীন জনসমষ্টি সহ বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়গুলি আলোচিত হবে। যতদূর সম্ভব শিশুদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে বিষয়গুলিকে সম্পর্কিত করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত। ইতিহাসে, বিশ্বের অন্যান্য অংশের তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশসহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং আধুনিক ইতিহাসের অন্যান্য দিকগুলি অধ্যয়ন করতে হবে। নিজস্ব জগত আরো ভালোভাবে অনুধাবন করা এবং সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় অতীতের সাহচর্যে তাদের আপন পরিচয় রূপ পরিগ্রহ করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার সদিচ্ছায় ইতিহাসের পাঠ দেওয়া উচিত। এতে নিজেদের জগতের ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া আবিষ্কার এবং কোনো উপায়ে ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ পরিচালিত হত আর বর্তমানে হয় তার তুলনামূলক আলোচনায় ইতিহাস শিক্ষার্থীদের অবশ্যই সাহায্য করবে। বিকাশের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মনে পরিবেশ এবং তার সংরক্ষণ বিষয়ে যুক্তিনিষ্ঠ অনুমোদনের ধারণা যাতে জাগ্রত করা যায় সেদিকে দৃষ্টি রেখেই ভূগোলের পাঠ দেওয়া উচিত। ভারতীয় সংবিধানের মূল্যবোধসঞ্জাত কাঠামোর অন্তরালে যে দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে তারই আলোচনা অর্থাৎ সাম্য, স্বাধীনতা, ন্যায়, মৈত্রী, ধর্ম-নিরপেক্ষতা, মর্যাদা, বহুত্ববাদ এবং শোষণ থেকে মুক্তির বিষয়ে গভীর আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত। যেহেতু এই পর্যায়েই শিশুদের 'অর্থনীতি' নামক পাঠ্যবিষয়টির সঙ্গে পরিচিত করানো হয়, সে-কারণে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে বিষয়টি যাতে অবশ্যই আলোচিত হয়, এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যেহেতু শিক্ষার্থীদের বিষয় নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয়, সেকারণে এই স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বেশ কিছু শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বিদায়ের পর্ব এটি এবং এর পরেই তারা কাজ ও চাকুরির জগতে প্রবেশ করে। অন্যদের ক্ষেত্রে এটি উচ্চশিক্ষার ভিত্তিস্তর। শিক্ষার বিশিষ্ট পাঠ্যসূচী অথবা কর্মভিত্তিক পেশাগত পাঠ্যসূচী— এর যে-কোন একটি তারা নির্বাচন করতে পারে। যে ক্ষেত্রটিই তারা বেছে নিক না কেন সবক্ষেত্রেই অ র্থপূর্ণ অবদানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও মৌলিক জ্ঞানে এই পর্বের ভিত্তিস্তরটি তাদের অবশ্যই সুসজ্জিত করে তুলবে। সামাজিক বিজ্ঞান এবং বাণিজ্যের অসংখ্য পাঠ্যসূচী তাদের সামনে উপস্থাপিত করা হবে এবং শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দ অনুসারে নির্বাচন করবে। পৃথক পৃথক 'শাখা'য় বিষয়গুলি নিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই এবং নিজেদের প্রয়োজন, আগ্রহ এবং প্রবণতা অনুসারে বিষয় বা পাঠ্যসূচী নির্বাচনের স্বাধীনতা শিক্ষার্থীদের অবশ্যই দিতে হবে। সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা এবং মনোবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত। বাণিজ্যের মধ্যে ব্যবসা অধ্যয়ন এবং হিসাবরক্ষণ বিদ্যা রয়েছে।

### ৩.৪.৩ শিক্ষাদান এবং মজুত ভাণ্ডার সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি

পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা যাকে তর্ক-বিতর্কও বলা চলে, সেই পরিবেশে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করার সময় বারে বারেই সমাজ বিজ্ঞানের পাঠে নতুন উদ্দীপনার প্রয়োজন হয়। সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষাদানে এমন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যাতে শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতা, নান্দনিকতা এবং সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করা যায়। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে এবং সমাজে ঘটনার পরিবর্তনগুলি

বুঝতে তারা সক্ষম হয়। সমস্যার সমাধান, সেগুলির নাট্যরূপ দেওয়া এবং কোনো বিশেষ ভূমিকায় অংশগ্রহণ—এইরকম কখনোই কাজে-না-লাগানো কর্মসূচীকে এখনব্যবহার করা যেতেই পারে। শ্রুতি-দৃশ্য মাধ্যমের এক বিশাল ভাণ্ডার যার মধ্যে রয়েছে ফোটোগ্রাফ, সারণি, মানচিত্র এবং পুরাতাত্ত্বিক ও পার্থিব সংস্কৃতি প্রতিরূপের সমাহার,—শিক্ষাদানের সময় সেই ভাণ্ডারকে অবশ্যই কাজে লাগানো উচিত।

শিক্ষার প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতে নিছক তথ্যের বোঝা চাপানো থেকে দিকবদল করে বিতর্ক এবং আলোচনার উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। শেখা এবং শেখানোর এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই সামাজিক বাস্তবতার প্রশ্নে সজীব থাকতে পারবে।

| জল এবং পরিবেশ | |
|---|---|
| জল আসে কোথা থেকে? | জলের প্রাকৃতিক উৎস<br>নদী, হ্রদ, সমুদ্র, ভৌম জল |
| আমাদের স্থানীয় জলের উৎস কোথায়? | জলের উৎসের মানচিত্র নির্মাণ<br>স্থানীয়/ আঞ্চলিক/জাতীয় |
| কূপগুলি কেন শুকিয়ে যায়? | জলের উৎসের মধ্যে সম্পর্ক প্রাকৃতিক এবং |
| কেমন করে হস্তচালিত পাম্প কাজ করে? | মানুষচালিত জলের উৎস |
| ছোট বাঁধের চেয়ে কি বড় বাঁধ বেশি সুবিধাজনক? | ভূগর্ভস্থ জলতল ও উৎসকে বোঝা, হস্তচালিত<br>পাম্পের সাহায্যে সেচব্যবস্থা পরিবেশের ওপর বড়ো<br>বাঁধের প্রভাব |
| খরার কারণ কী? | বিভিন্ন ecosystem এ জল মরু অঞ্চলে জলের উৎস<br>পার্বত্য এলাকায় জলের উৎস খরা এবং বন্যা |
| জলের সামাজিক গুরুত্ব | |
| গ্রামের কূপ কার দখলে? | বর্ণ ও শ্রেণী জলের উৎসের বিশুদ্ধতা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ |
| কে জল তোলে? | শ্রমের লি। বিভাজন এবং জলের লভ্যতা |
| আমাদের কি পর্যাপ্ত জল আছে? | পানীয় ও সেচের জল সম্পর্কে স্থানীয় এবং আঞ্চলিক<br>দ্বন্দ্ব বাজারের শক্তি রূপ জল |
| পরিষ্কার জল আবশ্যিক কেন? | স্বাস্থ্য শরীরে জলের প্রয়োজন পানের উপযুক্ত পরিষ্কার<br>জল<br>পাবার অধিকার জলবাহিত এবং জল থেকে উদ্ভূত<br>অসুখ |

ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর সজীব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই সমস্ত ধারণা শিক্ষার্থীকে বিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে। প্রায়শই দেখা যায় যে, শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন বিষয়ে সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং শ্রেণী বৈষম্য আপন আপন স্তরে পক্ষপাতগ্রস্ত একপেশে মনোভাব, সংস্কার এবং বদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়। কাজেই একেবারে খোলা মনেই শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে সচল রাখতে হবে। শিক্ষকেরা শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক বাস্তবতার নানান মাত্রাকে অবশ্যই তাদের আলোচনায় আনবেন এবং পড়ুয়াদের মধ্যেও সেই সঙ্গে নিজেদের মধ্যেও ক্রমবর্ধমান আত্মসচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করে যাবেন।

### ৩.৫ শিল্পকলার শিক্ষা

বর্তমানে বিগত কয়েক দশক যাবৎ, শিক্ষা ব্যবস্থায় শিল্পকলার গুরুত্বের প্রশ্নটি বারে বারে বিতর্কিত, আলোচিত এবং সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সেই লক্ষ্যে বিন্দুমাত্র অগ্রগতি হয়নি। আমরা যদি আমাদের অনন্য সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা, তার বৈচিত্র্য এবং সমৃদ্ধি অটুট রাখতে চাই, তাহলে আমাদের পড়ুয়াদের প্রচলিত প্রথামাফিক বিদ্যালয় শিক্ষার মধ্যে শিল্পকলার শিক্ষাকে সংহত করায় যে কতটা প্রয়োজন সে বিষয়ে এই মুহূর্তেই আশু মনোযোগ দেওয়া দরকার। শিল্পকলার অনুগামিতাকে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাক, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা অবিচলিত দৃঢ়তায় নবীন শিক্ষার্থীদের এবং তাদের সৃজনশীল মনকে শিল্পকলাকে চর্চায় বিষয় হিসাবে গ্রহণ করতে নিরুৎসাহিত করে কিংবা বড় জোর একে 'দরকারী খেয়াল' আর 'অবসরের কাজ' হিসাবে গণ্য করার অনুমতি দেয়। স্বাধীনতা দিবস, প্রতিষ্ঠা দিবস, বার্ষিক অনুষ্ঠান বা বিদ্যালয়ের অগ্রগতি ও কাজকর্ম বিচারের জন্য পরিদর্শনের সময়কালে আয়োজিত এইরকম নানান অনুষ্ঠানের সময় বিদ্যালয়ের মর্যাদা বৃদ্ধির বেশ ভালো হাতিয়ার রূপেই শিল্পকলার জ্ঞান বর্তমানে সংকীর্ণ পরিসরে সংকুচিত হয়ে আছে। এর আগে কিংবা এর পরে, শিশুর বিদ্যালয় জীবনকে আরো ভালো করে তোলার জন্য শিল্পকলাকে পরিত্যাগ করা হয় এবং যে বিষয়গুলি অনেক বেশি মনোযোগের যোগ্য মনে করা হয়, তাদের দিকেই শিশুদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সে কারণে কেবল শিক্ষার্থীরাই নয়, তাদের অভিভাবক, শিক্ষক, এমন কি শিক্ষানীতি রচয়িতা এবং শিক্ষাবিদদের মধ্যেও শিল্পকলা বিষয়ে সাধারণ সচেতনতার স্রোত ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে।

বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক ধরণের অন্তসারশূন্য, জনপ্রিয় ধাঁচের শিল্পকলাকে উৎসাহিত করে এবং লোকদেখানো গান, নাচ এবং অভিনয়ে ভরপুর অনুষ্ঠান যা নিছকই বিনোদন এবং যাতে নান্দনিকতার কোনো চিহ্নই নেই, সেগুলির প্রয়োজনায় বিশেষ গর্ব অনুভব করে। শিল্পকলার গুরুত্বকে এইভাবে আর বেশিদিন আমরা অবহেলা করতে পারব না। বিচিত্র এবং বিশাল সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ যে শিক্ষার্থীর দল আমাদের রয়েছে, তাদের শৈল্পিক দক্ষতায় পুষ্ট করতে, তাদের মনে সাংস্কৃতিক এবং শৈল্পিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে, সম্ভাব্য সমস্ত শক্তি এবং মজুত ভাণ্ডারকে অবশ্যই সংহত এবং ঘনীভূত করতে হবে। ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষ কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের জীবন্ত উদাহরণ হল আমাদের শিল্পকলা। এর মধ্যে সঙ্গীত এবং নৃত্যের কত বিচিত্র লোক- এবং ধ্রুপদী আঙ্গিক, থিয়েটার পুতুল নাচ, মৃৎশিল্প, দৃশ্যকলা এবং চারুকলা, ভারতের প্রতিটি অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। এই সমস্ত শিল্পকলার যেকোনো একটি শিখলে আমাদের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় জীবনের এই কয়েক বছর শুধু নয়, এই নবীন নাগরিকদের সমগ্র জীবনে যতদিন তারা বেঁচে থাকবে ততদিন এই শিক্ষা, তাদের সমৃদ্ধ করবে।

শিল্পকলা, তা সে দৃশ্যকলা বা প্রদর্শিত বা পারফর্ম কলা যাই হোক না কেন, শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে পাঠক্রমে তার উপস্থিতি প্রয়োজন। কেবল বিনোদনের উপকরণ হিসাবে নয়, শিক্ষার্থীরা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে এইসব ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা এবং সক্ষমতা অবশ্যই বিকশিত করবে। শিল্পকলার পাঠক্রমের মধ্যে শিক্ষার্থী দেশের সমৃদ্ধ এবং বিচিত্র শৈল্পিক পরম্পরার সঙ্গে। অবশ্যই পরিচিত হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে শিল্পকলার শিক্ষা একই সঙ্গে চর্চিত বিষয় এবং বিষয়চর্চার হাতিয়ার হয়ে উঠবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে

এই শিক্ষার সুবিধা থাকতেই হবে। নির্দিষ্ট শিল্পকলার চারটি প্রধান ধারা যথা, সঙ্গীত, নৃত্য, দৃশ্য কলা এবং থিয়েটার— সব কটিই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। শিল্পকলার গুরুত্ব বিষয়ে শিক্ষাব্রতী এবং অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসকদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার সেই সঙ্গে প্রয়োজন। শেখানোর চেয়েও শেখাকেই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে নির্দেশের পরিবর্তে অংশগ্রহণ, বাদানুবাদ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

বিদ্যালয় জীবনের সবকটি বছরে, প্রতিটি পর্বে, শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম এবং আঙ্গিকগুলি শিশুদের আত্ম-অনুসন্ধানে ও তার পার্থিব জগতের অভিযানে খেলাচ্ছলে ও বাঁধন শৃঙ্খলায় যুক্ত হবার সুযোগ দেয় এবং নিজেকে নানাভাবে প্রকাশ করতেও সাহায্য করে। সঙ্গীত, নৃত্য এবং থিয়েটার এইসব শিল্পমাধ্যমেই শিশুর বৌদ্ধিক এবং সামাজিক আত্মপরিচয়ের বিকাশ ঘটে। প্রাথমিক স্তরের পূর্বে এবং প্রাথমিক পর্বে বিদ্যালয়ের বছরগুলিতে এইসব অভিজ্ঞতার গুরুত্ব বিষয়ে কখনোই অত্যধিক জোর দেওয়া যাবে না।

**শিক্ষায় থিয়েটারের ব্যবহার**

থিয়েটার একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের তুলনায় শিক্ষায় তার ব্যবহার হয় অত্যন্ত কম। বহু মানুষের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে আবিষ্কারের জন্যে। আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশের জন্যে, বাস্তব জগৎ, সমাজ, প্রকৃতি প্রভৃতির প্রতি সহমর্মিতাশীল হয়ে ওঠার জন্য থিয়েটারের চেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম অত্যন্ত বিরল।

লিখিত নাট্যরূপ থেকে নাটক অভিনয় করা নাটকের কেবল একটি দিক। অভিনয়ের মাধ্যমে, নাটক অনুশীলনের মাধ্যমে, শরীরচালনা এবং স্বর নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে শিখতে, স্বতঃস্ফূর্ত ও দলবদ্ধভাবে অভিনয় করার মাধ্যমে জীবনের আরো অনেক কার্যকারী জ্ঞান লাভ করা যায়।

শিক্ষকের নিজের জন্য এই ধরণের বিকাশ অত্যন্ত জরুরি, আর তার চেয়েও জরুরি তাঁর এই বোধ ও অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার্থীর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

ভাষায় সাহায্যে প্রকৃতি এবং নিজের ও অন্যের গভীর গোপন বোধের জগতে অভিযাত্রী হওয়া যায়, সেটিও শিল্পকলার নানান আঙ্গিকের মাধ্যমে শিশুরা আপন অভিজ্ঞতায় শিখতে এবং বুঝতে পারে। আপন স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী নানান বিচিত্র আঙ্গিকে সক্ষম শিশুরা এই শিল্প আঙ্গিকের আঙিনায় পরস্পরের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করতে পারে, তাদের মধ্যে স্বভাবগত এবং সক্ষমতার পার্থক্য মোটেই গুরুত্ব পায় না।

শীতকালের এক সকালে, শিক্ষিকা ছেলেমেয়েদের একটি 'প্রভাতী দৃশ্য' আঁকতে বললেন। একটি ছেলে সে অনুযায়ী আঁকল। তারপর ছবির পশ্চাদ ভাগ পুরো কালো করে সূর্য প্রায় ঢেকে ফেলল। আমি তো ভোরের দৃশ্য আঁকতে বলেছিলাম। সূর্য তো ঝলমলে হবে।' শিক্ষিকার বিস্মিত প্রশ্ন। তিনি দেখলেনই না যে, শিশুর চোখ জানলার বাইরে। সেখানে তখনো অন্ধকার কাটেনি, ঘন ধূসর শীত-কুয়াশার মেঘে সূর্য ঢাকা পড়েছে।

প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিল্পকলা এবং পরম্পরাগত চারুকলার সংহতির জন্য যথেষ্ট রসদ রাখতে হবে। সে কারণে পাঠক্রমে শিল্পকলার কাজটি করার জন্য পর্যাপ্ত সময় যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করাও খুব জরুরি।

### ঐতিহ্যবাহী চারুকলা পরম্পরা

চারুকলা এমনই এক উৎপাদনশীল প্রক্রিয়া, একটি অপূর্ব দেশজ কৃৎকৌশল যেটি এখনো পর্যন্ত আমাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। এর কাঁচামাল সব সময়েই আমাদের চারপাশে ছড়ানো থাকে এবং পরিবেশের সঙ্গে তার সখ্যতাও অটুট। চারুকলার সজীব দক্ষতা, কৃৎকৌশল, নকশা এবং উৎপন্নের যে সমৃদ্ধ ভাণ্ডার আমাদের রয়েছে, সেটি পাঠক্রমের শিল্প এবং শিল্পকৃতি উভয় ক্ষেত্রের জন্যই মূল সম্পদের একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডার গড়ে তুলতে পারে এবং গড়ে তুলবে। বিভিন্ন কাঁচামাল এবং কৃৎকৌশলে হাতে কলমে কাজ করলে তা প্রক্রিয়াগুলিকে বোঝা, সমৃদ্ধ রসদের অধিকারী হওয়া, উদ্যোগ নেওয়া এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতার কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। ব্যাপক শিক্ষার একটি অর্থবহ স্থান হিসাবে এই ক্ষেত্রটি বেশ মানানসই।

চারুকলাকে অবশ্যই সৃজনশীল এবং নান্দনিক কৃতি এবং সর্বোপরি কাজ হিসাবে শেখাতে হবে। ইতিহাস, সমাজ এবং পরিবেশের পাঠ, ভুগোল এবং অর্থনীতির পাঠের মধ্যেও একে সংহত করা যায়। লিঙ্গ, পরিবেশ এবং গোষ্ঠী সম্পর্কে বোধের জগতে নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাও 'গুণাগুণবিচারী' চারুকলা শিক্ষার একটি সুসংহত অংশ নেওয়া উচিত।

- সৃজনশীল ও নান্দনিক দিকটিতে বিশেষ গুরুত্ব সহ 'শিল্পকলা'-র একটি অংশ হিসেবে চারুকলা পাঠক্রমের অঙ্গীভূত হতে পারে।
- চারুকলা-শিল্পীরাই এই বিষয়ে শিক্ষক এবং প্রশিক্ষকরূপে নিয়োজিত হবেন এবং ওরা যাতে আংশিক সময়ের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের কাজে যুক্ত হতে পারেন সে ব্যবস্থা করতে হবে।
- শুধু মুখে মুখে চারুশিল্পের গল্পকাহিনী না শুনিয়ে হাতে কলমে সজীব পরীক্ষামূলক সৃজনের মাধ্যমেই চারুকলার পাঠ নিতে হবে।
- শ্রেণীর বাড়ির কাজ হিসাবে কিছু অনুশীলন করতে না দিয়ে নির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে শেখাতে হবে।
- বিভিন্ন চারুকলার জন্য বিভিন্ন পাঠক্রম প্রস্তুত করতে হবে; মজুত ভাণ্ডার বা রসদ হিসাবে থাকবে নকশার বই, নমুনা, বই, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের নির্দেশিকা এবং চারুকলা মানচিত্র।
- পর্যাপ্ত উপাদান এবং যন্ত্রপাতি সহ চারুকলা কর্মশালাতে উন্নয়ন প্রয়োজন।
- চারুকলা-শিল্পী, আঙ্গিকগুলির পরম্পরা শিশুদের সামনে উপস্থাপিত করতে এবং তাদের নিজস্ব ও সৃজনশীল উদ্যোগগুলি জনসমক্ষে প্রদর্শিত করতে চারুকলা মেলার আয়োজন করা যেতে পারে।

যেখানে থিয়েটার, বা নৃত্য, মাটির কাজ ইত্যাদি করা হবে সেখানে এই কাজের জন্য একটানা এক কি দেড় ঘণ্টা নির্দিষ্ট সময় দিতে হবে। শিশুদের কাজও যাতে বড়দের মানে হয় কিংবা শিল্প যাতে 'নিখুঁত' হয়ে ওঠে সেদিকে জোর দিলে চলবে না। বরং শিশুর নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি এবং শৈলী যাতে ঐ সব উপাদানে এবং কাজের দক্ষতায় ও কলাকৌশলে প্রকাশিত হয় সেটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কোন অবস্থাতেই এইসব বিষয়ে অত্যাধিক গুরুত্ব

দেওয়া বা জোর খাটানো চলবে না। বছরের পর বছর শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের নিজের মত করে নিরন্তর একান্ত মনোযোগ স্বাধীনভাবে নিজস্ব শিল্পপরিকল্পনাগুলিকে সূত্রায়িত ও রূপায়িত করার কাজে সাহায্য করে যাবেন। এতে তাদের মনে নান্দনিক বোধ এবং উৎকর্ষের ধারণা গড়ে উঠবে।

বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্বে শিশুদের পাঠক্রমে তাদের পছন্দমত শিল্পমাধ্যমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া যায়। সব ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে শেখা এবং সেগুলির চর্চার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা শিল্প এবং নান্দনিক অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত কিছু তত্ত্ব গড়তে পারে। এতে তাদের মনে শিল্পকলার মর্মবস্তুর বোধ আরো গভীর হবে এবং জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর তাৎপর্যও তারা বুঝতে পারবে। জনপ্রিয় শিল্প আঙ্গিক, বিভিন্ন ধরণের শিল্প-পরম্পরা (সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা) এবং সৃজনশীলতা বিষয়ক আলোচনাতেও শিল্পের বিচিত্র আঙ্গিক এবং 'রুচির' প্রশ্নে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট তাদের সামনে উপস্থাপিত করা যাবে। সুতরাং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, পাঠক্রমে যেন কখনোই পক্ষপাতপূর্ণ একপেশে মনোভাবে সংস্কৃতির উচ্চ বা নিম্ন রূপ বিচার কিংবা ধ্রূপদী এবং লোকশিল্পকে কোনো পৃথক নিরিখে উপস্থাপন না করা হয়। মাধ্যমিকের পরে +২ ই পর্বে যারা বিশেষ কোন শিল্প আঙ্গিকের বিশিষ্ট পাঠ নিতে কিংবা ঐ বিশেষ শিল্পমাধ্যমেই তাদের ভবিষ্যত পেশাগত জীবনে প্রবেশ করতে চাইবে, সেই সব শিক্ষার্থীদের তাদের ইচ্ছাপূরণের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে হবে।

শিল্পকলার শিক্ষকদের কাছে শিল্পকলা শিক্ষার আরো অনেক উপকরণ সহজলভ্য করে তুলতে হবে। শিক্ষকেরা যাতে শিল্পকলার শিক্ষাকে আরো বেশি কুশলতায় এবং সৃজনশীলতায় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন, সেজন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং জ্ঞানবৃদ্ধির শিক্ষাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে যুক্ত করতে হবে। এরই সঙ্গে বাল ভবন যারা নাগরিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, জেলার সদরদপ্তরে এবং নিশ্চিতরূপে ব্লক স্তরে তাদের বহুল সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এরই ফলে শিল্পকলা ও চারুকলার কাজকর্মের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অতিরিক্ত বিকাশে উৎসাহ দেওয়া যাবে এবং শিশুদের জন্য ঐ সব চারুকলার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

### ৩.৬ স্বাস্থ্য এবং শারীরিক শিক্ষা

স্বাস্থ্য যে একটি বহুমাত্রিক ধারণা এবং জৈবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উপাদানে যে এটি গড়ে ওঠে সে কথা সর্বজনস্বীকৃত। জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন যেমন খাদ্য, নিরাপদ জলসরবরাহ, বাসস্থান, নিকাশী ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা এগুলি মানুষের কতটা আয়ত্বাধীন, সেই বিষয়টিই একটি জনসমষ্টির স্বাস্থ্যের পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে এবং মানুষের নৈতিক এবং পৌষ্টিক সূচকের মধ্যে তা প্রতিফলিত হয়। শিশুর সামগ্রিক বিকাশের জন্য স্বাস্থ্য হল একটি 'গুণাগুণ বিচারী' জোগান এবং বিদ্যালয়ে শিশুর অন্তর্ভুক্তি, অবস্থিতি এবং শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে এটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এই পাঠক্রমের মধ্যে স্বাস্থ্যের একটি সম্পূর্ণ ও সামগ্রিক সংজ্ঞা থাকা প্রয়োজন যার মধ্যে শারীরিক শিক্ষা এবং যোগব্যায়াম শিশুর শারীরিক, সামাজিক, আবেগময় এবং মানসিক বিকাশে বিশেষ অবদানের সাক্ষর রাখতে পারে।

এদেশের বেশিরভাগ শিশুই, প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে একেবারে বিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক পর্ব পর্যন্ত অপুষ্টি ও সংক্রামক রোগের শিকার। শিশুদের স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রধান সমস্যা হল এটি। অতএব, বিদ্যালয় শিক্ষাদান পর্বেই সমস্ত শিশুর প্রতি বিশেষত পিছিয়ে পড়া অংশের শিশুরা এবং শিশু-মেয়েদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। সে কারণে মধ্যাহ্নের আহার কর্মসূচী এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে বিকাশের বিভিন্ন স্তরে নির্দিষ্ট বয়স ভিত্তিক গুরুত্বের বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট বিদ্যালয় কর্মসূচীর ভাবনা সেই ১৯৪০ সাল থেকেই আলোচিত হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে ছটি প্রধান উপাদান যেমন, স্বাস্থ্যের যত্ন, বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্কুলের দ্বি-প্রাহরিক খাবার, স্বাস্থ্য এবং শারীরিক শিক্ষা। শিশুর সামগ্রিক বিকাশের জন্য এগুলি অত্যন্ত জরুরি এবং নির্দিষ্টভাবে পাঠক্রমে এদের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। পাঠক্রমে সর্বাধুনিক সংযোজন হল যোগশিক্ষা।

বর্তমানে বিদ্যালয়গুলিতে যেমন খণ্ডিত শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে তার পরিবর্তে সমস্ত দলটিকে একত্রে স্বাস্থ্য এবং শারীরিক শিক্ষার একটি সুস্পষ্ট পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাঠক্রমের মূল অংশ হিসাবে, কোনো অবস্থাতেই খেলা এবং যোগব্যায়ামের জন্য পূর্ব নির্দিষ্ট সময় কমানো বা বাতিল করা চলবে না।

বয়ঃসন্ধিকালীর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনের দিকটি বিশেষরূপে তাদের প্রজনন এবং যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে অবহিত করানো যে দরকার, সে সম্পর্কে ক্রমশ অনুধাবন করা যাচ্ছে। যেহেতু এই সমস্ত প্রয়োজনগুলি মূলত যৌনতা এবং যৌন-অনুভব সংক্রান্ত, যেগুলি সাংস্কৃতিক বোধের নিরিখে বেশ স্পর্শকাতর এলাকা, সে কারণেই বিষয়ে যথাযথ তথ্য লাভের সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়। বস্তুত, প্রজনন এবং যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে তাদের ধারণা এবং সংশ্লিষ্ট আচার আচরণ অধিক পরিমাণে কল্পকাহিনী এবং ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা পরিচালিত হয়। ফলে নেশার ওষুধ/বস্তুর অপব্যবহার, এইচ. আই. ভি./ এডস্ সংক্রমণ, এই জাতীয় বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে তাদের জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়। HIV / এইডস এবং নেশার ওষুধ/বস্তুর অপব্যবহার সহ বয়সন্ধিকালীন প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে বয়সোচিত, বিষয়-নির্দিষ্ট মধ্যস্থতার প্রতি দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করা সে কারণে প্রয়োজনীয় যাতে শিশুদের এ সংক্রান্ত জ্ঞানলাভে এবং নিজ জীবনে দক্ষতা অর্জনের সুবিধা দেওয়া যায় এবং বড়ো-হয়ে-ওঠার প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে যাতে তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

### ৩.৬.১ কর্মনীতি

স্বাস্থ্যের আন্তর্বিষয়ক সংশ্লিষ্টতার কারণে, পাঠক্রমে পারস্পরিক সাধারণ শিক্ষা ও সংহতির যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। জাতীয় সেবা প্রকল্প, ভারত স্কাউট এবং গাইড, এন. সি. সি.— এরা হল এইরকম কয়েকটি ক্ষেত্র। বিজ্ঞানের পাঠে শরীরবিদ্যা, স্বাস্থ্য, রোগব্যাধি এবং বিভিন্ন সজীব বস্তুর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তাদের প্রাকৃতিক নিবাস সম্পর্কে শেখানো যাবে। সামাজিক বিজ্ঞান, আর্থ সামাজিক এবং জাগতিক প্রেক্ষাপটে সংক্রামক রোগের বিস্তার, নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাময় সম্পর্কে শিশুর ধারণা গড়ে তুলে সমগ্র গোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে তার অন্তর্দৃষ্টি বিকশিত করা সম্ভব হবে। মুদ্রিত পাঠক্রমের বাস্তব প্রয়োগের কাজে ব্যবহারিক শিক্ষা এবং উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গির কাছে আমাদের ঋণী হতেই হবে।

সামগ্রিক বিকাশে এ বিষয়টির গুরুত্বের কারণে পরিচালনবর্গ, বিদ্যালয়ের অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকাগণ, স্বাস্থ্য বিভাগ, মাতা-পিতা ও শিশুদের একত্র অংশগ্রহণে একেবারে নীতিগত স্তরে এ বিষয়টি প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। একেবারে মৌলিক বিষয় হিসাবে একে স্বীকার করে একেবারে প্রাথমিক স্তরথেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে এবং পরে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে স্বাস্থ্য এবং শরীরশিক্ষা চালু রাখা উচিত। অবশ্য অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে একে সমমর্যাদা দিতে হবে। বর্তমানে তা দেওয়া হয় না। এই পাঠ্যক্রম কার্যকররূপে পরিচালনার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে একেবারে ন্যূনতম আবশ্যিক ভৌত স্থান এবং যন্ত্রপাতি থাকতে হবে এবং ডাক্তার ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকেরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসবেন। এই ক্ষেত্রটির শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের প্রস্তুতিতে সুপরিকল্পিত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে প্রাক-চাকুরি শিক্ষক-প্রশিক্ষণে স্বাস্থ্য শিক্ষা সহ এই ক্ষেত্রটি, শরীরশিক্ষা এবং যোগ ব্যায়ামকে যথাযথভাবে সংযুক্ত করা উচিত। প্রচলিত শরীরবিদ্যা শিক্ষণকেন্দ্রের ক্ষমতা নতুনভাবে বিচার করা এবং সঠিকভাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। অনুরূপে, বিদ্যালয়ে যোগব্যায়ামের ক্ষেত্রে সঠিক পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষা প্রশিক্ষণ পুনর্মূল্যায়ন এবং নতুনভাবে সংকলিত হওয়া উচিত। জাতীয় পরিষেবা পরিকল্পনা, স্কাউট এবং গাইডও এন. সি.সি এর কর্মসূচীর মধ্যে এই সমস্ত বিষয় অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে যুক্ত করার নিশ্চয়তা আবশ্যিক।

সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সর্বস্তরে যেমন, নীতি রচনার ক্ষেত্রে প্রশাসকদের মনে, বিদ্যালয়ে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদের মনে, স্বাস্থ্য বিভাগ, পিতামাতা এবং শিশুদের মনেও, এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অনুগামিতার প্রবর্তন অত্যন্ত প্রয়োজন। স্বাস্থ্য এবং শারীরিক শিক্ষাকে মূল এবং আবশ্যিক হিসাবে স্বীকৃতিদানের পরেই বাস্তবে অনুশীলনের যন্ত্রপাতি, ক্রীড়া এবং যোগব্যায়ামের নির্দেশক নিয়োগ এবং ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট মানুষজন যেন নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসেন বিষয়টিকে নিশ্চিত করা যাবে এবং এর জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। এছাড়া মাধ্যমিকের পরের +২ স্তরে একে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে যুক্ত করতে হবে।

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে যে শারীরিক, মনোঃসামাজিক এবং মানসিক দিকগুলি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে 'প্রয়োজন ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি' আমাদের পথ নির্দেশ করতে পারে। কিন্তু এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাত্রাটি হল, খেলা, ব্যায়াম, একক এবং দলগত স্বাস্থ্যচর্চার সঙ্গে বাস্তব সংযুক্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্য, দক্ষতা এবং শারীরিক গঠনের বিকাশ এবং তার অভিজ্ঞতা। স্বাস্থ্য এবং একসাথে বসবাসের একক ও দলগত দায়িত্বের বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। প্রজনন এবং শিশু স্বাস্থ্য, HIV বা এইডস্, যক্ষ্মা এবং কাল্পনিক রোগ সংক্রান্ত বেশ কিছু জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচীতে এগুলির প্রতিরোধের উপায় হিসাবে শিশুদের বেছে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান পাঠক্রমের মধ্যে এগুলিকে নিছকই জুড়ে না দিয়ে এই সব কর্মসূচীর মধ্যে শিশুর প্রতি যে যে দাবি সেগুলিকে সংহত করতে হবে।

আনুষ্ঠানিকতার বাইরের পদ্ধতিতে, প্রাথমিক স্তর থেকেই যোগব্যায়াম চালু করা যেতে পারে। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই যোগ ব্যায়াম শুরু হবে। স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সমস্ত মধ্যস্থতায় শিশুদের জীবনের বাস্তব এবং পরীক্ষামূলক মাত্রার ওপর অবশ্যই আস্থা রাখতে হবে। স্থানীয় অঞ্চল থেকে খেলা এবং দৌড় প্রতিযোগিতার সংযুক্তির জন্য আরো বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

বিদ্যালয়ের পড়ার ঘণ্টার আগে-পরে অন্তত ব্লক স্তরেও খেলার বিশেষ বিশেষ কর্মসূচীর জন্য বিদ্যালয়ের পরিসরকে ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া সম্ভব। এতে বিশেষ প্রতিভাশালী শিশু তারা যেন এ সময়ে কিংবা লম্বা ছুটির মধ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য যাতে এখানে আসতে পারে তার ব্যবস্থা থাকবে। খেলার এই সব সুযোগসুবিধা এমনভাবে বাড়িয়ে তোলা সম্ভব যাতে অবকাশের সময় খেলাধূলা করার জন্য আরো বেশি সংখ্যক শিশু এখানে আসে এবং তাদের একসঙ্গে কোন দলগত খেলা যেমন বাস্কেট বল, বলা ছোঁড়া, ভলিবল এবং নানা স্থানীয় খেলায় যুক্ত করা যায়।

### ৩.৭. কর্ম এবং শিক্ষা

শ্রম বলতে সাধারণ ভাবে কোনো কিছু করা বা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত কর্মকাণ্ড বোঝায়। প্রতিদানের আর্থিক বা অন্য কোনো রূপ যেটি কোনো মানুষের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সহজলভ্য সেই সংক্রান্ত ক্ষমতা বা দক্ষতা গড়ে তোলার অর্থ হল শ্রম। এমন সব কর্মকাণ্ডের অনেকগুলি খাদ্য এবং প্রাত্যহিক ব্যবহার জিনিসপত্র উৎপাদন, মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার দেখাশুনা করা, এবং সমাজের পরিচালন ও সংগঠন সম্পর্কিত অন্যান্য কাজকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই দুটি প্রাথমিক স্তরের সঙ্গে (জিনিসপত্র উৎপাদন এবং সুষ্ঠপরিচালন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা), কোনো সমাজে অন্যান্য যেসব কাজকর্ম মানুষের সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় অবদান রাখে তাদেরও এক অর্থে শ্রমের একটি রূপ হিসাবে গণ্য করা হয়।

এই ভাবে অর্থ অনুধাবন করলে, শ্রম হয়ে ওঠে সমাজ ও / অথবা গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যাদের সম্পর্কে একটি দায়ভার, কেননা তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ আপন কাজ এবং ক্ষমতা উজাড় করে দেয়। দ্বিতীয়ত বোঝা

যায় যে, কর্মের মাধ্যমে অন্যের যা অবদান সেটি কার্য সম্পাদনের গণ আদর্শের সামনে পেশ করতে হবে আর এইভাবে অন্যেরা এর মূল্য নির্ধারণ এবং বিচার করবে। তৃতীয়ত, সামাজিক জীবনের কর্ম সম্পাদনে শ্রম এমনভাবে তার সাক্ষর রেখে যায়, যার ফলে বেঁচে থাকা সম্ভব করতে কিছু উৎপাদিত হয় অথবা সাধারণভাবে সামাজিক পরিচালনের সাহায্য পাওয়া যায়। পরিশেষে, প্রশংসা এবং আনন্দ লাভের নতুন মাত্রা উন্মুক্ত করে শ্রম মানবজীবনকে সমৃদ্ধ করে।

অবশ্য সেই সব শিক্ষা যে প্রায়শই সামাজিকভাবে পক্ষপাতমূলক রীতি ও মূল্যবোধে অভ্যস্ত এবং সেই সব পূর্ণবয়স্ক মানুষেরা যে আধিপত্য বিস্তারী সমাজ-সংস্কৃতিক ব্যবস্থাপনার অভ্যন্তরে শিশুদের সমাজের একজন করে তোলেন এসব কথা আমাদের ভুললে চলবে না। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এবং একজন শিশু উভয়ের সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া যে একই ভাবনার স্বীকৃতি প্রয়োজন। একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত দমনপীড়নের মধ্যে জঘন্যতম হল, বাধ্যতামূলক শ্রমিক হিসাবে কাজ করা। পাঠ্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে শ্রমের প্রবর্তনায় যাতে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, যেখানে অনিচ্ছুক শিশুদের ওপর জোর করে কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অথবা এই বিশেষ কীজই হল শিশুর শিক্ষা ও সাধারণ বিকাশ ও উন্নতি পতিবন্ধক হয়ে উঠছে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন পন্থার পর্যাপ্ত স্থান থাকতে হবে। বর্ণ বা লিঙ্গের ভিত্তিতে কর্মবিভাজন করে উৎপাদন বা কাজের স্বার্থে নিয়মমাফিক এবং পুনরাবৃত্তি কাজের দায় চাপিয়ে-দেওয়া কঠোরভাবে পরিহার করতে হবে। কাজকে পাঠ্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তোলার উদ্দেশ্য সফল করার ক্ষেত্রে, একজন শিক্ষক নিজে কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করে শিক্ষার্থীকে দিয়ে কাজটি করিয়ে নেবেন এমন মানসিকতা মোটেই অভিপ্রেত নয়। বিদ্যালয়ের মধ্যে শ্রমের অন্তর্ভুক্তিকে কখনোই শিশু-শোষণের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যবহার করা চলবে না।

বাড়িতে, বিদ্যালয়ে, সমাজে অথবা কর্মস্থলে যেখানেই শিশু থাকুক না কেন, শ্রম হল তার শিক্ষালাভের আর একটি ক্ষেত্র। কাজ করার ধারণাটি শিশু একেবারে শৈশবে দুবছর বয়সকালেই আত্মস্থ করতে শুরু করে। শিশুরা বড়দের নকল করে এবং কাজ করার ভান করতে ভালোবাসে তারা। যেমন একেবারে ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা ঘর 'ঝাঁট' দেওয়া, বা 'মিটিং' করা অথবা 'বাড়ি তৈরি' কিংবা রান্না করার ভান করছে এমন দৃশ্য মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অনেক শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় কাজকে শিক্ষাদানের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। উদারহণ স্বরূপ, মন্টেসরি পদ্ধতিতে শিক্ষায় একেবারে সূচনাপর্ব থেকেই কাজের ধারণা এবং দক্ষতা পরম্পরের অবিচ্ছেদ্যাংশ। তরিতরকারি কাটা, শ্রেণী কক্ষ পরিষ্কার করা, বাগান করা এবং কাপড় ধোওয়া সবই শিক্ষাদানের চক্রের অন্তর্গত। শিশুর বয়স এবং সক্ষমতা বিচার করে যে কাজগুলি তার ক্ষেত্রে উপকারী হিসাবে বিবেচিত হয় এবং সেগুলি শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং বিকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাক্ষর রাখতে পারে, যেগুলি শিশুর জীবনে প্রবর্তিত হলে, মূল্যবোধ, মৌলিক বৈজ্ঞানিক ধারণা, দক্ষতা এবং সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুকে সক্ষম করে তুলতে প্রভূত সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। কাজের মাধ্যমে শিশুরা নিজস্ব পরিচিতি লাভ করে এবং কাজ যেহেতু জীবনে একটি অর্থবহতা যুক্ত করে, তাদের সমাজের সদস্যপদ দেয় এবং জ্ঞান নির্মাণে সক্ষম করে তোলে, সে কারণে তারা নিজেদের উৎপাদনক্ষম এবং উপযোগী ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করে।

কাজের মাধ্যমে একজন মানুষ সমাজে তার স্থান অনুসন্ধান করতে শেখে। এটি এমন এক শিক্ষামূলক ক্রিয়া যার মধ্যে সংযুক্তির সহজাত ক্ষমতা রয়েছে। অথএব, শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে উৎপাদনশীল কাজে যুক্ত হওয়ার অভিজ্ঞতায় একজন মানুষ তার সামাজিক জীবন এবং সমাজে যে বিষয়গুলি মর্যাদা এবং প্রশংসার যোগ্য সেগুলিকে অবশ্যই মূল্য দিতে শেখে। কাজের সংজ্ঞার মধ্যেই যেহেতু কয়েকটি অর্জিত লক্ষ্য থাকে, যার ফলে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার একটি জাল রচিত হয়, সেকারণে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে, অধিকতর আত্মনিয়ন্ত্রণ, মানসিক শক্তির প্রতি কেন্দ্রীভূত মনোযোগ এবং আবেগ-নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা সৃষ্টি করার জন্য উদ্যোগ নেবার সুযোগ এক্ষেত্রে রয়ে যায়। দক্ষতা

অর্জন এবং আত্মশৃঙ্খলা শিক্ষার উপায় হিসাবে কাজকে, বিশেষ করে কোনো কাজ সুন্দরভাবে শেষ করার সঙ্গে যে দক্ষতার প্রশ্নটি জড়িয়ে থাকে, তাকে অনেকক্ষেত্রে যথেষ্ট কম মূল্য দেওয়া হয়। জড়বস্তু (যেমন কাদামাটি বা কাঠ নিয়ে নাড়াচাড়া করার বিদ্যা অনেক বেশি কার্যকর এবং মানুষ হিসাবে অন্য মানুষের বিষয়ে চর্চার যে বিদ্যা তার থেকে গুণগত মানে পৃথক। জড় উপাদান এবং অন্য মানুষ (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উভয়ের) -এর সঙ্গে ভাব-বিনিময় যে কাজে সংশ্লিষ্ট, সেখানে প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ ও সামাজিক সম্পর্কগুলির বাস্তব জ্ঞান বর্ধিত হয় এবং এদের বিষয়ে গভীরতর বোধ জন্মায়। পরবর্তীকালে জীবিকা অর্জনের উপায় হয়ে উঠতে পারে এমনভাবে একটি পেশা-শিক্ষায় সাধারণত যে শারীরিক দক্ষতা যুক্ত থাকে, উপরোক্ত সমস্ত শিক্ষাই তার সঙ্গে একটি সংযোজিত অংশ হিসাবে গণ্য হয়। এখনে উল্লিখিত কাজের ধারণাটি মূলত কাজের অর্থ-নির্ণয় এবং জ্ঞাননির্মাণ সংক্রান্ত মাত্রার প্রতি আমাদের বিদ্যাশিক্ষার এই জাতীয় কর্মকাণ্ডের ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে কাজ যদি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে কর্মশিক্ষায় এ জাতীয় সুফল লাভ করা যায়। একটি শিক্ষাব্যবস্থায় অনুসৃত কর্মশিক্ষায় যখন কাজের প্রকৃতি বদলের সম্ভাবনার ক্ষেত্রটি উন্মুক্ত থাকে, তখন সৃজনশীলতা এবং অনুধাবনের নতুন নতুন আঙ্গিক উদ্ভবের উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা সেই শিক্ষায় থাকে। ভারতের বেশিরভাগ পরিবারে গৃহস্থালি কাজ এবং পারিবারিক পেশা জীবিকা নির্বাহের একটি উপায়। অথচ তথ্য মনে রাখার এই দুরন্ত প্রতিযোগিতায় এবং শিশুদের সময়ের বেশির ভাগ অংশে বিদ্যালয়ের চাপের কারণে কর্ম সংযুক্তির এই ধাঁচটি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। সে কারণেই এই কর্মশিক্ষা আরো বেশি আবশ্যক হয়ে উঠছে। শিক্ষাগত ক্রিয়াকলাপের প্রবণতাই হল সবখিছুতে একটা নির্দিষ্ট প্রথামাফিক বিষয়পাঠের সীমানায় বন্দী করে তোলা। পুঁথির শিক্ষা এবং হাতে কলমে কাজ পর্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট হলে, অনুসৃত শিক্ষার পদ্ধতি এবং কাজের হাতিয়ার উভয়ক্ষেত্রেই অধিকতর সৃজনশীলতার সম্ভবনা থাকে। ফলে সহযোগিতার মনোভাবের বৃদ্ধি ঘটতে পারে। বিষয়টি হল, কেমন করে কয়েকটি দক্ষ হাত পাম্পের নকশা করে ফেলল। অনেক উঁচুতে উড়ে-যাওয়া পলিথিনের বেলুনগুলো চরম শীতলতম স্ট্রাটোস্ফিয়ারের মধ্যে দিয়ে যাবার সময়েই ফেটে যেত যতদিন পর্যন্ত না, একজন বিজ্ঞানমনস্ক শ্রমিক এই প্রস্তাবনা দিল যে, রঙের মধ্যে সামান্য কার্বন গুঁড়ো দিলেই তা সূর্যের আলো শুষে নিয়ে বেলুনটিকে উষ্ণ থাকতে সাহায্য করবে। বস্তুত সমস্ত মহৎ উদ্ভাবকেরাই ছিলেন মিস্ত্রি যারা বিজ্ঞান প্রায় জানতেনই না। এডিসন, ফোর্ড, ফ্যারাডে সকলেই এই শ্রেণীভূক্ত এবং প্রথম যাঁর চশমাম ও দূরবীক্ষণ উদ্ভাবন করেছিলেন তাঁরাও রয়েছেন এঁদের সঙ্গে। আমাদের মৃৎশিল্পী, হস্তশিল্পী, তন্তুবায়, কৃষক এবং বৈদ্যের দল যে এই পথ অনুসরণ করেই নিজেদের বিকশিত করেছেন, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিগত স্তরে পর্যায়ক্রমে শারীরিক শ্রম এবং বৌদ্ধিক চিন্তনে যুক্ত ছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় উদ্ভাবন, কৌতূহল এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার এহেন সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটানো প্রয়োজন।

অবশ্য বিদ্যালয়গুলি বর্তমানে তাদের কাঠামোগত বা শিক্ষণসংক্রান্ত উপাদানের নিরিখে পাঠ্যক্রমের একটি অংশ হিসাবে কর্মশিক্ষাকে যুক্ত করারও উপযুক্ত নয়। কাজ বা কায়িক শ্রম আবশ্যিক রূপে একটি আন্তঃবিষয়ী কর্মকাণ্ড। সুতরাং বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে কাজ বা কর্মশিক্ষাকে যুক্ত করতে গেলে, কীভাবে এটি শিক্ষার একটি অংশ হিসাবে যুক্ত হবে এবং এর মূল্যবান বিচার ও মূল্যায়নের পদ্ধতি কী হবে, সে বিষয়ে শিক্ষণ সংক্রান্ত প্রভূত পরিমাণ অনুধাবন ও বোধ প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে কাজকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করতে এমন সৃজনশীল এবং বলিষ্ঠ চিন্তনের প্রয়োজন যে চিন্তন সামাজিক ভাবে উপযোগী এবং উৎপাদনশীল শ্রম (SUPW) সংক্রান্ত পড়ার ঘণ্টা যার সম্পর্কে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই ন্যায্যত সন্দিহান, সেই পড়ার সময়ের গতানুগতিক অবস্থান ভেঙে ফেলতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন যে কেমন করে প্রান্তিক শিশুদের কাজ সম্পর্কিত সমৃদ্ধ জ্ঞান ও দক্ষতার বলিষ্ঠ ভিত্তি তাদের আত্মমর্যাদার উৎস এবং অন্যান্য শিশুদের শিক্ষার ভাণ্ডার হয়ে উঠতে পারে। আপন সাংস্কৃতিক মূল থেকে

মধ্য-উচ্চবিত্ত শ্রেণীর শিশুদের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা এবং এই প্রক্রিয়ার প্রকোপ আরো বৃদ্ধি ও ত্বরান্বিত করতে শিক্ষাব্যবস্থা যে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে তারই পরিপ্রেক্ষিত্রে এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের শক্তিশালী উপায় হিসাবে সমাজের বিশাল উৎপাদনক্ষম অংশের জ্ঞানের ভিত্তিকে কাজে লাগানোর প্রভূত ক্ষমতা এর আছে। নারীদের এবং প্রতিপত্তিহীন অংশের অবদান যাকে সমাজে মূল্যবান সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয় তার অদৃশ্যমানতা পুনর্বিচার করার ক্ষেত্রে বৈধ জ্ঞান হিসাবে দৃষ্ট শিক্ষার অনুমোদন পাওয়া যায়। সাধারণভাবে বিদ্যালয় শিক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বি এবং তথ্য-কেন্দ্রিক 'পুঁথিগত' চরিত্রটির শক্তিশালী সংশোধক হিসাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রমের প্রাণকেন্দ্রে উৎপাদনশীল শ্রমের একটি স্থান প্রয়োজন এবং এই শ্রম শিশুদের জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে শেষোক্ত শিক্ষাকে সংযুক্ত করতে সাহায্য করে। শৈশব এবং বয়ঃসন্ধিকালের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রমকে কাজে লাগিয়ে বিবিধ বিষয়ে শিক্ষার অভিজ্ঞতা একটি কার্যকর এবং যুক্তিবিকাশী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। এইভাবে জীবিকা-শিক্ষার থেকে 'শ্রমকেন্দ্রিক শিক্ষা' পৃথক হয়ে যায়।

জ্ঞান সঞ্চয়, মূল্যবোধের বিকাশ এবং বিবিধ-দক্ষতা গঠনে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে শ্রমের শিক্ষাদানের ক্ষমতা অনুধাবন করে প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সমস্ত বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের পুনর্বিন্যাস করা উচিত। শিশু যত পরিণত হয় ততই কাজের জগতের জন্য তার প্রস্তুতির প্রয়োজনকে পাঠ্যক্রমে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। আর ক্রমবর্ধমান জটিলতায় এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় নমনীয়তা ও বিষয়সম্পদে সর্বদা-সমৃদ্ধ একটি শ্রমকেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। শিক্ষার সমস্ত স্তরে এক গুচ্ছ কর্মসংক্রান্ত বর্গীয় সক্ষমতা (বুনিয়াদি, আন্তর্ব্যক্তিক এবং পদ্ধতিগত) সর্বদাই অনুসৃত হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তন, শিক্ষার স্থানান্তরণ সৃজনশীলতা, ভাব বিনিময়ী দক্ষতা, নান্দনিকতা, কর্মমুখীনতা একত্রে কাজের শ্রম নৈতিকতা এবং উদ্যোগপতিত্ব তথা সামাজিক দায়বদ্ধতা। এর মূল্যায়নের জন্য বিচার্য ধ্রুবকসমূহের পুনর্বিন্যাস ব্যতিরেকে, UEE (এবং পরবর্তী কালের সার্বিক মাধ্যমিক শিক্ষাও সফল হওয়া সম্ভব নয়।

### ৩.৮. শান্তির শিক্ষা

অদৃষ্টপূর্ব মাত্রা হিংসা এবং সেই সঙ্গে অসহিষ্ণুতা, ধর্মীয় উন্মত্ততা, বিরোধ এবং মতভেদের আঘাতে বিপজ্জনক এক সময়ে আমরা বাস করছি। নৈতিক কাজ, শান্তি আর কল্যাণ এখন নব নব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী। অ-মীমাংসিত দ্বন্দ্বের কারণেই যুদ্ধ ও হিংসার ঘটনা ঘটছে, যদিও যে-কোন বিরোধী সর্বদা হিংসা ও যুদ্ধের পথে পরিচালিত হতে পারে না। বিরোধের অসংখ্য সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার একটি হল হিংসা। অহিংস দ্বন্দ্ব-নিরসনকারী দক্ষতাকে পুষ্ট করা যেতে পারে এবং ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং দেশের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে গঠনাত্মক রূপে এটি প্রযুক্ত হতে পারে। সারা পৃথিবীতে, দেশে এবং অঞ্চলে হিংসার যে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা, রুচি বিস্তৃত হচ্ছে সেটিকে বিশেষরূপে অনুধাবন করেই বর্তমান পাঠক্রমে শান্তি-শিক্ষায় একটি বাধ্যতামূলক সুস্পষ্ট পরিসর রয়েছে। শান্তি, সহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার, আন্ত-সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া এবং নাগরিক দায়িত্ব গড়ে তোলার দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ার তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা হল শিক্ষা। অবশ্য বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যেভাবে শিক্ষাদানকর্ম সম্পাদিত হয় তাতে প্রায়শই বাস্তবে এবং সংকেতে হিংস্রতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষাকে পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজন এবং সে কারণেই বিদ্যালয় পাঠক্রম সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয়। মূল্যবোধের নিরিখে এই শিক্ষা অন্য সমস্ত পাঠক্রমের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করবে এবং সেখানে যে মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে মিলে মিশে থাকবে। অতএব এটি সমস্ত পাঠক্রমেরই ভাবনার বিষয় এবং সমস্ত শিক্ষকেরও।

শান্তির শিক্ষায় নৈতিক বিকাশের পুষ্টি এবং সেই সঙ্গে মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রকৃতিসহ একে অপরের সঙ্গে একই সূত্রে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা সংক্রান্ত ধারণা প্রোথিত করার ইচ্ছা ব্যক্ত হয়। বাঁচার আনন্দ এবং ভালোবাসা, সাহস ও আশা এই ত্রিবিধ গুণাবলীর সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বিকাশ এই শিক্ষার অঙ্গীভূত। মানবাধিকার, ন্যায়, সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা, সামাজিক দায়িত্ব, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান এবং সেই সঙ্গে গণতন্ত্র এবং বিরোধ নিষ্পত্তির অহিংস সমাধানের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার একে ঘিরে থাকে। শান্তি-শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সামাজিক ন্যায়। সাম্য এবং সামাজিক ন্যায়ের বিষয়ে উদ্বেগের ফলশ্রুতিতে সর্বহারা, দরিদ্র এবং কম সুবিধাভোগীদের শোষণ না করার অত্যন্ত চর্চায় একটি অহিংস সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা, এটিই হল শান্তিশিক্ষার উৎকর্ষতার নিদর্শন। অনুরূপে, শান্তি সংক্রান্ত ধারণার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানবাধিকার। ব্যক্তি মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হলে কখনোই শান্তি স্থাপিত হতে পারে না। মানবাধিকারের বুনিয়াদি বিষয় হল নিরপেক্ষতা ও সাম্যের মূল্যেবোধ, সমাজে শান্তির সংস্কৃতি নির্মাণে যাদের বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। এই সময় বিষয়ই অন্তসম্পর্কিত। সেকারণে শান্তি শিক্ষায় একরাশ পরস্পর সমাপতনী মূল্যবোধ আছে। শান্তিশিক্ষাকে এমনই এক ভাবনার বিষয় হয়ে উঠতে হবে যাতে সমস্ত বিদ্যালয় জীবনেই— পাঠক্রম, সহ পাঠক্রম, শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ, বিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থা, শিক্ষক -ছাত্র সম্পর্ক, শেখা ও শেখানোর প্রক্রিয়া এবং বিদ্যালয় কর্মকাণ্ডের প্রতিটি তুচ্ছ বিষয়ে এর মূল স্রোত বহবান থাকবে। অতএব পাঠক্রমের প্রতিটি অংশে এবং পরীক্ষা ব্যবস্থায় অত্যন্ত মনোযোগী অনুসন্ধান চালাতে হবে। বুঝে নিতে হবে, কীভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে শিশুদের অপূর্ণতা হতাশা অসন্তোষ এবং নিরাপত্তাহীনতা কাটিয়ে তোলা যায়। চারপাশের ক্রমবর্দ্ধমান হিংস্রতা, নানান দৃশ্য ও সংবাদ মাধ্যমে তার উপস্থাপনা, শিশুদের মনে যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় তার বিরুদ্ধে নিয়ত সচেতন প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার। আর তার বিপরীতে শিশুর মনে নৈতিক এবং শান্তিময় জীবনের গভীরবোধ প্রতিফলিত করতে হবে। প্রকৃত অর্থে শিক্ষা একজন ব্যক্তি মানুষকে সচেতন এবং স্বেচ্ছাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং তার কৃতকর্মের সমস্ত ফলাফল বহন করার শক্তি অর্জনে সক্ষম করে। মানুষ নিজের সমস্ত মূল্যবোধকে বিশ্লেষণ করতে পারে; হিংসার বিপরীতে সে শান্তির উপভোক্তা হয়ে ওঠার পরিবর্তে শিক্ষা ব্যক্তি মানুষকে শান্তির নির্মাতা করে তোলে।

**শান্তি সচেতনতার কর্মকাণ্ড**

**৫ বছর + সযত্ন ব্যবহার ঃ** শিশুদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাতে হবে। তাদের হাতে কলা কিংবা অপরাজিতা কিংবা সেগুন গাছের একটা পাতা দিয়ে বলতে হবে যে, এই পাতাটা মাথার ওপর দিয়ে পর পর একেবারে সারির শেষে পৌঁছে দিতে হবে। পাতাটি একেবারে শেষ সারিতে পৌঁছোবার পর আবার একজন শিশু সেটিকে সামনে আনবে আবার নতুন করে খেলা শুরু হবে। এরপর এইভাবে দেওয়া নেওয়ার ফলে পাতাটির কী ক্ষতি হয়েছে সেটি তাদের দেখাতে হবে। এই খেলা থেকে পাতাটির বিষয়ে আলাপ আলোচনা শুরু হতে পারে অথবা যে গাছের পাতা তার কথাও আসতে পারে। শেষ পর্যন্ত আলোচনার সূত্র এইখানে পৌছে যাবে যে একটা পাতা নষ্ট করার অর্থ প্রকৃতির ক্ষতি করা। পাতা হল সমগ্র সৃষ্টির প্রতীক।

**৭বছর + অনুভূতির বিনিময় ঃ** শিশুরা গোল হয়ে বসবে তারপর তাদের প্রশ্ন করা হবে ' তোমার জীবনে সবচেয়ে সুখের দিন কোনটি? কেন সে দিনটি সুখের?' প্রতিটি শিশুকেই উত্তর দিতে হবে। অন্যদের উৎসাহিত করার জন্য কয়েকজনকে একাধিক অভিজ্ঞতার কথা বলতে দিতে হবে। পারস্পরিক অনুভূতির বিনিময়ে শিশুরা স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠলে তখন তাদের কঠিন প্রশ্ন করা যাবে যেমন, 'সত্যি সত্যি কীসে তুমি ভয় পাও? কেন এরকম মনে হয়? অন্যদের মারামারি করতে দেখলে তোমার কী মনে হয়? কেন এমন মনে হয়?' সত্যিই কিসে তোমার মন খারাপ হয়? কেন হয়?'

**১০বছর + অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয় ঃ**পৃথিবীতে অন্যায়ের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি আছে সেকথা ব্যাখ্যা করতে হবে। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি হল এই ন্যায়। অন্যায়ের অনেক উদাহরণ দিতে হবে। তারপর প্রশ্ন করতে হবে ' এই অন্যায়ের কারণ কী? ঐ একই পরিস্থিতিতে তোমার কী মনে হবে?' শ্রেণীর বাকি শিশুদের সঙ্গে উত্তর বিনিময়ের জন্য কয়েকজনকে একত্র করা হবে।

**১২বছর + শান্তির স্বপক্ষে সওয়াল ঃ** শিশুদের বলতে হবে যে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের শান্তির স্বপক্ষে আইনজীবী করা হয়েছে। পাঁচটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন ব্যাখ্যা করে এই বিষয়ে তাদের মতামত চাওয়া হবে। এ বিষয়ে তোমার কী প্রস্তাব? অন্যদের কোন প্রস্তাবটি তুমি তালিকায় রাখতে চাও? কোনগুলি তুমি গ্রহণ করবেই না? কেন করবে না?

## ৩.৮.১ কর্মনীতি

নৈতিক বিকাশের অর্থ শিশুদের ঘাড়ে 'এটা করো' 'এটা কোরো না'-র বোঝা চাপানো চলবে না। বরং শিশুরা যাতে সঠিক নির্বাচনের পদ্ধতি শিখতে পারে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধের নিরিখে, সকলের জন্য কোনটা ভালো সেটা মনে রেখে কোনটা সবচেয়ে ভাল, কোনটা ঠিক, কোনটা দয়া সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সেজন্য তাদের নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এবং উপায়ে সাহায্য করাই এর উদ্দেশ্য।

শিশুরা যা কিছুই কানে শোনে প্রায় তার সবটুকুই বুঝতে পারে। কিন্তু অনেক সময় যা বলা হল আর যা করা হচ্ছে তাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সেটির সঠিক নিরসন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন কি বাড়িতে একটা তুচ্ছ অসম্মতি শিশুকে গভীরভাবে আহত করতে পারে। বড়দের মধ্যে একটা স্থায়ী অসন্তোষের মনোভাব কিংবা পিতামাতার মধ্যে সম্পর্কের ভাঙচুর তাদের মনে অপরিমেয় ভয় আর হতাশার সৃষ্টি করে। কয়েক বছর পর এগুলিই আবার ভয় আর প্রথম যৌবনে আক্রমণ হয়ে দেখা যায়। কেবলমাত্র পড়াশোনায় বিষয় ছাড়াও অন্যান্য অনেক বিষয়ে পিতামাতা এবং শিক্ষকদের মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তিত্ব বিকাশের দুরূহ দায়িত্ব পিতামাতা এবং বিদ্যালয় কারোর একার ওপর পুরোপুরি চাপানো যায় না।

নৈতিক বিকাশ বিভিন্ন বয়সি গোষ্ঠীর চরিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন গড়ন অনুসরণ করে। প্রাথমিক শিক্ষার সময়কালে শিশুরা তখন তাদের সদ্য-পরিচিত পরিবেশকে আবিষ্কার করছে তাদের মনে আত্মবোধের সচেতন বিকাশ ঘটেছে। সে সময়ে তাদের আচার-আচরণ শাস্তি এড়ানো আর পুরস্কার পাওয়াকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। তাদের গুরুজনেরা কোনটি অনুমোদন করেন বা করেন না তারই ভিত্তিতে তাবা ভালো বা মন্দ, ঠিক অথবা ভুল সংক্রান্ত তাদের ধারণা গড়ে তোলে। এই পর্যায়ে, পরিণত বয়স্কদের যেসব আচার-আচরণ এবং যা যা কাজ করতে দেখে তারই নিরিখে অতি দ্রুত তারা আপন নৈতিক ব্যবহারের বোধ গড়ে তোলে।

শিশু যত বড়ো হয়, ততই তার যৌক্তিক দক্ষতা বিকশিত হয়। অবশ্য, তখনো পর্যন্ত অনুমান এবং বিধির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার মতো যথেষ্ট পরিণত সে হয়ে ওঠেনি। অন্যকে চমকে দেওয়া এবং কঠিন ও সক্ষম ব্যক্তিমানুষ হিসাবে আপন আত্মরূপ বৈধকরার প্রয়োজনে উদ্দীপ্ত হয়ে তারা নিয়ম লঙ্ঘন করতে চায়। এই পর্যায়ে নিয়মকানুন, বিধিনিষেধ, বাধা, কর্তব্য আর দায় ইত্যাদির ভিত্তিতে উৎসারিত প্রতিক্রিয়াকে উৎসাহিত করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমষ্টির ভালো, সংযমের মূল্য, আত্ম ত্যাগ, করুণা ইত্যাদি গুণাবলী যা মানুষ হয়ে ওঠার নৈতিক উপায় গড়ে তোলে, তাদের মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি তৈরি করতে হবে।

তবুও পরে যখন বিমূর্ত চিন্তন সম্পূর্ণ বিকশিত হয়, তখন একজন ব্যক্তিমানুষ যে সমস্ত আচরণকে নৈতিক আচরণ বলা হয় তাদের উত্তম-যুক্তিনিষ্ঠ বিচার করতে পারে। এর ফলে সে নৈতিক নীতিসমূহের বিশ্বজনীন রূপ এবং তাদের গ্রহণযোগ্যতার পথে পরিচালিত হয়, যেটি দীর্ঘসময় কালের পরিসর অবাধ টিকে থাকতে পারে। এমনকি বাইরের কোন কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতেও, নৈতিকতায় পরিণত ব্যক্তিমানুষ ন্যায়সংগত এবং সঠিক আচরণ করতে পারে, নিয়মকানুন, বিধির ভিত্তি বুঝতে পারে এবং সমাজে সামগ্রিকভাবে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে এদের কী কী অবদান সে বিষয়ে সপ্রশংস মনোভাব গড়ে তুলতে পারে।

আমাদের প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকেরা দেখেছিলেন যে, একটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক শিক্ষা বা সামাজিক বার্তা পৌঁছে দেবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হল অল্প এবং ছোট ছোট সত্য-কাহিনী। এরই সঙ্গে বিশ্বজনীন সত্য হল এই যে, প্রতিটি শিশু বাড়ির জীবনে তারা যতই হাঁদা বা ঝিমিয়ে পড়া হোক না কেন, তাদের প্রত্যেকের চলবার মতো কিছু কথা আছে; আছে এমন কিছু অর্ন্তদৃষ্টি, শ্রেণী- আলোচনায় যার অবদান সে রাখতে পারে। এই শিশুদের খোলস থেকে বার করে আনা শিক্ষক/শিক্ষিকার কাজ। শিশুদের আস্থা অর্জন করতে হবে তাঁদের এবং ভয় দেখানো ভাষা বা শত্রুতাপূর্ণ শরীরী-ভাষা পরিহার করতে হবে।

শিক্ষাদানের মূল্য অর্থে প্রায়শই প্রত্যাশিত আচরণের প্রেরণার কথা বলা হয়। 'বোধক' এবং মেনে না নেওয়া অনুভব এবং ইচ্ছার দমন ও বর্জনের অর্থেও কথাটা বলা হয়ে থাকে। এর ফলে প্রায়শই শিশুরা তাদের মনের প্রকৃত অনুভব, ইচ্ছা, চিন্তা ও বিশ্বাস গোপন করে এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও ভাবনার প্রতি কোনো দায় স্বীকার না করেই নিছকই তোতাপাখির মতো কথাগুলো বলে যায়। যাই হোক নৈতিক আচরণ সম্পর্কে একটি অতিসরলীকৃত দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে নিছক কথার কথা থেকে এই উচ্চারণকে অভিজ্ঞতা এবং সপ্রতিভতার অর্থপূর্ণ আলোচনায় পর্যবসিত করা প্রয়োজন। এছাড়াও মানুষের আচরণ ও কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জটিল মনোভাব ও নৈতিক দ্বন্দ্বের সন্ধান করতে হবে এবং এদের বুঝতে হবে।

বিদ্যালয়ে পঠিত বিষয়বস্তুর উপাদান এবং শিশুর বিকাশশীল পর্যায়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে শান্তি-সম্পর্কিত মূল্যবোধের গুরুত্ব প্রচার করা এবং তাদের প্রসারের জন্য শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের সচেতনভাবে উদ্যোগী হতে হবে। যেমন, কোনো একটি বিষয় পড়ানোর সময়, ইতিবাচক অনুভব জাগ্রত করার যথাযথ কৌশল ব্যবহার করে, মূল্যবান প্রতিক্রিয়া-সৃষ্টিকারী অভিজ্ঞতাসমূহকে চিহ্নিত করে, শান্তি-সম্পর্কিত মূল্যবোধ সমূহের ধারণার সন্ধান আবিষ্কার এবং নির্মাণের ক্ষেত্রে পাঠের গোপন উপাদানগুলির সুবিধা শিক্ষক/ শিক্ষিকা সহজেই কাজে লাগাতে পারেন। বিবিধ কৌশল যেমন প্রশ্ন, গল্প, ক্ষুদ্র সত্য কাহিনী, খেলাধুলা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আলাপ-আলোচনা, মূল্যবোধের ব্যাখ্যা উদাহরণ, উপমা, রূপক, ভূমিকা পালন এবং উদ্দীপনা শিক্ষা দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে শান্তির কথা প্রচারে সহায়ক। নীতির চর্চা এবং শিক্ষা ব্যক্তিগত স্তর থেকে সামাজিক ও গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক চিন্তনে প্রসারিত হয় এবং তারপর বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্গে যুক্ত হয়। শান্তির দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষক এই মাত্রায় প্রতিফলিত হয় এমন সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন এবং এদের মধ্যে আন্তঃ-যোগসূত্র সনাক্ত করতে পারেন। পাঠ্যসূচীতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে শান্তি শিক্ষার সূচনা করার বিষয় বিচার বিবেচনা করা উচিত।

**শান্তি কর্মসূচীর কিছু পরামর্শ**

বিদ্যালয়ে বিশেষ ধরণের ক্লাব ও পাঠকক্ষের প্রতিষ্ঠা যেখানে শান্তির সংবাদ এবং সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর একত্র সমাবেশ ঘটবে।

একগুচ্ছ সিনেমার একটি তালিকা প্রস্তুত করা — তথ্যচিত্র এবং কাহিনীচিত্র উভয়ই থাকবে যেগুলি

ন্যায় ও শান্তির কথা প্রচার করবে। মাঝে মাঝেবিদ্যালয়ে তাদের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

শান্তির স্বপক্ষে শিক্ষায় প্রচার মাধ্যমকে সঙ্গে নেওয়া। প্রভাবশালী সাংবাদিক, সম্পাদকদের আমন্ত্রণ জানানো যারা শিশুদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন। শিশুদের প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে হবে এবং তাদের মতামত মাসে একবার প্রকাশিত হবে।

ভারতের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় বিচিত্রতার উৎসব উদ্‌যাপন।

নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দায়িত্ববোধের মনোভাব গড়ে তুলতে কর্মসূচীর আয়োজন করা।

### ৩.৯ শিক্ষার আবাসভূমি

স্বাভাবিক আবাস হল এমন স্থান যেখানে কোনো প্রজাতি বিকাশের উপযুক্ত শর্তাবলীর সন্ধান পায়। প্রাণীজগতের সমস্ত প্রজাতির মধ্যে শেখার প্রক্রিয়াটি হল একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা। প্রাণীরা যেখানে খাদ্যের সন্ধান বা সামাজিক সঙ্গীসাথীদের দেখা পাওয়া অথবা শত্রুর মুখোমুখী হবার প্রত্যাশা করে সেখান থেকে সূত্র সংগ্রহ করে নিজেদের স্বাভাবিক আবাসের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রাণীরা শেখে। আমাদের পূর্বজন্মের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক আবাসের অনুসন্ধানেই এইভাবে আহরণ পর্ব শুরু হয়েছিল। কিন্তু পরিবেশের ওপর মনুষ্যজাতীর নিয়ন্ত্রণ যত বাড়তে লাগল এবং মানুষজন তাদের প্রয়োজনের সঙ্গে মানানসই করে প্রকৃতিকে যেহেতু বদলে নিতে লাগল, ফলে জ্ঞানের উপাদান এত বেশি কমে গেল যে, বর্তমানে প্রথাগত শিক্ষা বৃহদার্থে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক আবাস থেকে বিছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু পরিবেশের অবলম্বন অভূতপূর্ব হারে বেড়ে যাওয়ায়, আমাদের স্বাভাবিক আবাস সম্পর্কে আমরা যত্ন নেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করেছি। সুতরাং মানবজাতি অবশ্যই তার মূলটি অনুধাবন, স্বাভাবিক আবাসের সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপন, তাকে বোঝা এবং তার যত্ন নেবার উদ্যোগ নেবে। অতএব বিষয় এবং গূঢ়ার্থে 'স্বাভাবিক আবাস এবং শিক্ষা' শিরোনামটি পরিবেশ-শিক্ষার সমতুল্য।

বিভিন্ন নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়ের অংশ হিসাবে পরিবেশ-শিক্ষার উপাদানগুলি প্রসারের সাহায্যে এই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি সবচেয়ে ভালো উপলব্ধি করা যায়। তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য সেখানে যেন পর্যাপ্ত সময় থাকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও শরীরশিক্ষা, শিল্পকলা, সঙ্গীত ইত্যাদিবিষয়বস্তুর আলোচনায় অর্থপূর্ণ ভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত করা যেতে পারে। জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সংগঠিত কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীদের যুক্ত করার ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ উপায় হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, স্থান ও কালের ভিন্নতায় বৃষ্টিপাতে প্রভূত ভিন্নতা লক্ষিত হয়। এই ভিন্নতার পরিমাপক তথ্যসমূহ সহজলভ্য এবং পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতে অনেক চিত্তাকর্ষক কার্যকলাপে উৎসাহ দানের জন্য এগুলি ব্যবহৃত হতে পারে, পদার্থবিজ্ঞানে অমসৃণ অঞ্চলের ওপর তরলের প্রবাহের ধরন এবং সেই সঙ্গে কীভাবে বায়ুর ঊর্ধ্বগমনের জন্য আবহাওয়া শীতল হয়ে বৃষ্টিপাত হয় আর নিম্নগমনের ঠিক তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে, এসব নিরীক্ষণের জন্য সরল পরীক্ষাপদ্ধতি সন্ধান করা যেতে পারে। গণিতে দীর্ঘকাল যাবৎ, ধরা যাক ৫০ বছর সময় কালের বৃষ্টিপাত হ্রাসের রাশিমালার সযত্ন বিশ্লেষণে তথ্যরাশি উপস্থাপনা, নিরীক্ষণ ও ব্যাখ্যার সংক্রান্ত পরিকল্পনার চমৎকার সম্ভাবনা পাওয়া যেতে পারে। অনুরূপে আবর্জনা পরিস্রুতকরণ শিল্পের নিঃসৃত প্রবাহ রসায়নের বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া জীববৈচিত্রের উৎস এবং সংশ্লিষ্ট জ্ঞান নথিভুক্ত করার জন্য বিদ্যালয়গুলি পঞ্চায়েত, পৌরসভা এবং কর্পোরেশনগুলির সঙ্গে একযোগে কাজ করতে পারে। ওষধিলতার অবস্থান এবং ব্যবহার অথবা জলের গভীরে মাছেদের বিপন্নতার মতো আগ্রহের কিছু নির্দিষ্ট বিষয় চিহ্নিত করে বিদ্যালয়গুলি জীববিজ্ঞানে কর্মপরিকল্পনা নিতে পারে। শিল্পকলা, সঙ্গীত, নৃত্য, এবং হস্তশিল্পের মত

বিভিন্ন আঙ্গিকের মাধ্যমে পরিবেশ এবং এর নির্দিষ্ট রূপগুলি (প্রাণী অরণ্য, নদী, গাছপালা ইত্যাদি)-র গণ উপস্থাপনায় জৈববৈচিত্র্য সম্পর্কে মানুষের বোধ সুস্পষ্ট হয়। যেহেতু তপশিলী জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীসমূহ নিজেদের জীবনযাপনের ধারাটি টিকিয়ে রাখতে প্রায়শই প্রাকৃতিক জৈববৈচিত্র্যের ওপর নির্ভরশীল হয়, সেকারণে পরিবেশ সংক্রান্ত বোধ তাদের সদস্যদের জীবনে স্বাভাবিকভাবেই জড়িয়ে থাকে। এইসমস্ত জ্ঞানগুলি নথিভুক্তিকরণ হল মানুষের জৈববৈচিত্র নিবন্ধিকরণ গ্রন্থ প্রস্তুতির বাধ্যতামূলক অংশ এবং অত্যন্ত কার্যকর উপায়ে শিক্ষার্থীদের এই নিবন্ধগ্রন্থ প্রস্তুতির জন্য পরিকল্পিত কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা যেতে পারে। বন্য গাছপালা যেগুলি উপজাতি গোষ্ঠীর দৈনিক আহারে গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টির উপকরণ সরবরাহ করে, পুষ্টির ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা নির্ধারণকারী কর্মপরিকল্পনা স্বাস্থ্য শিক্ষার একটি মূল্যবান উপাদান হয়ে উঠতে পারে। অনুরূপে নিকটস্থ পরিবেশের মানচিত্র রচনা, পরিবেশ সংক্রান্ত ইতিহাসের দলিল প্রস্তুতি এবং পরিবেশ সংক্রান্ত রাষ্ট্রিক প্রশ্নের বিশ্লেষণ এইসবই, ভূগোল, ইতিহাস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কর্মপরিকল্পনার একটা অংশ হয়ে উঠতে পারে। স্থানীয়, রাজ্য, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে জলসংক্রান্ত বিরোধ জ্ঞানের এই জাতীয় বর্ণনার সঙ্গে যুক্ত কল্প-পরিকল্পনা ও বিবিধ কর্মকাণ্ড রচনার ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ উৎস হিসাবে কাজ করতে পারে।

## ৩.১০ পাঠ এবং মূল্যায়ণের পরিকল্পনা

সারা দেশে বিদ্যালয় বলতে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী বোঝায়। তবে কয়েকটি রাজ্যে এটি দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রসারিত। কিন্তু একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় বা নিম্ন-কলেজ স্তর বলা হয়। কয়েকটি বিদ্যালয়ে অবশ্য প্রাথমিক শ্রেণী শুরু হবার আগেই দুই থেকে তিন বছরের প্রাক-বিদ্যালয় স্তরের ব্যবস্থা আছে। কেবল প্রশাসনিক সুবিধার্থে নয়, আরো অন্য কারণে বিদ্যালয় জীবনকে চারটি পর্বে ভাগ করা হয়। পাঠক্রমের নকশা এবং শিক্ষকের প্রস্তুতির ভিত্তিতে এইসব স্তরের কিছু উন্নয়নমূলক বৈধতা রয়েছে। স্তরভিত্তিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে বিচার করলে, বর্তমানে 'একমাত্রিক' শ্রেণীকক্ষের যে পূর্বানুমিত ধারণা আমাদের মগজে বাসা বেঁধেছে সেখানে একই বয়সী শিশুদের একত্রিত হওয়া, শ্রেণী অনুযায়ী পড়ানো এবং নৈর্ব্যক্তিক শিক্ষার কঠোর প্রয়োগে নানান নিয়ম-নীতির বাঁধনে প্রতিনিয়ত যেসব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলিকে পাঠক্রম বিষয়ক চিন্তনে এবং বিদ্যালয় সংগঠনে অতিক্রম করা যায়। একজন বা দুজন প্রাথমিক শিক্ষক সম্বলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে নানান বয়সের, নানান দক্ষতার, শিক্ষার নানান প্রয়োজনের মধ্যে অসংখ্য শিক্ষার্থী সমন্বিত 'বহুমাত্রিক' বিদ্যালয় হিসাবে গণ্য না করে অন্যভাবে দেখা যেতে পারে। সে কারণে বিদ্যালয়ে শিশুরা কী শিখল তার মূল্যায়নের জন্য এক্ষেত্রে আমাদের দীর্ঘ কয়েকবছর অপেক্ষা করতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষে বিভক্ত স্তরবিন্যস্ত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে হয়ত তেমনটি না-ও হতে পারে। এখানে শিশুর শেখার যে গতি তাকে মর্যাদা দিতে হবে। প্রতিবছর কঠোর ফললাভের আশায় কখনোই 'শিক্ষার ন্যূনতার স্তর' এই জাতীয় কর্মসূচী নেওয়া হয়নি। বরং সেখানে প্রয়োজনে পাঠকে সংক্ষিপ্ত করারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্বের বিষয়গুলি বর্ণনা করে শিক্ষাদান এবং স্তরভিত্তিক মূল্যায়ণে পাঠ্যসূচী, পাঠ্যপুস্তক এবং জ্ঞানের নানান উৎসকে বিচারের আওতায় আনা হয়েছে। তাছাড়া শিশুদের বিকাশ এবং সক্ষমতার ক্রমিক এবং চক্রবৃদ্ধি হারে গভীরতা অর্জন, দক্ষতা এও ধারণা এবং এ প্রসঙ্গে শিক্ষকদের পরিকল্পনাও মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে বিচার্য্য।

### ৩.১০.১ অতি শৈশব শিক্ষা

অতি শৈশব স্তরে অর্থাৎ ছয় থেকে আট বছর বয়স হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্বকাল, যখন জীবনব্যাপী বিকাশ এবং পূর্ণ ক্ষমতার অনুভবের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। গবেষণায় দেখা যায় যে, মস্তিষ্কের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের জন্য এই স্তরে 'কঠিন সময়কাল' থাকে। পরবর্তীকালের নানান আচার আচরণ ও মূল্যবোধ গড়ে-ওঠা এবং সেই সঙ্গে

শেখবার ইচ্ছাও এই পর্যায়ে প্রভাবিত হয়। সেকারণে সাহায্যের অভাব বা অবহেলা এমন কিছু নেতিবাচক ফলাফলের জন্ম দিতে পারে যেগুলি কখনো কখনো অপরিবর্তনীয় হয়ে যায়। অতি শৈশব যত্নের এবং শিক্ষার (ECCE) দর্শনটি হল যে নবীন শিশুদের অবশ্য সযত্ন পরিচর্যা, সুযোগ এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত করাতে হবে যাতে পরবর্তীকালে তারা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং আবেগময়, বিকাশে এবং বিদ্যালয় জীবনে তৎপর অংশগ্রহণে সামগ্রিকভাবে বিকশিত হতে পারে। এই প্রেক্ষাপটটি হল সার্বিক এবং সুসংহত। এখানে শিশুর স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির প্রয়োজনকে তার মনোসামাজিক / শিক্ষাগত উন্নয়নের সঙ্গে একত্রে যুক্ত করে বিচার করা হয়। পাঠক্রমের কাঠামো এবং ECCE -র জন্য শিক্ষাপদ্ধতি এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে। বিকাশের বিবিধ অঞ্চল বিচার করে প্রতিটি উপ-পর্যায়ে শিশুদের চরিত্র এবং শিক্ষা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্মাণ করা উচিত।

শিশুদের চারপাশের জগতকে বোঝবার এবং বিভিন্ন বিষয় শেখাবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে, এ কথা সর্বজনবিদিত। শিক্ষার এই প্রাথমিক পর্বে শিশুর আগ্রহ ও প্রাধান্যকে মর্যাদা দিয়ে, তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিষয়বস্তুকে মিলিয়ে তাকে শেখাতে হবে। সাধারণভাবে বিধিবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে পাঠ দেওয়া মোটেই কাম্য নয়। শিশুর সক্ষমতার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত যে পরিবেশ সেটি অবশ্যই উদ্দীপনা এবং অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হবে, নতুন নতুন অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ দেবে এবং স্বাধীনভাবে নিজেকে প্রকাশের অবকাশ তাতে থাকবে। এই পরিবেশ সামাজিক সম্পর্কের ভিতে গড়া হবে যা তাকে উষ্ণতা, নিরাপত্তা এবং বিশ্বাসে পূর্ণ করে তুলবে। খেলাধূলা, সঙ্গীত, ছড়া, শিল্পকলা এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে কথা বলা, শোনা এবং প্রকাশ করা, এই স্তরের শিক্ষার তিনটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আর একটি জরুরী বিষয় হল, এই পর্বে শিশু জন্মাবধি যে ভাষার সঙ্গে পরিচিত সেই ভাষাতেই তাকে শেখাতে হবে। তাৎক্ষণিক পরিবেশে, যেখানে আনুষ্ঠানিকতা বিরুদ্ধ বাহু ভাষাভাষী একটি শ্রেণীকক্ষ প্রথম থেকেই নির্দেশের মাধ্যম এবং একটি দ্বিতীয় ভাষার প্রাথমিক স্তরে প্রবর্তনার সঙ্গে অনায়াসে মানিয়ে নিতে শিশুদের সাহায্য করে। ECCE-র আওতায় যে শিশু রয়েছে তারা যেহেতু একটি বিচিত্র বিবিধ-শ্রেণীর মিশ্রিত দল যেখানে অতি শৈশব থেকে প্রাক-বিদ্যালয়ের শিশুরাও রয়েছে, সে কারণে তাদের কর্মকাণ্ড এবং অভিজ্ঞতা নিজস্ব বিকাশ অনুযায়ী যথাযথ হতে হবে। তেমন একেবারে ছোট এবং সদ্য হাঁটতে শেখা শিশুর ক্ষেত্রে অনুভব সঞ্জাত পরীক্ষায় তাদের উদ্দীপ্ত করতে হবে, তাদের স্বাধীন চলাফেরায় বাধা দিলে চলবে না। আবার এদের চেয়ে যারা একটু বড় তাদের জন্য অনেক ছড়া, হাতেকলমে কাজ এবং প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত।

অক্ষমতার মূল্যায়ণ করে একেবারে প্রাথমিক স্তরেই তাকে চিহ্নিত করতে হবে এবং যথাযথ উদ্দীপনার সঞ্চারে এইসব অসুবিধা দূর করে যাতে তারা অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারে সে ব্যাপারে তাদের সাহায্য করতে হবে। শিশুদের পঠন, লিখন এবং পাটীগণিতের জন্য চাপ কিংবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রশিক্ষণে বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দেবার বিষয়েও সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ এই স্তরের শিক্ষাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতিপর্ব করে তুললে চলবে না। বস্তুত আমাদের প্রস্তাব হল, ০-৮ বছরের শিশুরা (অর্থাৎ প্রাথমিকে প্রথমদিকের শিশুদের যাতে নেওয়া যায়) ECCE-র আওতায় পড়বে। সেই অনুসারে ECCE র সার্বিক প্রেক্ষাপট এবং পদ্ধতি প্রকরণ (বিশেষত সার্বিক, সংহত বিকাশ, কর্মভিত্তিক শিক্ষা, লিখতে শেখার আগে কোন একটি ভাষা শোনা এবং বলতে শেখা, বিষয়মুখীনতা, বাড়ি এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে পারম্পর্য ইত্যাদি ইত্যাদি) সমগ্র শৈশব জুড়ে শিশুদের শিক্ষার অভিজ্ঞতা বিষয়ে নানা কথা জানাতে পারে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাপর্বে তার স্বচ্ছন্দ স্থানান্তরণ ঘটাতে পারে।

ECCE -র কর্মসূচী একটি বহুত্ব প্রকাশী চিত্র উপস্থাপিত করে যেখানে সরকার, আধা সরকার এবং বেসরকারী সংস্থাগুলি নানান পরিষেবার সুযোগ দিচ্ছে। অবশ্য এইসব কর্মসূচীর প্রচারের ক্ষেত্র বড়োই সংকীর্ণ এবং পরিষেবার মান অত্যন্ত অনিশ্চিত এবং খুবই করুণ। শিশুদের একটা বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, যারা প্রধানত দরিদ্র এবং প্রান্তিক শ্রেণী থেকে আসে, এই প্রাথমিক পরিচর্যা কর্মসূচীতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। ভাগ্যের হাতেই তাদের

ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাক-বিদ্যালয়ের এইসব কর্মসূচীতে শিশুকে একঘেয়ে দানবীয় একটা বাঁধাধরা রুটিনের মধ্যে বেঁধে ফেলা হয়। একেবারে কড়া ধাঁচের শিক্ষা কাঠামো, প্রথামত পড়াশুনা, ইংরাজী শেখা, নানান পরীক্ষা, বাড়ির কাজ এবং সেই ছোট্ট বয়স থেকে শিশুর খেলাধূলার অধিকার কেড়ে নেওয়া। এটা মোটেই অভিপ্রেত নয়। পিতামাতার আকাশছোঁয়া অবাস্তব উচ্চাশার ফসল হল এইসব ক্ষতিকারক শিক্ষাভ্যাস। এছাড়া প্রাক-বিদ্যালয় ব্যবসার বাণিজ্যিক সাফল্যের কারণটিও বাদ দেওয়া যায় না। যাইহোক এ ধরণের বিদ্যাভ্যাস শিশুর বিকাশ এবং শেখবার ইচ্ছাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান ধারার একটি অংশ হিসাবে ECCE-র অদ্যাবধি 'অস্বীকৃত' মর্যাদা থেকেই বেশিরভাগ সমস্যা উদ্ভূত। বিভিন্ন স্থানকেন্দ্রিক পরিষেবা আমাদের দেশে যে পরস্পর সমাপতনী সামাজিক বিভাজন আছে তার মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং তাকে প্রতিফলিত করে। ভারতীয় সমাজে দীর্ঘকালের লিঙ্গ-পক্ষপাত এবং পরিব্যাপ্ত পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধই ক্রেশ এবং দিবা-পরিচর্যার সুবিধার প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতির ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য দায়ী; বিশেষত গ্রাম এবং শহরের দরিদ্র-শ্রমজীবী নারীর শিশুরাই বঞ্চনার শিকার; এই অবহেলা মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপরীত অভিঘাতও আনতে পারে।

ECCE -র আদর্শ মানের কর্মসূচীতে শিশুদের সার্বিক বিকাশের ইতিবাচক প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। কাজেই সব শিশুরই অতি শৈশবে যত্ন পরিচর্যা এবং শিক্ষার অধিকার রয়েছে এই দাবী তোলার গোপন ন্যায্যতা এর মধ্যেই নিহিত আছে। সংবিধানে ২১ নং ধারায় ০-৬ বছরের শিশুদের বাদ পড়ার ঘটনাও অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এছাড়াও বিদ্যালয়ে শিশুর নাম লেখানো এবং তাদের শিক্ষিত হয়ে বাইরে আসা এর মধ্যে একটা গভীর যোগসূত্র রয়েছে। সমস্ত শিশুদের সমান গুরুত্বে শিক্ষাদানের জন্য যেমন পর্যাপ্ত অর্থের যোগান প্রয়োজন তেমনি গুণের পাঁচটা মৌলক মাত্রা যেমন বিকাশমুখী যথাযথ পাঠ্যক্রম, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও যথাবিহিত পুবাকৃত শিক্ষক/ শিক্ষিকা, শিক্ষক/ শিশু যথাযথ অনুপাত ও গোষ্ঠীর আকার, শিশুদের প্রয়োজনের সহায়ক পরিকাঠামো এবং তদারকির উৎসাহজনক রীতি, বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এই কর্মসূচীতে যখন বিকেন্দ্রীকরণ, নমনীয়তা এবং বিষয়মুখীনতার প্রয়োজন, তখনই যথাযথ নিয়মকানুন এবং নির্দেশিকা জরুরী হয়ে পড়ে। সে কারণে একটি নিয়ন্ত্রক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে শিশুর বিকাশের প্রশ্নে সমঝোতা করতে না হয়। সমস্ত স্তরেই ক্ষমতা নির্মাণের বিষয়টি বহুত্ববাদী ভূমিকার সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখতে হবে যাতে বিভিন্ন কর্মপরিচালন অংশের ভূমিকায় তাদের যথাযোগ্য এবং যথাযথ বেতনের বিষয়টিও নিশ্চিত করা যায়।

### ৩.১০.২ প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়কাল প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। সংবিধানের সংশোধনীতে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে চিহ্নিত করার পর উপরোক্ত পর্বটি বাধ্যতামূলক বিদ্যালয়ের পর্ব রূপে এখন স্বীকৃত। পঠন, লিখনের প্রাথমিক সূচনার সঙ্গে সঙ্গে এই পর্বে পাটিগণিত, প্রথাবদ্ধ অনেক বিষয় যেমন বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞানের সঙ্গে শিশুর প্রথম পরিচয় ঘটে। এই প্রথম আটটি বছর শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ, তার যুক্তির রূপরেখা নির্মাণ, বুদ্ধিবৃত্তি, সামাজিক দক্ষতা এবং কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মনোভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

UEE অর্জনের উদ্যোগ যেহেতু এখন উন্নত হয়েছে, সেকারণে প্রাথমিক স্কুল পর্বের শ্রেণীতে বিদ্যালয় যাবার উপযুক্ত বয়সের অনগ্রসর শ্রেণীর শিশুরাআসতে শুরু করেছে। শিক্ষার মানের সঙ্গে সমঝোতা না করে বহুত্ববাদিতা এবং নমনীয়তার নিরিখে এই পর্বটির ভাবনা শিক্ষার উৎকর্ষতার নিদর্শন হয়ে ওঠা প্রয়োজন। এই পর্বের শিক্ষা চরিত্রে সংহত হবে যাতে প্রকাশে এবং ভাষার সুবিধা গ্রহণে শিশুদের সক্ষম করে তোলা যায় এবং শিক্ষার্থী হিসাবে তাদের মনে বিদ্যালয়ের ভেতরে-বাইরে নিজের প্রতি বিশ্বাস উৎপন্ন করা যায়।

বিদ্যালয়ের প্রথম দায়িত্ব হল, শিশুর ভাষা সম্পর্কিত দক্ষতার বিকাশ : উচ্চারণ এবং সাক্ষরতা প্রসূত

দক্ষতা, সৃজনের কাজে ভাষার ব্যবহার, চিন্তা করতে পারা এবং অপরের সঙ্গে ভাব বিনিময়ে সক্ষমতা। যারা নিজেদের মাতৃভাষা শিখতে চায়, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু যেন সুনিশ্চিত করা যায় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এই মাতৃভাষার মধ্যে উপজাতির ভাষা এবং ছোট ছোট অঞ্চলে ভাষিক বিভিন্নতার বিষয়টিও রয়েছে। এমনকি সেই ভাষাভাষী শিক্ষার্থী যদি সংখ্যায় খুবই অল্প হয় তবু এ সুযোগ দিতেই হবে। এই সমস্ত সুযোগগুলিতে উৎসাহ দান এবং তাদের পুষ্টি করার সক্ষমতা এই ব্যবস্থায় রয়েছে। একইসঙ্গে ভবিষ্যত সুযোগের দরজা যাতে খোলা থাকে সেটি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন করণকৌশলের পদ্ধতিগুলি যাচাই করে দেখা। সে কারণে এই পর্বটি আদর্শ শিক্ষাদানের সক্ষমতার প্রশ্নে অবশ্যই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই ভারতের বহুভাষিক অবস্থান বজায় রাখার সচেতন প্রয়াসে একটি ত্রি-ভাষা সূত্র চালু করতে হবে। এই পর্যায়ে যখন ইংরাজী পড়ানো হবে, তখন এটি কোন অবস্থাতেই ভারতীয় ভাষাগুলিকে বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে শেখানো হবে না।

গাণিতিক চিন্তনের বিকাশে, সংখ্যার গণনা দিয়ে আরম্ভ করে বিমূর্ত ভাবনার মজা ও সুবিধার দিকে আরো বেশি এগিয়ে যেতে হবে। তবে এরই সঙ্গে শক্তপোক্ত পরীক্ষা এবং হাতেকলমে কাজের সবল ভিত্তির ওপর এই সমস্ত ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই পর্বে, প্রাথমিক স্তর থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ভাষা এবং গণিত শেখার ক্ষেত্রে কোথায় অসুবিধা হচ্ছে সেটি অনুসন্ধান করে সমস্যা সমাধানের সূত্র নির্দিষ্ট করতে হবে।

এই সমস্ত কঠিন পরীক্ষাগুলি পরিবেশের নিগূঢ় অধ্যয়নের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এরই সাহায্যে শিশুদের পৃথিবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসু জ্ঞান বিদ্যালয়ের জ্ঞানে একত্রিত হয়ে যায়। বছরের পর বছর ধরে, এই অধ্যয়ন আরো নির্দিষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধ চর্চার পথে এগিয়ে চলে। কিন্তু তখনও সমস্ত তাত্ত্বিক ভাবনাকে সংহত করার প্রয়োজন হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই ধারণা বিকাশের সুযোগ থাকে, চর্চিত বিষয়টির কথনের ভঙ্গিমা এবং পদ্ধতি শেখা হয়ে যায়।

শিল্পকলা এবং চারুকলা কেবলমাত্র যে নান্দনিক অনুভূতি গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় তা নয়, বরং এরই সাহায্যে শিশু উপকরণ নিয়ে কাজ করতে শেখে, কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মনোভাব এবং দক্ষতার বিকাশ ঘটে। এই পাঠক্রমে বাস্তব জীবনে কাজের দক্ষতা এবং বহুবিধ কাজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিশুর অবশ্যই পরিচয় ঘটবে। খেলাধূলার মাধ্যমে শারীরিক বিকাশও অত্যন্ত আবশ্যিক। এই পর্যায়ের বিদ্যালয় জীবনে বিচিত্র সব কাজকর্ম যেমন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, নানান অনুষ্ঠান সংগঠিত করা, বিদ্যালয়ের বাইরে নানাস্থানে বেড়াতে যাওয়া, এসবের মাধ্যমে শিশু এমন অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করে যাদের সাহায্যে সে সামাজিক স্তরে আবেগময়তায় বিকশিত হয়ে সৃজনশীল ও আস্থাবান এমন এক ব্যক্তিতে পরিণত হয় যে অন্যদের প্রতি অনুভূতিশীল এবং যে কোন কাজে উদ্যোগী হওয়া এবং দায়িত্ব নেবার শক্তি যার আছে। পরিচালনা এবং পরামর্শদানের অভিজ্ঞতা আছে এমন শিক্ষক/ শিক্ষিকারা পরিকল্পনা রচনা করতে পারে এবং শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য নানান কার্যকলাপ পরিচালনা করতে পারে। এইভাবে ব্যক্তিসত্তা এবং কাজের জগতের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা ও আচার-আচরণের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বছরগুলির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের অন্তর্ভুক্ত শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং পরামর্শ দিতে হবে। সমগ্র পাঠক্রমের বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি ফললোভী না হয়ে প্রক্রিয়াকেন্দ্রিক হওয়া উচিত। বিকাশের এই সবকটি ক্ষেত্র শিশুদের নাগালে থাকবে এবং সব সঙ্গে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার বিষয়েও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। পাঠক্রমে যেন বিভিন্ন গোষ্ঠীর পছন্দ, নির্বাচন এবং সক্ষমতার প্রশ্নে কোন বাঁধাধরা গৎ চাপিয়ে না দেওয়া হয় সেটি সুনিশ্চিত করে তুলতে যত্নশীল হতে হবে। এই প্রসঙ্গে, কাজের একটি পরিচয় হিসাবে বৃত্তিমূলক দক্ষতার ক্রমসংযুক্তিও এই ব্যাপক পাঠক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠতে পারে।

### ৩.১০.৩ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পর্বটি হল প্রচণ্ড শারীরিক পরিবর্তন এবং আত্মপরিচয় গঠনের সময়। এটি আবার তীব্র শিহরণ ও কর্মচাঞ্চল্যের সময়। বিমূর্ততার সঙ্গে যুক্তির মিশেল দেওয়া এবং তর্কবিদ্যার ব্যবহারের ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে এসময়। এতে শিশুর মধ্যে এখানে সেখানে সর্বত্র জ্ঞানের সৃষ্টি এবং বোধের জাগরণ উভয় প্রক্রিয়ায় গভীর সংযুক্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়। একটি বিচারধর্মী আত্মঅনুভবের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের বোধও এই পর্বে শিশুর মনে প্রকাশিত হয়।

এই স্তরে শিক্ষার পাঠ্যসূচীর সাধারণ উদ্দেশ্য হল, শৃঙ্খলা বিষয়ে শিশুকে সচেতন করে তোলা, এই পাঠ্যে অধ্যয়নের বিষয়ে যে সুযোগ এবং সম্ভাবনা রয়েছে তাদের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটানো। এই ধরনের সংযুক্তির ফলেই তারা নিজেদের আপন দক্ষতা এবং আগ্রহের বিষয়গুলি আবিষ্কার করতে পারে এবং পরে তারা যেসব বিষয়ে কাজ করবে বা যে বিষয়ে অধ্যয়ন করতে চাইবে সেই সম্পর্কিত ভাবনা তাদের মনে দানা বাঁধতে শুরু করে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক/ শিক্ষিকা এবং পেশাদার পরামর্শদাতার সহায়তায় সংগঠিত প্রকৃতির পরিচালনা এবং পরামর্শসূচক হস্তক্ষেপে এহেন প্রয়োজন সুন্দরভাবে মিটে যেতে পারে। বৃহৎ সংখ্যক শিশুর কাছে, এটাই অবশ্যই তার নিয়মবদ্ধ পাঠের শেষ কটি বছর। এরপরেই তারা বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাবে এবং উৎপাদনশীল যে কোন কর্মশিক্ষায় যুক্ত হয়ে পড়বে। বৃহৎ সংখ্যক শিশুর দল, আর্থ-সামাজিক কারণে যাদের কাছে এটিই হল শেষ পর্যায় তাদের সম্ভাবনাময় কাজের দক্ষতা এবং সৃজনশীলতার পাঠ নেবার জন্য সবরকম সুযোগ তৈরী করে দেওয়া প্রয়োজন আর এইভাবে সমগ্র শিক্ষাদান পদ্ধতি ক্রমশ সার্বিক মাধ্যমিক শিক্ষার পথে এগিয়ে যাবে। পাঠাগার এবং গবেষণাগারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এসবই তাদের নাগালে থাকা আবশ্যিক এবং সমস্ত শিশুই যাতে এই সুবিধা পায় সেজন্য সচেষ্ট মনোযোগ সর্বদা থাকতে হবে।

এই দুটি বছর 'বোর্ডের পরীক্ষা'র নম্বরের ভাবনায় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে কেননা তারই ভিত্তিতে তাদের ভবিষ্যত জীবনে সুযোগ পাওয়া-না-পাওয়া নির্ভরশীল। অনেক বিদ্যালয় খুব গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করে যে তারা দশম শ্রেণীর সমস্ত পাঠ্যসূচী আগের বছরেই শেষ করে ফেলেছে এবং পরের বছরটি শুধু পাঠ্যসূচীর (দুটি শ্রেণীর) ফিরে-দেখা পর্ব চলবে। এ সবই করা হয় যাতে ছাত্রছাত্রীরা এই বোর্ডের পরীক্ষার জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত থাকে। ঐ একই কারণে এই পর্যায়ে নবম শ্রেণী এবং পরবর্তী স্তরে একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের আত্মত্যাগ করতে হয়। পরীক্ষা বিষয়ে একটা পূর্বনির্ধারিত ধারণা এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে এর ক্ষতিকারক প্রভাব অবশ্যই খতিয়ে দেখা এবং এই ভাবনার মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন। এইরকম একটা অনুৎপাদক সংযুক্তিকে শিশুর জীবনের সবচেয়ে ফলদায়ী পর্বের গোটা একটা বছর এইভাবে নষ্ট করা কি ঠিক? শিক্ষার ক্ষেত্রটিকে সঠিক ছন্দে দুটি বছরে ভাগ করে পরীক্ষার জন্য আরো ভালোভাবে প্রস্তুত হওয়া কি সম্ভব নয়? পরীক্ষার বিষয়ে, আরো অন্য পাঠক্রমের ক্ষেত্রে, বিশেষত খেলাধূলা এবং শিল্পকলার ক্ষেত্রেও এ সময় একটু সমঝোতা করে নেওয়া হয়। এইসব ক্ষেত্রগুলি যাতে সুরক্ষিত থাকে সেটি নিশ্চিত করা দরকার। একই সঙ্গে এই পর্বে কাজের অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ করে দেবার জন্য গুরুতর প্রচেষ্টা করতে হবে।

এ দেশের বেশিরভাগ বোর্ডের পাঠ্যসূচী এই পর্বে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ অথবা কোন ঐচ্ছিক বিষয় পড়ার সুযোগ নেই : দুটি ভাষা (এর মধ্যে একটি ইংরাজী), গণিত, বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞান এই হল একেবারে প্রচলিত পরীক্ষার বিষয়সূচী। এদের মধ্যে গণিত এবং ইংরাজীর পাঠ্যসূচী এমন বিপুল যে সেটিই ছাত্রছাত্রীর এই দুটি বিষয়ে ফেল করার জন্য দায়ী। এ বিষয়টির পুনর্মূল্যায়ণ করতে হবে এবং গোটা পাঠ্যসূচী ঢেলে সাজাতে হবে। সমগ্র পরীক্ষার পাস-ফেল ঘোষণার নীতি এবং পাসের ন্যূনতম নম্বরের বিষয়টিও পুনর্মূল্যায়ণ করা দরকার। ষষ্ঠ

অধ্যায়ে পদ্ধতিগত সংস্কারের প্রশ্নে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

হাতে গোনা কয়েকটি বোর্ডে অবশ্য কিছু ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচনের সুযোগ আছে; যার মধ্যে রয়েছে অর্থনীতি, সংগীত এবং রন্ধনবিদ্যা। কিন্তু এরকম ঐচ্ছিক বিষয়ের সংখ্যা আরো বাড়ানো উচিত এবং এগুলোর সাহায্যে প্রচলিত বিষয়ের বদলে আরো অন্য নতুন নতুন বিষয় পড়বার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বৃত্তিমূলক বিষয়ও ঐচ্ছিক হিসাবে থাকতে পারে। এমন অনেক বৃত্তিমূলক শিক্ষা আছে, যেগুলি স্থানীয় গোষ্ঠীর মধ্যে উৎপাদনশীল কাজ হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। যেমন গ্যারেজের গাড়ি মেরামতি, দর্জির কাজ এবং আধা-মেডিক্যাল পরিষেবা ইত্যাদি কাজ। এ কাজগুলি যেখানে হয় তাদের সঙ্গে একত্রে বিদ্যালয়ে এগুলি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা গেলে অর্থপূর্ণ বৃত্তিমূলক পাঠের সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে। এইসব শিক্ষা বিদ্যালয় বোর্ডের অনুমোদন লাভ করলে, বিদ্যালয়ের বাইরেও জ্ঞানের যে বৃহৎ ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে সেটি পাঠক্রমে স্বীকৃতি লাভ করবে। আমাদের দেশে অনেক বৃত্তিমূলক ধারার পাঠ্যসূচীর মান ক্রমশ নেমে যাচ্ছে এবং এদের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের কর্মসংক্রান্ত অর্থপূর্ণ জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া যাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে এসব পাঠক্রম বাঁধাধরা গতে পর্যবসিত এবং কোন একটা কাজ করতে শেখা এবং কাজ পাবার জন্য শেখা এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকছে না।

### ৩.১০.৪ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্য নির্ভর এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার পদমর্যাদার বিষয়টি পুনরায় বিবেচনার প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে পূর্বনির্ধারিত ধারণা বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে এবং বোর্ড ও প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলি অনেক বেশি প্রভাবিত করছে। সেইসঙ্গে তথাকথিত 'পাঠ্যনির্ভর ধারা'য় অবিরাম সুযোগ বাড়ছে এবং বিপরীতে 'বৃত্তিমূলক ধারা'য় শিক্ষার সুযোগ একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সমগ্র বিষয়টি পুনর্বিবেচনার সময় এই পরিস্থিতির কথা মনে রাখতে হবে। এই দুটি বছর এমন একটি সময় যখন শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দ, দক্ষতা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে ভবিষ্যত জীবনের সম্ভাব্য ধারণা অনুযায়ী বিষয়গুলিকে নির্বাচন করে।

জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র অনুসন্ধান করতে এবং সেটিকে বুঝতে বিভিন্ন ঐচ্ছিক বিষয় পড়ার সুযোগ দিতে হবে। এই কাজে ব্যক্তির পছন্দ এবং কর্মজগতে তার ভবিষ্যৎ উন্নতির মধ্যে যে সম্পর্ক তাকে এই পর্বে বিশেষভাবে বিচার করতে হবে। এই স্তরেই নানান বিষয়ের চর্চা এবং সেই সংক্রান্ত সমস্যা ও প্রশ্নগুলি বিভিন্ন সমৃদ্ধ আন্তর্বিষয়ক প্রেক্ষাপট থেকে বিচার করা সম্ভব হয়। পাঠের জন্য যে বিষয়টি 'নির্বাচন' করা হল তার মধ্যে এবং তার বাইরে এরকম সব তদন্তের সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

বেশিরভাগ বোর্ডেই বাধ্যতামূলক বিষয়ের সঙ্গে নানা ক্ষেত্রে অধ্যয়নের সুযোগ থাকে। এক্ষেত্রে প্রথাগত ও প্রথাবহির্ভূত নানান সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন দেখা দেয় এবং বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নানান বাধার মুখোমুখি হতে হয়। কয়েকটি বোর্ডে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'বিজ্ঞান', 'কলা' এবং 'বাণিজ্য' এইরকম বিভিন্ন ধারায় বিষয়গুলিকে দলবদ্ধ করা থাকে এবং তাদের মধ্যে মিশ্রণের সুযোগ থাকে না। CESC বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এইরকম কোন বাধা আরোপ করে না। তবে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের জোটবাঁধা পাঠ শিক্ষার্থীদের বেশি পছন্দ হওয়ায় এবং বিষয়গুলির পারস্পরিক সম্পর্কের বিচারে ঐ সমস্ত বিষয়ের মর্যাদার ধারণা বিশেষ সক্রিয় থাকায়, বর্তমানে কয়েকটি বিষয়ের পারস্পরিক জোট বাঁধার সুযোগ সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি +2 পর্বে যেভাবে বিষয় নির্বাচনের নানা সীমাবদ্ধতা আরোপ করছে, তারই নিরিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম নীতিও পর্যালোচিত হওয়া প্রয়োজন। এর ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ অধ্যয়ন সংক্রান্ত জোট যেমন, পদার্থবিদ্যা, গণিত এবং দর্শন কিংবা সাহিত্য, জীবনবিজ্ঞান এবং ইতিহাস নির্বাচনের এবং অধ্যয়নের সুযোগ শিক্ষার্থীদের নেই।

বিদ্যালয়গুলির আর একটি সাম্প্রতিক প্রবণতা হল, ইঞ্জিনীয়ারিং এবং মেডিকেলে পাঠক্রম অনুযায়ী এই

পর্বের শ্রেণীগুলিকে ছেঁটে ফেলা। এর ফলে বিদ্যালয়ে তারা যে পাঠক্রমের সুযোগ দিচ্ছে সেটিতে কিন্তু কৃত্রিম বাধা আরোপ করা হচ্ছে এবং জনপ্রিয়তা ও সময় সংস্থানের ভিত্তিতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। দেশের অনেক প্রান্তে, শিক্ষার্থীরা যারা কলা এবং অন্যান্য স্বাধীন বিষয় অধ্যয়ন করতে চায় তাদের বিষয় নির্বাচনের অনেক কম সুযোগ থাকছে। বিদ্যালয়গুলি অনেক ক্ষেত্রে সময় সঙ্কুলানের এবং বিদ্যালয়ের নিজস্ব অসুবিধার কারণে অনেক প্রচলিত বিষয়জোট অধ্যয়নে ছাত্রছাত্রীদের নিরুৎসাহিত করে। আমরা বিশ্বাস করি যে, শিক্ষার্থীদের সামনে নির্বাচনের সমস্ত সুযোগ খোলা থাকা উচিত। কখনো যদি এমন হয় যে, বিশেষ কোন একটি বিষয় খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থী পড়তে চায়, সেক্ষেত্রে বিদ্যালয় তার পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি বোঝাপাড়ায় আসতে পারে যাতে তারা একত্রে সেই বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগ করতে পারে। কোন কারণে যদি এরকম কোন বিশেষ বিষয় জড়ানোর জন্য কোন শিক্ষক না পাওয়া যায় তবে প্রয়োজনে একেবারে ব্লক স্তরেও শিক্ষক নিযুক্ত করা যেতে পারে। এই সব বিষয়ের অধ্যয়নে উৎসাহ দেবার জন্য বিদ্যালয় বোর্ডও অনেক সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

+2 পর্বের পাঠক্রমে যেসব বিষয় অধ্যয়নের সুযোগ পাওয়া যায়, সেগুলির ক্রমোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যসূচীরও সেই মত সংস্কার করতে হবে, যাতে নতুন জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলি তার সঙ্গে যুক্ত হয়। এর মধ্যে রয়েছে বিষয়ের নির্দিষ্ট সীমারেখার পরিবর্তন এবং বহুমুখী বিষয় চর্চার বিকাশ। নির্দিষ্ট বিষয়ে এবং সেটির নিজস্ব এলাকায় অধ্যয়নের গুরুত্ব যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেইভাবে অধ্যয়নে যুক্ত হবার সুযোগ শিক্ষার্থীদের দিতে হবে। পাঠ্যসূচীর মধ্যে অন্যান্য বিষয় অর্ন্তভুক্তির জন্য কিছুটা পরিসর রেখে দিতে হবে। যেমন, ইতিহাসের মধ্যে কেউ ইচ্ছা করলে পুরাতত্ত্ব কিংবা বিশ্ব ইতিহাস অধ্যয়ন করতে পারবে, একইরকমভাবে পদার্থবিদ্যারমধ্যে জ্যোর্তিবিজ্ঞান বা মহাকাশ বিজ্ঞান বা মহাকাশযানবিদ্যা ইত্যাদি কিংবা অন্যান্য কোন বিষয় অধ্যয়নের সুযোগ থাকতে হবে।

এই বিশাল পাঠ্যসূচী শেষ করার চাপে পড়ে শিক্ষার অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক যেমন ব্যবহারিক শিক্ষা বা মাঠ পর্যায়ের কাজ এবং নানান তথ্য সংগ্রহের কাজ পরিকল্পিত কাজ এবং উপস্থাপনা— এরকম অনেক কিছুই তেমনভাবে কাজে লাগানো যায় না। এতে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার ক্ষতিই হয়। সমস্ত যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ পরীক্ষাগার এবং পাঠাগার, সেইসঙ্গে কম্পিউটারও শিক্ষার্থীদের নাগালে থাকা প্রয়োজন। এই সমস্ত দরকারী সামগ্রী সম্ভারে যেন বিদ্যালয়গুলি এবং নিম্ন কলেজগুলি সুসজ্জিত থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শিক্ষা শেষ করে যারা বিভিন্ন পেশা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজে যুক্ত হবে কিংবা নিয়মমাফিক পুঁথিগত ধারায় অথবা যারা অধ্যয়নকে অনুসরণ করবে কিংবা আরো অধ্যয়ন বা গবেষণায় মনোনিবেশ করবে তাদের চেয়ে অনেক আগে যেসব শিক্ষাথীরা বিদ্যালয় ছেড়ে অর্থ উপার্জনের জন্য কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে মূলত তাদের প্রয়োজনের কথা ভেবেই এই বৃত্তি মূলক পাঠক্রম চালু করা হয়েছে। বৃত্তিগত দক্ষতা ও পুঁথিগত জ্ঞানের গভীর ভিত্তি স্থাপনের জন্য পাঠক্রমটি আরো বিস্তৃত, আরো নমনীয় হওয়া প্রয়োজন। জ্ঞান আহরণ মূল্যবোধের উন্নয়ন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য +২ সহ সব শিক্ষাক্রমেই সুপারিশ করছি।

এই পর্যায়ের প্রদত্ত বিকাশশীল প্রকৃতির নিরিখে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশাদার মানুষের পরিচালনা এবং পরামর্শ শিশুদের নিকট সহজলভ্য করে তুলতে হবে। ব্যক্তিগত/কর্মক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে অনুসন্ধান এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সুষ্ঠ হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এছাড়া এই পর্বটি বয়ঃসন্ধিকালের ওপর মিলে মিশে যায়। একজন ব্যক্তিমানুষের জীবনে ও এমন একটি সময় যেটি পরিবার, সঙ্গীসাথী এবং বিদ্যালয় পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমঝোতার দাবির কারণে সৃষ্ট ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং আবেগজনিত সঙ্কট সৃষ্টি করে। বিদ্যালয়ের প্রাপ্ত পরামর্শ যেন তাদের ক্রমবর্ধমান শিক্ষাগত ও সামাজিক চাপ থামাতে সাহায্য করে।

## ৩.১০.৫ মুক্ত বিদ্যালয় ও সেতু বিদ্যালয়

জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় থেকে যাত্রা শুরু করে যে মুক্ত বিদ্যালয় বোর্ডগুলি কয়েকটি মাত্র রাজ্যে কাজ শুরু করেছিল, তারা আজ ছাত্রছাত্রীদের অনেক নমনীয় এবং অসংখ্য নির্বাচনের সুযোগ দিতে পারছে। পরীক্ষা ব্যবস্থা অনেক বেশি নমনীয় হওয়ায় এবং অন্য বোর্ড থেকে এই বোর্ডে চলে আসার সুযোগ থাকায়, মুক্ত বিদ্যালয়গুলি বর্তমানে শংসাপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক বেশি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করছে। মুক্ত বিদ্যালয় বিষয়ে জানার এবং এখানে ভর্তির সুবিধা আরো বেশি বিস্তৃত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে যত ভুল ধারণা আছে যেমন মর্যাদায় এটি অন্যান্য বোর্ডের পরীক্ষার সমতুল্য কি না ইত্যাদি যত ধারণা আছে যত শীঘ্র সম্ভব দূর করতে হবে। অন্যান্য বোর্ডের পাশাপাশি যদি এই বোর্ডের পরীক্ষা সংঘটিত হয় তবে শিক্ষার্থীদের যাতে একটি বছর নষ্ট না হয় সে বিষয়টি সুনিশ্চিত করা যাবে।

দেশের অনেক স্থানে দুটি পাঠক্রমের মধ্যে সেতু বন্ধনের পাঠক্রম চালু আছে। এর সাহায্যে যে সব শিশু কোন কারণে বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষার বাইরে পড়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রে বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত শ্রেণীতে পুনরায় ভর্তির জন্য প্রস্তুত করানো হয়। এই পাঠক্রমের লক্ষ্য পূরণের জন্য এই মধ্যবর্তী শিক্ষাস্তরের প্রয়োজন মেটানোর উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। কোনো কারণে এ বিষয়ে ব্যর্থ হলে শিক্ষার্থীরা আগেই যে বঞ্চনার শিকার হয়েছে তারই প্রতিক্রিয়ায় নিজ অধিকার সম্পর্কে তাদের মনে নিদারুণ অশ্রদ্ধা জন্মাবে। প্রচণ্ড গবেষণা, শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়ন এবং এই পর্যায়ের কর্মসূচী সফল করতে প্রয়োজনীয় উপাদান, নিয়মনীতির কঠোর প্রবর্তন,নানান সুযোগ-সুবিধা, সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরেও এইসব ছেলেমেয়েদের সাহায্য করার জন্য পাঠের ক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবিরাম সহায়তা— এই সমস্ত কাজের সার্বিক রূপায়নেই বাস্তবে এই সহায়ক শিক্ষাপদ্ধতি সফল হয়ে উঠবে।

## ৩.১১ মূল্যায়ন এবং বিশ্লেষণ

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায়, পর্বান্তরিক মূল্যায়নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পরীক্ষা, চাপ এবং উদ্বেগ। পাঠক্রমের সংজ্ঞায় বর্ণিত সকল প্রচেষ্টা এবং নবীকরণ যদি না বিদ্যালয় কর্মক্ষেত্রে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে তবে ঐ সব ভাবনা এক কথায় বাতিল হয়ে যায়। পরীক্ষা ব্যবস্থার মন্দ প্রতিক্রিয়ায় আমরা উদ্বিগ্ন। শেখা এবং শেখানোর কাজটি শিশুদের কাছে অর্থপূর্ণ ও আনন্দময় করে তোলার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। বর্তমানে প্রাক বিদ্যালয় পর্ব থেকেই বোর্ডের পরীক্ষার নেতিবাচক প্রভাবে সারা বছরই পরীক্ষা আর মূল্যায়নের পালা চলতে থাকে।

সেই সঙ্গে বলা যায়, একটা ভাল পরীক্ষা পদ্ধতি এবং সঠিক মূল্যায়ন শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থী উভয়েরই বিশেষ উপকারে লাগতে পারে । কেননা এটি শিক্ষা ব্যবস্থায় ফাঁকগুলি পূরণের চেষ্টা করে। মূল্যায়ন এবং বিশ্লেষণ এই বিষয়ে আলোচনায় এই অংশটি শুরু হয়েছে যেহেতু শিক্ষার প্রচলিত ধারায় পাঠক্রমের অংশ হিসাবে শিক্ষাদানের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এটি প্রাসঙ্গিক। পরীক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ করে বোর্ডের পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি একত্রে পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

### ৩. ১১.১ মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

শিক্ষা হল অর্থপূর্ণ এবং উৎপাদনক্ষম জীবনের প্রস্তুতিপর্ব এবং এই শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগে এবং প্রকরণে সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা মূলত সেটি বিচার করার জন্যই তথ্যের উল্টোমুখী স্রোতের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, এমন একটি শিক্ষা চালু করার ক্ষেত্রে আমরা সফল যেটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় পাওয়া যেতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে বিচার করলে

বর্তমানে সাফল্য বিচারের যে পদ্ধতি, যার মধ্যে বিভিন্ন দক্ষতার পরিমাণ নির্ণয় এবং বিচারের সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ, তার প্রতিটি স্তরই অপর্যাপ্ত এবং কোন অবস্থাতেই একজন শিক্ষার্থীর সমস্ত মনস্তুতি দক্ষতা বা বিকাশের ছবি তার মধ্যে প্রতিফলিত হয় না।

কিন্তু মূল্যায়নের এই সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যের মধ্যে আমরা বৌদ্ধিক এবং পাঠনির্ভর বিকাশের পরীক্ষা ব্যবস্থায় জড়িত তথ্যগুলি পুনর্মূল্যায়নের জন্য পেয়ে যেতে পারি। শিক্ষক যদি শিক্ষাদান পর্বের আগে কেবলমাত্র পাঠ্যসূচীই নয় যে সব সংকেতের ভিত্তিকে মূল্যায়ন করা হয় তার প্রতিটি অংশ এবং সেগুলি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের বিষয়ে গভীর অনুধাবন করেন, তাহলেই তিনি বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার উপযোগী শিক্ষার্থী গড়ে তুলতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নতি বিচার করতে হলে, প্রতিটি ক্ষেত্রে তার বিকাশ এবং পছন্দ বিচার করতে হবে এবং সে কারণে তাঁকে তথ্য সংগ্রহও, ব্যাখ্যা করতে হবে, শিক্ষার্থীর কাজগুলি গভীর মনোনিবেশে লক্ষ্য করতে হবে, তবেই শিক্ষার্থীর স্বভাব প্রকৃতি অনুযায়ী তার সঠিক মূল্যায়ন করা যাবে। মূল্যায়নের উদ্দেশ্য নিশ্চিতরূপে হল, শিক্ষাদানপদ্ধতি ও উপকরণের উন্নতি এবং যে উদ্দেশ্যে শিক্ষা দানকর্ম পরিচালিত বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে সেগুলির সঠিক গুরুত্ব অথবা শিক্ষার্থীর দক্ষতা এবং ধারণার সঠিক বিকাশ। বলাই বাহুল্য এর অর্থ এই নয় যে, ঘন ঘন পরীক্ষা নিতে হবে। বরং উল্টে, প্রতিদিনকার কাজকর্ম এবং নানান চর্চার মধ্যেই শিক্ষার মূল্যায়ন করতে হবে।

সুবিন্যস্ত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এবং নিয়মিত প্রতিবেদন কার্ডের ব্যবস্থা করলে এরই সাহায্যে শিক্ষার্থীদের বিকাশের মূল্যায়ন করা যায় এবং সেই মতো অসুবিধা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এতে শিক্ষার মান এবং শিক্ষার্থীদের বিকাশ সম্পর্কে পিতামাতাদের নিয়মিত অবহিত করানো যায়। এটি মোটেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে উৎসাহিত করার উপকরণ নয়। যদি কেউ শিক্ষার মানের উন্নতি চায় তবে শিশুদের মধ্যে ফলাফল অনুযায়ী শিশুদের মর্যাদার বিভাজন করে, অন্যদের প্রতিতুলনায় তাদের সাফল্য ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করে, তাদের মনে হীনম্মন্যতা জাগিয়ে, মোটেই শিক্ষার উন্নতি ঘটানো যায় না।

পরিশেষে, সঠিক মূল্যায়নের মধ্যে থাকবে একটি প্রতিবেদন কিংবা পাঠক্রম শেষ করার শংসাপত্র যাতে অন্যান্য বিদ্যালয়ে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কোন গোষ্ঠীতে অথবা সম্ভাব্য চাকুরিদাতার কাছে তার এই পাঠের গুণাগুণ এবং বিস্তৃতি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়।

মূল্যায়নের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের পাঠ অধ্যয়নের সুবিধা অসুবিধা এবং পশ্চাদগামিতা বুঝে নিলে সেই মতো শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়— মূল্যায়ন সম্পর্কে এটিই চলতি ধারণা। কিন্তু এরজন্য পাঠক্রমের পরিকল্পনায় অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যেসব শিশুদের অক্ষর পরিচয় যেমন পড়তে অথবা বুঝতে না পারা) বা সংখ্যা গণনের ক্ষেত্রে (বিশেষত গাণিতিক গণনা পদ্ধতির সাংকেতিক রূপ এবং তাদের অবস্থানের মূল্য মান) অসুবিধা রয়েছে তাদের জন্য পর্বান্তরিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। কিন্তু এর জন্য বিশেষ ধরণের পরিকল্পিত কর্মসূচী দিতে হবে যা কেবল ঐসব শিশুদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। এই সব শিশুদের অসুবিধা দূর করার কাজে যে সব শিক্ষক নিযুক্ত থাকবেন তাঁদের বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তাঁরা যথাযথ রোগ নির্ণয়ের মাধ্যমে এইসব শিশুদের নিরাময় করতে পারেন। একইরকম ভাবে, এই নিরাময়ের কাজে বিশেষ ধরনের উন্নত উপকরণ এবং পরিকল্পনা প্রয়োজন যাতে এক একবারে শিক্ষক এক একশিক্ষার্থীর প্রতি মনোনিবেশ করতে পারেন এবং 'সে কী জানে' এই স্তর থেকে শুরু করে 'তার কী জানার দরকার' এই স্তরে পৌঁছোতে পারেন। এটি মূল্যায়নের একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া এবং এতে অত্যন্ত যত্নশীল পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন। কিন্তু পারিভাষিক প্রতিশব্দ তুলে এনে যথেচ্ছভাবে তাদের ব্যবহার করলে কার্যকর শিক্ষাদান পদ্ধতির সাধারণ সমস্যা থেকে শিক্ষকের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন এবং শিশুর শিক্ষালাভের দায়দায়িত্ব শুধু মাত্র এককভাবে তার ওপর চাপিয়ে সমস্ত প্রক্রিয়াকেই শেষাবধি 'ব্যর্থ' হিসাবে চিহ্নিত করবেন।

**মূল্যায়নের উদ্দেশ্য এটা নয়**

- ভয় দেখিয়ে শিশুদের পড়ায় মনোযোগী করা
- 'ঢিলেঢালা' 'বুদ্ধিমন্ত' 'গোলমেলে' এইসব বিশেষণে শিশুদের চিহ্নিত করা যা লেবেল এঁটে দেওয়া এই পদ্ধতি শিশুকে বিচ্ছিন্ন করে, সব শিক্ষার বোঝা একমাত্র তারই মাথায় চাপিয়ে, শিক্ষাদানের প্রকৃত ভূমিকা থেকে বিচ্যুত হয়
- যে শিশুর পৃথক যত্নের প্রয়োজন তাকে চিহ্নিত করতে প্রতীক্ষা (এর জন্যে প্রথানুগ মূল্যায়নের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। এটা শিক্ষকের শিক্ষাদান পরিকল্পনার মধ্যে থাকবে। পড়ানোর সময়ে প্রতিদিনকার পূর্ণপাঠ মূল্যায়নে তিনি ব্যক্তিগত মনোযোগ পিছিয়ে পড়া শিশুদের চিহ্নিত করে তাদের সাহায্য করবেন।)
- শেখার অসুবিধা এবং সমস্যার দিকগুলিকে খুঁজে বার করতে হবে— মূল্যায়ন এবং প্রথানুগ পরীক্ষার মাধ্যমে বিস্তৃত অসুবিধার ক্ষেত্রগুলি অনেক সময় চিহ্নিত করা যায়। এর জন্য বিশেষ পরীক্ষা উপকরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। সাক্ষরতা এবং গণিতের সংখ্যা জ্ঞান শেখানোর মৌলিক ক্ষেত্রে একে যুক্ত করতে হবে কিন্তু বিষয়ের এলাকার যেন এর অনুপ্রবেশ না ঘটে।

### ৩.১১.২ শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন

শিশুর অর্জিত জ্ঞানের বিস্তৃতি এবং মানের ভিত্তিতে প্রস্তুত অর্থপূর্ণ প্রতি বেদনটি অবশ্যই বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন। একটি পাঠক্রম যেখানে সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনীশক্তি এবং সমগ্র সত্তার বিকাশই হল লক্ষ্য, সেখানে রুটিনমাফিক কিছু পরীক্ষা যেটি কেবল শিক্ষার্থীর মুখস্থ উগরে দেওয়া ভাষ্য এবং পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক বস্তাপচা পাঠের মূল্যায়ন করে, তার সাহায্যে এ বিষয়ে কিছুই বোঝা যাবে না। মূল্যায়নের বিশ্লেষণ এবং তার ভিত্তিতে ফিরে দেখা এই প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন সংকেত চিহ্নের সন্ধানে এবং তাদের নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত করার উদ্যোগ নিতে হবে। কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে পড়ুয়ার অগ্রগতি খুবই সহজে দু একটা পরীক্ষায় বলে দেওয়া যায়। কিন্তু শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মনোভাব, আগ্রহ এবং স্বাধীনভাবে শেখার ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে এগুলিই হল মূল্যায়নের বিষয়।

### ৩.১১.৩. শিক্ষাদানকালেই মূল্যায়ন

প্রকৃতপক্ষে মূল্যায়নের প্রতিবেদন তৈরি করার অর্থ হল আসলে প্রতিটি শিশু সম্পর্কে শিক্ষক পৃথকভাবে কিছুটা সময় ভাবনা চিন্তায় ব্যয় করবেন এই পর্বকালে কী শিখেছে, কোন কাজ করার দরকার হয়েছে এবং কোনো উন্নতি হয়েছে কি না, সবই মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষকরা যদি প্রতিটি শিশুর বিকাশ সম্পর্কে পৃথকভাবে চিন্তা করতে পারেন, তাদের অসুবিধার ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে তাদের প্রয়োজনীয় বিধান দিতে পারেন, তবেই মূল্যায়নের প্রতিবেদন লেখার যোগ্যতা তাঁরা অর্জন করবেন। এর জন্য বিশেষ পরীক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই— প্রতিদিনকার শিক্ষাদানের মধ্যেই এরকম পর্যবেক্ষণ এবং তার ভিত্তিতে শিশুদের মানের মূল্যায়ন এ সবই একইসঙ্গে বহমান থাকতে পারে। প্রতিদিন এরই ভিত্তিতে যদি শিক্ষক দিনলিপিতে তাঁর নিরীক্ষণ লিখে রাখেন তাহলে সেটিই হবে ধারাবাহিক সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ। (একজন শিক্ষকের এইরকম দিনলিপি থেকে একমাসের নিরীক্ষণ নিম্নে দেওয়া হল।

'কিরণ বেশ আনন্দে কাজ করে, যে বইগুলো ছোট কিন্তু তথ্যে ঠাসা সেগুলোই ওর বিশেষ পছন্দ। ওর

বক্তব্য সহজ, পরিষ্কার ভাষা ও ভালোবাসে। কোন বিষয়ে লিখতে বললেও খুব ছোট ছোট উত্তর লেখে। ও বলে এতেই ও সব কিছু সহজে বুঝতে পারে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষেই সব সময় কথা বলে ও।' এইভাবে বিভিন্ন স্তরে শিশুদের কাজকর্ম সম্পর্কে নমুনা ও প্রতিবেদন প্রতিদিন দিনলিপিতে লিখে রাখলে সেটি শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ের কাছে শিক্ষাদানের অগ্রগতির প্রণালীবদ্ধ প্রতিবেদন হিসাবে প্রতিভাত হয়।

মূল্যায়নের সাহায্যেই শিক্ষার্থীর অসুবিধা চিহ্নিত করে সেটিকে সহজে দূর করা যায়— এ ধারণা প্রায়শই অবাস্তব প্রতিপন্ন হয় এবং শিক্ষাদানের অভ্যস্ত পদ্ধতির অনুধাবনের ভিত্তিতে এই মন্তব্য করা হয়েছে বলে মনে হয় না। ধারণার বিকাশ সংক্রান্ত সমস্যা ঐ প্রথাসিদ্ধ পরীক্ষায় নির্ণীত হয় না কিংবা নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষায় প্রয়োজনও পড়ে না। পড়ানোর সময় শিক্ষক নিজেই এই সব সমস্যা বুঝতে পারেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করে এর প্রত্যুত্তরে শিশুদের চিন্তা বা কথার মধ্যেই তিনি এর লক্ষণ দেখতে পারেন। শিক্ষাদানের কাজে যুক্ত হবার সময় একটা বিষয় তার কাছে স্পষ্ট হওয়া চাই যে, শিক্ষাদানের এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত নমনীয় এবং শিক্ষার্থী এবং তাদের জ্ঞানের সাপেক্ষে নিয়ত পরিবর্তনশীল।

### ৩.১১. ৪ পাঠক্রমের এমন ক্ষেত্র, 'প্রদত্ত নম্বরে মূল্যায়ন' যার পক্ষে অসম্ভব

পাঠক্রমের প্রতিটি অংশকেই 'পরীক্ষিত' হতে দেওয়া চলে না। অনেকক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রকৃতি এমনও হতে পারে যাকে পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করানো অনৈতিক। এইসব ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে, স্বাস্থ্য, শারীরিক শিক্ষা, সঙ্গীত এবং শিল্পকলা, শরীরশিক্ষা এবং যোগব্যায়ামের দক্ষতা ভিত্তিক মূল্যায়ন যেখানে পরীক্ষা করা যায়, সেখানে ধারাবাহিক এবং ঋণাত্মক মূল্যায়ন স্বাস্থ্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রয়োজনীয়। সম্প্রতি এই কারণেই পাঠক্রমে এই সব বিষয়কে 'কম গুরুত্বপূর্ণ' মনে করা হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে রসদের জোগান অপর্যাপ্ত, সঠিক পরিকল্পনার অভাব এবং বিশেষ গুরুত্ব সহকারে এ বিষয়ে ভাবাও হয় না। তার ওপর এর জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমাকে অন্য বিষয়ে বিশেষ পাঠের ব্যবস্থা করার জন্য ছাঁটাই করা হয়। পাঠক্রমে শিক্ষার গভীর তাৎপর্য এবং ক্ষমতা সম্পর্কে যে চিন্তন রয়েছে এই সব কাজে তাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে অন্যভাবে সমঝোতা করা হয়।

**যোগ্যতা**

যোগ্যতা হল পাঠ্য পুস্তকের ভাসা-ভাসা বিষয় থেকে শিক্ষণপদ্ধতি এবং তার মূল্যায়নের কেন্দ্রবিন্দুতে কঠিন বাস্তবের মাটিতে স্থানান্তরণের একটি প্রচেষ্টা। অবশ্য ALL দৃষ্টিভঙ্গিতে যোগ্যতাকে আরো অনেক ছোট ছোট শ্রেণীতে এবং উপ-দক্ষতার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে এবং এদের যোগফলকেই সামগ্রিকভাবে যোগ্যতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রায়শই, ব্যবহার এবং কর্মকৃতিকেই মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে চিহ্নিত করার ফলে যোগ্যতা ধারণাটি বাস্তবের মাটিতে দাঁড়াতে পারে না। শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের বিচারে, উপদক্ষতায় এবং কঠিন সময়-সীমায় নিয়ন্ত্রণে এই যৌক্তিক অথচ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনেক ভাবনাই প্রতিফলিত হয় না যেমন, শিক্ষাদান এবং যোগ্যতার ব্যবহার উভয়ই যে অনেক বেশি নমনীয় এবং আপেক্ষিক হতে পারে বা যে সময়সীমায় যোগ্যতা অর্জনের শিক্ষা দেওয়া হয় সেটি হিসেব করে-দেওয়া নির্ধারিত গতি বা সময়সীমার সঙ্গে হয়ত মেলে না কিংবা খণ্ড খণ্ড অংশের যোগফল হয়ত কখনো সমগ্রকে ছাপিয়ে যেতে পারে ইত্যাদি।

এইসব বিস্তারিত তালিকার জন্য শিক্ষার বিষয়গুলি এবং তাদের পরীক্ষাসূচীর নকশা তৈরি করা এবং শিক্ষার এই পরিণতি অনুযায়ী পড়ানো দুটিই অবাস্তব এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির বিচারে ত্রুটিপূর্ণ।

এমনকি এইসব ক্ষেত্রেও নম্বর দেওয়া যেতে পারে, এবং সেটি শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির মূল্যায়ন হতে পারে। কিন্তু এইব বিষয়ে শিক্ষাদানের যে মর্মকথা অর্থাৎ অংশগ্রহণ, আগ্রহ, নিবিষ্টতার মাত্রা, এ ক্ষেত্রে তার দক্ষতা ও

সক্ষমতা কতখানি— এগুলিই শিক্ষকের কাছে কোন শিক্ষার্থী অগ্রগতি বোঝার মাপকাঠি হতে পারে। এই শিক্ষা থেকে শিশুটি কী শিখবে অথবা কীভাবে এটি তার কাজে লাগছে, সে কথা এদের সাহায্যে শিক্ষক অনুমান করে নিতে পারেন। নিজেদের শিক্ষা সম্পর্কে শিশুদের যদি প্রশ্ন করা হয়, কতটা শিখতে পারল যদি তা জানতে চাওয়া হয়, তাহলেই শিশুর শিক্ষা সংক্রান্ত অগ্রগতির প্রসঙ্গে শিক্ষকের অন্তর্দৃষ্টি উদ্ভাসিত হতে পারে এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি কিংবা পাঠক্রমের উন্নতি সাধনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় 'ফিরতি স্রোতের' হালচাল বুঝে নেওয়া সম্ভব।

### ৩.১১.৫ মূল্যায়নের নকশা এবং আচরণবিধি

মূল্যায়ন এবং পরীক্ষা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য হবে এবং শিক্ষার্থী কতটা জানে তা পরিমাপের জন্য সেগুলি স্বীকৃত পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রস্তুত করতে হবে।

যতদিন পর্যন্ত এইসব পরীক্ষা আর যোগ্যতা বিচারে কেবল শিশুর স্মরণশক্তি আর পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান উগরে দেবার ক্ষমতার বিচার করা হবে, ততদিন প্রকৃত জ্ঞানার্জনের অভিমুখে পাঠক্রমের দিক পরিবর্তনের সমস্ত প্রচেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাবে। প্রথমত জ্ঞানভিত্তিক বিষয়ের ক্ষেত্রে পরখ করার অর্থ হল, শিশুরা কী শিখেছে, এবং সমস্যা-সমাধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞানকে তারা কতটা কাজে লাগাতে পারছে তার পরিমাপ করা। সেইসঙ্গে শিক্ষার্থীকে যদি শেখানো হয় যে এই তথ্য সে কোথায় পাবে, নতুন তথ্যকে কেমন করে ব্যবহার করতে হয় এবং সেগুলিকে কেমন করে বিচার বিশ্লেষণ করা যায় তবে পরীক্ষার সত্তে তার চিন্তন পদ্ধতির পরিমাপ করাও সম্ভব হয়।

মূল্যায়নের জন্য যে প্রশ্নাবলী তৈরি করা হবে সেগুলো এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে পাঠ্যপুস্তকে যা লেখা আছে তার বাইরেও কিছু লেখা যায়। প্রায়শই শিশুদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে কেননা যদি তারা নির্দেশিকা-পুস্তকে যা লেখা আছে তার বাইরে কিছু বলে বা বলতে চায় তবে শিক্ষকেরা তাদের উত্তর মেনে নেন না।

প্রশ্নগুলি উন্মুক্ত প্রকৃতির হবে এবং তাতে শিক্ষার্থীকে চ্যালেঞ্জ জানানোর পদ্ধতিও ব্যবহার করা যেতে পারে। পরখ করার ভালো বিষয়বস্তু এবং প্রশ্ন তৈরি করা এক ধরণের শিল্পকলা এবং শিক্ষকেরা এ বিষয়ে চিন্তার জন্য অনেক দীর্ঘ সময় ব্যয় করবেন আর এই ধরণের প্রশ্ন তৈরী করবেন। জেলা কিংবা রাজ্যস্তরে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষকদের ভাল প্রশ্ন তৈরি করার আগ্রহ বা দক্ষতা বাড়ানো যেতে পারে। সমস্ত প্রশ্নপত্রের ছক এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে কঠিন প্রশ্নের পাশাপাশি সমস্ত শিক্ষার্থীরা একটা স্তর পর্যন্ত সাফল্যের স্বাদ পেতে পারে তার জন্য যথেষ্ট পরিসর রাখতে হবে এবং প্রশ্নের উত্তর ও সমাধানের মাধ্যমে পড়ুয়ারা যাতে নিজেদের দক্ষতায় আস্থাশীল হয় সেদিকে নজর দিতে হবে।

সামনে বই খুলে দিয়ে শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা করার পদ্ধতি প্রণয়নের উদ্যোগ আমাদের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। বিদ্যালয়ের সব স্তরেই আমাদের পাঠক্রম প্রবর্তনের প্রচেষ্টার এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে লিখিত বিষয়বস্তুর মধ্যে যে তথ্য ও যুক্তি আছে তার প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার ওপর শিক্ষক ও প্রশ্ন নির্মাতাদের বিশেষ জোর দেবার চেষ্টা করতে হবে। ব্যাপক স্তরে যে এভাবে পরীক্ষা নেওয়া যায় তার অনেক সফল উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে। এইসব পরীক্ষার ফলাফল বিচারের সময় শিক্ষকদের উপর যেন বিশ্বাস রাখা যায় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এছাড়া পরিকল্পিত কাজ এবং গবেষণাকাজের মূল্যায়ন অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য এবং গভীর হবে।

শিক্ষার্থীদের হাতে সংশোধিত করা উত্তরপত্র ফেরত দেবার পর, তারা আবার সেগুলো লিখবে এবং এইভাবে তারা কতটা শিখতে পারল বা এই পরীক্ষা থেকে তারা কতটা লাভবান হল তারও মূল্যায়ন করা যাবে।

প্রতিযোগিতা প্রেরণাদায়ী বটে কিন্তু সে প্রেরণা মূলত বহিরঙ্গের, অন্তরপ্রকৃতির নয়। একে প্রতিষ্ঠা করা এবং সঞ্চারিত করা সহজ। সে কারণেই শিক্ষকের এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থা প্রতিভাবানদের লালন-পালন এবং সৃষ্টির একটি উপায় হিসাবে প্রায়শই একে কাজে লাগায়। একেবারে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুদের মানভিত্তিক যোগ্যতা নির্ণায়ক 'ক্রমিকতা' শুরু হয়ে যায় এবং এইভাবে তাদের মনে প্রতিযোগিতার বীজ বপন করা হয়। অথচ এর অনেক নেতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। বেশিরভাগ সময়েই শিক্ষার্থী ভাসাভাসা জ্ঞান অর্জন করে। অথচ সেটিকেই সে বাইরের প্রতিষ্ঠা লাভের উপায় বলে মনে করে এবং এরই সাহায্যে সে অতি সহজেই অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু যত সময় কাটে, ততই শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়ে উদ্যোগ নেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে কিংবা নিজের আগ্রহে কোনো কাজই করতে পারে না এবং যেসব ক্ষেত্র তেমনভাবে চিহ্নিত নয় সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহেলা করে। শ্রেণীকক্ষের সংস্কৃতির এই অস্বাস্থ্যকর পরিণতিতে পরবর্তীকালে শিশুরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মসর্বস্ব এবং কোনোরকম যৌথ কাজের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এছাড়া পর্বান্তরিক পরীক্ষাগুলিকে অত্যন্ত বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হচ্ছে এবং ক্রমশই অকারণে এদের সমস্ত ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ভাবা হচ্ছে। কখনও কখনও গোপনীয়তা কঠিন ঘেরাটোপে, কড়া নজরদারির মধ্যে একে রাখা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের মধ্যস্তর পর্যন্ত অবশ্য এর শারীরিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক ফলাফল তেমন একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু শিক্ষার উচ্চস্তরে এটি ছেলেমেয়েদের সামনে সাংঘাতিক মানসিক চাপ হিসাবে দেখা দেয় এবং অল্পেই তাদের শক্তি নিঃশেষ করে দেয়। বিদ্যালয়গুলি এবং শিক্ষকেরা নিজেদেরই প্রশ্ন করতে পারেন যে সত্যিই কি এই অভ্যস্ত ব্যবস্থায় কোনো লাভ হচ্ছে এবং এই ধরণের নম্বর দেওয়া আর ক্রমিক মান নির্দেশ কি জ্ঞানের বিস্তৃতির জন্য আদৌ প্রয়োজন?

### ৩.১১.৬ আত্মমূল্যায়ন এবং ফিরে-পাওয়া তথ্য

এই ব্যবস্থায় শিক্ষার যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য পূরণে শিক্ষক এবং পড়ুয়া একত্রে কতদূর উন্নতি করতে পেরেছে এবং কীভাবে একে আরো ভাল করা যায় তার পরিমাপ করাই মূল্যায়নের কাজ। যে পরীক্ষা এবং মূল্যায়নকে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ভয় দেখানোর অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয় সেটি ব্যতিরেকেই মূল্যায়নের ফলাফলে পুষ্ট ফিরতি জ্ঞানের সুবিধা কাজে লাগিয়ে পুনঃ পুনঃ পাঠ এবং উপস্থাপনায় ক্রমাগত উন্নতি ঘটানো যায়।

পরীক্ষার ক্রমমান নির্ণয় এবং ত্রুটি সংশোধনের কাজটি শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে করতে পারলে পরিণতিতে তারা উত্তরের ঠিক বা ভুলের সন্ধান পেয়ে যায় এবং তার সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাও বুঝতে পারে। শিশুদের যদি প্রশ্ন করা হয় যে তারা কী করেছে বা কেন এই উত্তর লিখল, তবে লিখিত উত্তরের ভিত্তিতে শিশুদের চিন্তা করতে শেখানোর কাজে শিক্ষকের সুবিধা হয়। এই প্রক্রিয়ায় একটি পরীক্ষাকে জড়িয়ে নম্বর পাবার যে সাংঘাতিক ভয় শিক্ষার্থীকে সবসময় ঘিরে থাকে সেটা কেটে যায়। শিশুরা তাদের ভুলগুলি বুঝতে, সেগুলি সংশোধন করতে এবং তার ভিত্তিতে নিজেকে সংশোধন করতে শেখে। অনেক সময় প্রধান শিক্ষকেরা এই মর্মে আপত্তি জানান যে, শিক্ষার্থীদের সামনেই ভুল সংশোধন করলে পরীক্ষা ব্যবস্থা তার নৈর্ব্যক্তিকতা হারাবে। এটি ভুল ধারণা কেননা প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় শিশুকে বিচার করা হবে এ বিশ্বাস থেকেই 'নৈর্ব্যক্তিকতা'র উদ্ভব। শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ বিশ্লেষণের স্থলে ভুলভাবে এই 'নৈর্ব্যক্তিকতা'র ধারণা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে।

কেবলমাত্র শিক্ষার ফলাফল নয়, শিক্ষার অভিজ্ঞতারও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গেই নিজেদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মন্তব্য করবে। ব্যক্তি এবং দলগত অভ্যাসের ছক এমনভাবে করা যায়, যাতে তারা নিজেদের শেখার অভিজ্ঞতা বিচার করতে এবং তার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়। এইসব অভিজ্ঞতার সাহায্যে তারা 'শিখতে শেখা'র জন্য যে আত্মনিয়ন্ত্রণী সক্ষমতার আবশ্যক তা অর্জন করতে পারে। এই ফিরে-পাওয়া তথ্য শিক্ষকের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান কেননা এগুলিকে তিনি সমগ্র শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার পরিমার্জনের কাজে ব্যবহার করতে পারেন।

প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে শিশুদের সঙ্গে কথোপকথন, বাদানুবাদে তাদের নিজেদের কাজের মূল্যায়ন প্রয়োজন। কীভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে, তাদের মধ্যে যোগ্যতা বিকশিত হয়েছে কি না সেটা কীভাবে যাচাই করা যাবে — এই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। এমনকি অল্পবয়সের শিশুরাও-কী তারা পারে আর কী পারে না সে বিষয়ে অনেক সঠিক মূল্যায়ন করতে পারে। শিক্ষকের ভূমিকা হল প্রত্যেকে যাতে তার সর্বোচ্চ সাধ্যমতো শিখতে পারে তার সুযোগ করে দেওয়া এবং বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য শিক্ষার অভিজ্ঞতা লাভে তাকে সাহায্য করা যাতে তার বৌদ্ধিক গুণাবলী, শারীরিক ও ক্রীড়া সংক্রান্ত গুণাবলী এবং কার্যক ও নান্দনিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে।

প্রতিবেদন লিপিটি এমন হবে যাতে পিতামাতা ও শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার বিকাশের সামগ্রিক এবং সুস্পষ্ট চিত্র উপস্থাপিত করা যায়। শিক্ষকেরা অবশ্যই প্রতিটি শিশু/শিক্ষার্থী সম্পর্কে পৃথকভাবে কিছু বললেন। এর ফলে তাদের মনে ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ পাবার অনুভূতি জাগবে, একটি ইতিবাচক ব্যক্তি-সত্তা গড়ে উঠবে এবং কাজ করার জন্য তাদের মনে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। নম্বর বা গ্রেড যাই দেওয়া হোক না কেন শিক্ষকের পক্ষ থেকে পৃথকভাবে এই মূল্যায়নকে সমর্থন করে একটি গুণাত্মক প্রতিবেদন উপস্থাপিত করতে হবে। প্রতিটি শিশুর সঙ্গে একমাত্র এইরকম ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে তবেই শিক্ষকেরা তাদের প্রভাবিত করতে পারবেন, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাদের কিছু দিতে পারবে না। প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে শিক্ষকের মূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে, শিশুরাও প্রত্যেকে নিজের মূল্যায়ন করবে এবং সেটিও প্রতিবেদন লিখিতে শেখা থাকবে।

**বিহ্বল প্রশ্ন**

একটি লৌহ বিগলন কারখানা গড়ে তোলার সময় কোনো প্রধান চারটি বিষয় বিচার করতে হবে তা বিবৃত কর

একজন কিংবা শিল্পপতি যদি একটি লৌহ বিগলন কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে চান তবে তিনি কোন অঞ্চলটি নির্বাচন করবেন এবং কেন?

কীভাবে একটি পাখির ঠোঁট অভিযোজনে সাহায্য করে?

অথবা তোমার চারপাশে পরিচিত একটি পাখির ছবি আঁকো। তার ঠোঁটের আকার অনুযায়ী ব্যাখ্যা করো যে, তার খাদ্যাভ্যাস কী এবং তোমার আশেপাশের অঞ্চলে কোথায় সে খাবার খুঁজে পায়।

বর্তমানে বহু প্রতিবেদন লিপিতে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের সম্পর্কে নানান তথ্য থাকে এবং শিশুদের বিকাশের অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন তাদের স্বাস্থ্য, শারীরিক সক্ষমতা, খেলাধূলায় দক্ষতা, সামাজিক দক্ষতা এবং সক্ষমতা, শিল্পকলা এবং চারুশিল্প দক্ষতা এই সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ থাকে। শিশুদের শিক্ষা এবং বিকাশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুণাত্মক বিবৃতিতে শিক্ষা সংক্রান্ত মূল্যায়ন আরো বেশি সামগ্রিক হয়ে ওঠে।

### ৩.১১.৭ যেসব ক্ষেত্রে নতুন চিন্তন প্রয়োজন

পাঠক্রমের এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেগুলির মূল্যায়ন করা যেতে পারে, কিন্তু সে কাজের জন্য এখনো আমাদের হাতে নির্ভরযোগ্য এবং যথোপযুক্ত যন্ত্রাদি নেই। এর মধ্যে রয়েছে দলগত অংশগ্রহণে অর্জিত শিক্ষা এবং শিক্ষার অন্যান্য সব ক্ষেত্র, যেমন থিয়েটার, কাজ এবং চারুশিল্প যেখানে সময়ের অনেক দীর্ঘ ব্যাপ্তিতে দক্ষতা ও যোগ্যতা বিকশিত হয় এবং সেজন্য প্রয়োজন পড়ে সযত্ন পর্যবেক্ষণের। এই সব ক্ষেত্রে যা কিছু শেখা হল তার মূল্যায়ন সম্ভব হয় না।

ধারাবাহিক এবং সুস্পষ্ট বিশ্লেষণকেই একমাত্র অর্থপূর্ণ বিশ্লেষণ হিসাবে গণ্য করা হয়। কোন একটি ব্যবস্থায় একে যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে হলে অনেক বেশি সতর্ক চিন্তনের প্রয়োজন। এই ধরণের বিশ্লেষণের জন্য শিক্ষকদের কাছ থেকে আরো বেশি সময় চেয়ে নিতে হয় এবং নির্দিষ্ট ভাবে বিশদে শিশুদের অগ্রগতি লিখে রাখার জন্য তাঁর আরো দক্ষতার প্রয়োজন হয়। তবেই এটি অর্থপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা যায় এবং মূল্যায়ন নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এই মূল্যায়নের নামে যদি কেবলমাত্র শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ বাড়িয়ে দেওয়া হয়, কিংবা দিনলিপির মূল্যায়নের পাতাগুলি শিক্ষার্থীদের ওপর শিক্ষকের ক্ষমতা জাহির করার ক্ষেত্র হয়, তবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই পরাজিত হবে। এই ধরনের মূল্যায়নের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন পদ্ধতি রূপায়ণ করা না যাচ্ছে, ততদিন শিক্ষকদের ঐ সীমাবদ্ধ মূল্যায়নের পদ্ধতিই ব্যবহার করতে হবে। তবে এরই মধ্যে দক্ষতা বিচারের আরো অন্যান্য ক্ষেত্র সংযুক্ত করতে পারলে মূল্যায়ন পত্রটি কিছুটা অর্থবহ ও কার্যকরী হয়ে উঠবে।

পরিশেষে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করতে হবে যাতে এর ফিরে পাওয়া তথ্যে আমাদের পুনর্মূল্যায়নের কাজ অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

### ৩.১১.৮ বিভিন্ন স্তরে মূল্যায়ন

ECCE এবং প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী :

এই পর্বে শিশুর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয়তা এবং তার স্বাস্থ্য ও শারীরিক বিকাশের মূল্যায়ন, প্রতিদিনের কথোপকথন ও বাদানুবাদের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ— এই সমস্ত সংকেতের সম্পূর্ণ গুণাত্মক বিচারে মূল্যায়ন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই, মৌখিক বা লিখিত যাই হোক না কেন, কোনোরকম পরীক্ষা নেওয়া চলবে না।

**প্রাথমিক স্তরের তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণী ঃ** মৌখিক থেকে শুরু করে লিখিত পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ— বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। শিশুদের জানাতে হবে যে তাদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে কিন্তু একে তারা যেন শিক্ষাদানের একটা অঙ্গ হিসাবে মনে করে, পরীক্ষা যেন তাদের কাছে একটা অবিরাম ভয়ের বিষয় হয়ে না ওঠে। জ্ঞানার্জনের গুণাত্মক বিচার সহ নম্বর ও গ্রেড এবং সেই সঙ্গে যেসব ক্ষেত্রে মনোযোগ প্রয়োজন তাদের বিশেষ উল্লেখ এই পর্বে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চম শ্রেণী থেকে মূল্যায়নের কার্ডে শিশুর নিজস্ব মূল্যায়নও প্রতিবেদনের একটা অংশ হয়ে উঠতে পারে। পরীক্ষার পরিবর্তে বরং সময়ান্তরে পরখ করে নেবার প্রক্রিয়া চালু করা যেতে পারে সেগুলি সবই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রভিত্তিক হবে। সপ্তম শ্রেণীর পর থেকে পর্বান্তরিক পরীক্ষা পদ্ধতি শুরু করা যেতে পারে যখন শিশুরা মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পাঠের দীর্ঘ অংশ বুঝে, নিজেই প্রস্তুতি নেবার উপযুক্ত হয়ে উঠবে এবং বেশ কয়েক ঘণ্টা যাবৎ পরীক্ষা হলে বসে প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে।

আবারও উন্নতিজ্ঞাপক কার্ডে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ছাড়াও তার সামগ্রিক উন্নতির বিষয়ে নানান তথ্য এবং পিতামাতার উদ্দেশ্যে কিছু পরামর্শ লেখা থাকবে।

মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী) ঃ আরো পরীক্ষা এবং পরিকল্পিত কাজের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, পাঠক্রমের জ্ঞানভিত্তিক ক্ষেত্রের জন্য ব্যক্তিগত মূল্যায়ন সহ সামগ্রিক বিচারে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ণ করতে হবে। আত্ম বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির মূল্যায়ন করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দক্ষতা/ জ্ঞানের ক্ষেত্র এবং শতাংশ হিসাব ইত্যাদি সহ আরো বেশি বিশ্লেষণ সহ প্রতিবেদনটি উপস্থাপিত করতে হবে। এতে পাঠের কোনো অংশটির প্রতি তার বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন সেটি শিক্ষার্থী বুঝতে পাররে। এছাড়া ভবিষ্যতে অধ্যয়নের জন্য কোন ক্ষেত্রটি সে নির্বাচন করবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এই মূল্যায়ন-সূচক প্রতিবেদনটি সহায়ক হয়ে উঠবে।

শিশুর ওপর এভাবে ভার চাপানো সত্যি নিষ্ঠুরতা।
আমি তাই আমার ছেলেকে সাহায্য করার জন্য এই ছেলেটিকে ভাড়া করেছি।
সৌজন্য : আর. কে. লক্ষণ, টাইমস্ অফ ইন্ডিয়ায় ।

# চতুর্থ অধ্যায়
## স্কুল এবং শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ



যখন ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই পরস্পরের ওপর আনুষ্ঠানিক ও ঘরোয়া ভাবে প্রভাব বিস্তার করে তখন সামাজিক সম্পর্কের বাঁধনের মধ্যে শিক্ষা ঘটে । স্কুলগুলো হচ্ছে ছাত্র-শিক্ষক সমেত শিক্ষার্থী সম্প্রদায়ের প্রাতিষ্ঠানিক জায়গা। বন্ধুদের সঙ্গে খেলা আর মারপিট, বিরতির সময়ে আড্ডা, ভোরের জমায়েত, প্রার্থনায় বা অন্য উৎসব আর উল্লেখযোগ্য দিনগুলোতে একসঙ্গে জড়ো হওয়া, শ্রেণীকক্ষে পড়া করা, ক্লাস-পরীক্ষার আগে ছটফট করে পাতা উলটে চলা আর স্কুলের বাইরে নিজের বন্ধুদের ও শিক্ষকদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া — এ সমস্ত কাজকর্মই সম্প্রদায়কে এককাট্টা করে তাকে পরিচিত করে শিক্ষার্থী সম্প্রদায় বলে। স্কুলকে তার পরিচয় দেওয়ার আড়ালে কিছু উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষিক/শিক্ষিকাদের দৈনন্দিন বাঁধা ধরা কাজে, পরীক্ষা নেওয়া এবং বিশেষ ঘটনাগুলোর পরিকল্পনা যা স্কুল ক্যালেন্ডারকে চিহ্নিত করে। আমরা কীভাবে স্কুলে ও শ্রেণীকক্ষে পড়ানো ও শেখানোর পারস্পরিক ক্রিয়াকে ধরে রাখার ও বাড়ানোর পরিবেশ তৈরি করতে পারি? কীভাবে স্কুল এলাকাকে সমৃদ্ধ করা যায় যেখানে ছোটরা নিজেদের নিরাপদ, সুখী, দরকার মনে করবে আর শিক্ষকরাও খুঁজে পাবেন পেশাগত আনন্দ? পরিবেশের এই প্রাকৃতিক ও মানসিক বিস্তার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই অধ্যায়ে এ ধরনের পরিবেশ কীভাবে শিশুশিক্ষার ওপর লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলে আমরা বুঝতে ও বিচার করতে চেষ্টা করব।

### ৪.১. প্রাকৃতিক পরিবেশ

বাঁধা সময়ে বা তার বাইরে সমানে শিশুদের সঙ্গে জানিত বা অজানিত প্রাকৃতিক পরিবেশের আদান প্রদান চলে। তবু শিক্ষার জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রায়শই শ্রেণীকক্ষগুলো ভিড়ে উপচে পড়ে, শেখার এমন কোনো বিকল্প জায়গা নেই যা শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় লোভনীয় বা মনোমতোও হয়। স্কুলের নকশা ঠিকঠাক না-হলে শিক্ষকদের সম্পূর্ণ কাজকর্মের ওপর এবং স্কুল পরিচালনার কাজের বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

ঘটনা হলো, এ ধরনের ঘেরাটোপে প্রাকৃতিক পরিবেশ শুধু শিক্ষাগত কাজেই আবদ্ধ থেকেছে।

শিশুদের কী ধরনের জায়গা পছন্দ জিজ্ঞেস করলে তারা সবসময়েই থাকতে চায় রঙ বেরঙের প্রচুর খোলামেলায় আর তার সঙ্গে, জন্তু জানোয়ার, গাছপালা, খেলনা আর ফুলে ভরা একটা জায়গায়। বাচ্চাদের স্কুলে ধরে রাখতে আর আকর্ষণ বাড়াতে স্কুল পরিবেশের ভেতরে ও বাইরে ঐ সব জিনিস থাকা উচিত।

শ্রেণীকক্ষগুলোকে উজ্জ্বল করতে প্রথমেই ভেতরে যথেষ্ট প্রাকৃতিক আলো বাড়ানোর কাজ করতে হয়। তার পর বাচ্চাদের হাতের কাজ দিয়ে শ্রেণীকক্ষের ও স্কুলের অন্য জায়গা প্রদর্শনের মাধ্যমে সাজিয়ে দেওয়া যায়। ড্রয়িং, ও হাতের কাজ দিয়ে সাজানো শ্রেণী কক্ষের দেয়াল ও তাক শিশুদের আর অভিভাবকদের কাছে তাদের কাজের প্রশংসার শক্তিশালী বার্তা পৌঁছে দেয়। এমন জায়গায় আর উচ্চতায় একে রাখতে হবে যাতে স্কুলের নানা বয়সের বাচ্চারা দৃশ্যত অনায়াসে তার নাগাল পেতে পারে। আমাদের বেশির ভাগ স্কুল ভাঙা অপরিষ্কার বাড়িতে নীরস, বৈচিত্র্যহীন, অনুৎসাহী প্রাকৃতিক পরিবেশে তাদের কাজ চালিয়ে যায়। এই অবস্থাকে বদলানো যায় স্কুল শিক্ষক, প্রশাসক আর ছাত্র ও অভিভাবকদের মিলিত চেষ্টার সহজ সহজ উদ্ভাবনে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে স্কুলের বাড়িগুলো হলো সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রাকৃতিক সম্পদ। সবচেয়ে বেশি শিক্ষাগত মূল্য তাদের থেকে পাওয়া যায়। বাস্তবানুগ ও সৃষ্টিশীল উপায়ের মধ্যে দিয়ে স্কুল বাড়ি সারানো বা উন্নতি অথবা নতুন বাড়ি তৈরির সময় তার শিক্ষাগত মূল্য সবচেয়ে বেশি করা যায়।

**প্রাকৃতিক পরিসরে শিক্ষা:** শিশুরা নানা বোধের বিশেষ করে স্পর্শগত এবং দৃশ্যগত মাধ্যমে বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করে। ত্রিমাত্রিক পরিসর শিশুকে দেয় এক অনন্য শিক্ষার পরিবেশ কারণ তা পাঠ্যবই অথবা ব্ল্যাকবোর্ডের সঙ্গে নানা সংবেদন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার পরিচয় করায়। দূরত্ব সম্পর্কিত মাত্রা, বুনন, আকার, কোণ, গতি এবং পরিসরগত গুণ যেমন ভেতর-বাইরের সুসঙ্গতি, ইত্যাদিকে ভাষা, বিজ্ঞান, অঙ্ক এবং পরিবেশের এই সব ধারণাগুলি বুঝতে ব্যবহার করা যায়।

**শ্রেণীকক্ষ পরিসর:** জানলার গ্রিলগুলো লেখার আগের পর্যায়ে বাচ্চাদের দক্ষতা বাড়াতে সাজানো যায় যা ভগ্নাংশ বুঝতে সাহায্য করে। এক সারি কোণ দরজার পাল্লার তলায় মেঝেতে চিহ্ন লাগিয়ে কোণের ধারণার ব্যাখ্যা করা যায় অথবা শ্রেণীকক্ষের কাপবোর্ড সাজিয়ে লাইব্রেরি হিসেবে ব্যবহার করা যায় বা পাগরি ব্লেডে নানা রঙের চাকা রঙ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়ত পরিবর্তনের মজা তৈরি করা যায়।

**আধা খোলা বা খোলা মাঠ:** চলমান ছায়ার খুঁটি নাড়িয়ে বিভিন্নভাবে সময় মাপা যায়। শীতে পর্ণমোচী গাছ লাগিয়ে আর গ্রীষ্মে সবুজ পাতা এক মনোরম শিক্ষার খোলা বাতায়ন তৈরি করে। এক রোমাঞ্চকর খেলার মাঠ এখানে গড়ে তোলা যায় বাতিল টায়ার দিয়ে। কাউন্টারের জায়গা দিয়ে বাস, ট্রেন, ডাকঘর, দোকানঘর চালানোর খেলা করা যায়। কাদা-বালি দিয়ে পাহাড়, নদী, উপত্যকা বা পার্শ্বরেখায় সুরকি ব্যবহার করে ভারতের মানচিত্র আঁকা যায়।

**তিনমাত্রার পরিসরের সন্ধান:** বাইরের খোলা প্রকৃতিক পরিবেশে উদ্ভিদ ও গাছের খোলা জায়গা বা প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রশ্রয় দেয় শিশুদের নিজের শিক্ষার উপাদান বানাতে, অনুসন্ধানে, আনাচ-কানাচ আবিষ্কারে, ভেষজ বাগান বানাতে আর বৃষ্টির জলে ফসল কাটা দেখতে ও তার অভ্যেস করতে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের বিস্তারে শুধু বাইরের বদলই নয় বরং প্রাকৃতিক পরিসরের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষণপ্রণালী শিশুদের মজ্জাগত রূপান্তর ঘটায়। দেশের অনেক প্রান্তেই স্কুল ও শ্রেণীকক্ষগুলোর দেয়ালে স্থায়ী প্রদর্শনী আঁকা থাকে। এ ধরণের দৃশ্য সময়ের সঙ্গে অতি উদ্দীপনায় একঘেয়ে হয়ে পড়ে এবং জায়গার মাহাত্ম্যগুণ বাড়ায় না। ছোট মাপের বদলে প্রমাণ মাপের মুরাল স্কুলের প্রদর্শনীতে নতুন রঙ যোগ করতে পারে। বেশির ভাগ প্রদর্শনীর দেয়ালকে বাচ্চাদের নিজেদের কাজ দিয়ে বা শিক্ষকদের তৈরি নকশা দিয়ে ভরানো উচিত। আর এগুলো প্রতি মাসে পাল্টানো দরকার। এই ধরনের দেয়াল প্রদর্শনী তৈরি করা আর তাদের তুলে ধরায় অংশ নেওয়াও শিশুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকর্ম হতে পারে।

> সঠিক পদ্ধতি বাছার ও প্রয়োগের যা পাঠক্রম লেনদেনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে শিক্ষকরা ব্যবহার করেন তাতে ক্লাস আয়তন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে ১:৩০ বেশি অনুপাত স্কুল শিক্ষার কোনো স্তরেই কাম্য নয়। বহুকাল আগে (১৯৬৬), কোঠারি কমিশন তার রিপোর্টে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে বড় শ্রেণীকক্ষ 'পড়ানোর মানের সাঙ্ঘাতিক ক্ষতি করে' আর ভরা শ্রেণীকক্ষে পড়ানোর সৃষ্টিশীল গুরুত্ব হারিয়ে যায়। (১৯৬৬ : ৪১৩.৪১৫)

পরিকাঠামোর ন্যূনতম প্রয়োজন নিশ্চিত করা আর উপাদানের ব্যবহার এবং সহায়ক নমনীয় পরিকল্পনা পাঠক্রমের উদ্দেশ্য লাভে সাহায্য করে। এগুলোই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যাকে প্রধান শিক্ষক, ক্লাস্টার ও ব্লক কর্মীরা শিক্ষকদের সমর্থনে তুলে ধরবেন। স্কুল জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে একথা খাটে। ডি.পি.ই পি-র মতো অনেক নতুন শিক্ষাপ্রণালী এ ধরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের পরামর্শ : শ্রেণীকক্ষের প্রাকৃতিক নকশা বদলানো যেতে পারে যাতে করে শিশুরা একসঙ্গে ছোটো ছোটো দলে বসতে পারে বা বড় আকারে গোল হয়ে গল্প বলা বা নিজেরা আলাদা বসে নিজের নিজের পড়া লেখার কাজ বা দলে দলে টি.ভি বা রেডিওর সামনে সম্প্রচার শোনার জন্য জমায়েত হতে পারে। এর জন্যে চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিল, দড়ির জায়গার অদলবদল করা যায়। অনেক স্কুল এই ধরনের নমণীয় সংগঠনের জন্য মামুলি আসবাবপত্র নিতে শুরু করেছে। একলা বা জোড়া ব্যবহারের ছোট চৌকি, টেবিল, চেয়ার বা দড়িগুলো এধরনের শ্রেণী কক্ষের বেশ উপযোগী। প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রয়োজন অনুযায়ী রদবদল করা যেতে পারে। কিন্তু অনেক স্কুল এখনও ভারী ধাতুর বেঞ্চি, লম্বা টেবিল যাদের সারিতে সাজাতে হয় এবং যা শিক্ষক-ব্ল্যাকবোর্ড কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার দিকে পক্ষপাতি। আরও খারাপ হল এদের অনেকেব মধ্যে বাচ্চাদের বইপত্র রাখার যথেষ্ট জায়গা নেই, সেগুলো বেশ চওড়াও নয় বা শারীরিক স্বস্তির উপযোগী পেছনে হেলান দেওয়ার মতো ব্যবস্থাও থাকে না। এ ধরনের আসবাবপত্রকে স্কুল এলাকায় নিষিদ্ধ করা উচিত।

শিক্ষাপ্রণালীর উপকরণ হিসেবে স্কুল ও শ্রেণীকক্ষের এলাকার সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যায়। কোথাও কোথাও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেয়ালগুলোকে চারফুট উচ্চতা পর্যন্ত কালো রঙ করে বাচ্চাদের খোলা স্লেট বা আঁকার বোর্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো স্কুলে মাটিতে রঙ করা হয় জ্যামিতিক নকশা করার জন্য। ঘরের একটা কোণকে ভালো গল্পের বই রাখার জন্য, পাজল বা রিড্‌ল্ কার্ড আর নিজেরা নিয়ে ব্যবহার করতে পারে এমন শিক্ষার উপকরণ দিয়ে সাজানো যেতে পারে। শিশুরা, যাদের পড়া নির্ধারিত সময়ের আগে শেষ হবে তারা এখানে এসে এই কোণ থেকে কিছু নিয়ে নিজেদের মতো থাকতে পারে। লেখাপড়া, কাজ আর খেলায় স্কুলকে ও শ্রেণীকক্ষকে আকর্ষণীয় করে তুলতে শিশুদের নানা কাজে যোগদানে উৎসাহিত করা যেতে পারে। অনেক সরকারি স্কুলে স্বাস্থ্যকর অভ্যেস হিসেবে পরিষ্কারের কাজ দেওয়া হয় এবং সেজন্য উৎসাহিত হয়ে স্কুলের রুটিনে ঢোকানোও হয়েছে। কিন্তু এটা দুঃখজনক দেখা যাচ্ছে যে মেয়েরা বা নিম্নবর্গের বাচ্চারা এই কাজ করবে বলে

আশা করে অনেক স্কুল। শিরোমণি স্কুলগুলোর শিশুরা এই ধরনের দায়িত্ব নেয় না আর প্রায়ই অপরাধের শাস্তি হিসেবে তাদের পরিষ্কারের কাজ করানো হয়। এই ধরনের অভ্যেসের সূত্রপাত ও শ্রমবিভাজনের সাংস্কৃতিক ধাঁচে শক্তিশালী হয় লিঙ্গ বৈষম্যের পথ ও নিম্ন বর্গের বংশপরম্পরাগত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পেশার অরুচিকর কাজের অনুষঙ্গ। যেহেতু স্কুল প্রকাশ্যস্থান সেখানে সমতার মূল্যবোধ সেই সঙ্গে সকল প্রকার শ্রম ও কাজে-এও প্রতির জানানো আবশ্যক। শিক্ষকদের সচেতনভাবে সাংস্কৃতিক ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজের বাঁটোয়ার প্রবণতা এড়ানো। জরুরি অন্যদিকে শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার নির্দিষ্ট জায়গায় জিনিস রাখা হলো প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা যার মাধ্যমে শিশুরা ব্যক্তিগত ও যৌথ দায়িত্ব নিতে শেখে আর তাদের স্কুল শ্রেণীকক্ষকে যতটা পারা যায় আকর্ষণীয় করে তোলে। বৃহত্তর সমষ্টির একটি অংশ হিসেবে নিজেকে বোঝা এবং সমষ্টির মধ্যে সক্ষমতা অনুযায়ী কাজের আগ্রহ শিশুমনের অভ্যন্তরে নানা উপায়ে ঢোকানো যায় যখন তারা শ্রেণীকক্ষ এবং স্কুলের মধ্যে দলে দলে একে অপরের কাজ করে।

বস্তুত, শিক্ষার্থীর প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ এবং কর্মসূচী-কেন্দ্রিক বিষয়বস্তু সৃষ্টির পথে অগ্রসর হবার জন্য পরিকাঠামোগত সুবিধা নির্মাণ সম্পর্কে আদর্শ রূপ এবং নিয়মরীতি স্থির করলে একটি আকাঙ্খিত গুণমানের বোধকে উৎসাহিত করার কাজে সহায়তা মেলে।

* পরিবারের নিয়মরীতি বয়স, দলের আকার শিক্ষক/শিক্ষিকা—শিশু অনুপাত এবং সক্রিয়তার প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

* ভবন নির্মাণের উপাদান, গঠনশৈলী এবং কারিগরি নৈপুণ্য আবহাওয়া, বাস্তুসংস্থান এবং লভ্যতার নিরিখে স্থান এবং সংস্কৃতির বিচারে বিশিষ্ট হবে। তবে নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রশ্নে কোনো সমঝোতা করা হবে না। স্নানঘর ও শৌচালয়ের কম-ব্যয়বহুল নকশা আছে অনেক এবং যারা ভারত জুড়ে একই আদর্শ আকারের বিদ্যালয়-ভবন খুঁজে বেড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

* আসবাবপত্রের নিয়মনীতিও অবশ্যই বয়স এবং সক্রিয়তার প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত, তবে গবেষণাগার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট পরিসর ব্যতিরেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে সহজে স্থানান্তরিতকরণে বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে।

* আবশ্যিক এবং আকাঙ্খিত জিনিসপত্রের (বইসহ) তালিকা অবশ্যই নির্দিষ্ট হবে এবং এক্ষেত্রে স্থানীয় উপাদান এবং সামগ্রী ব্যবহারের ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে যেগুলি সংস্কৃতির বিচারে বিশিষ্ট, কম ব্যয়বহুল এবং সহজলভ্য হবে।

* সময়ঃ স্থানিক এবং বয়স নির্দিষ্ট নিয়মরীতির প্রয়োজনীয়তা সময়-সারণি এবং ঋতুভিত্তিক কালপঞ্জিকার ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হবে।

### ৪.২. উপযোগী পরিবেশ পরিচর্যা

প্রকাশ্যস্থান হিসেবে স্কুলকে অবশ্যই চিহ্নিত হতে হবে সমতার মূল্যে, সামাজিক ন্যায়বিচার, বৈচিত্র্যের সম্মান সেইসঙ্গে শিশুদের মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়ে। স্কুলের প্রেক্ষিতে সচেতনভাবেই এই মূলবোধগুলোকে তার অঙ্গ এবং অভ্যেসের ভিত্তি হিসেবে রচনা করতে হবে। এক উপযোগী শিক্ষার পরিবেশ হল যেখানে শিশুরা নিরাপদ বোধ করবে, ভয় থাকবে না এবং নিয়ন্ত্রিত হবে সমতার আত্মীয়তায় আর নিরপেক্ষ অবস্থানে। প্রায়শই

শিক্ষকদের দিক থেকে এর জন্যে কোনো বিশেষ চেষ্টা করতে হয় না খালি সমতার অভ্যেস আর বৈষম্য না করলেই চলে। শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে শিশুরা মুক্তমনে প্রশ্ন করতে পারে, পড়া চলাকালীন সহপাঠীদের আর শিক্ষকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারে। শিশুরা তাদের সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাগুলো ভাগ করতে পারে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যায় ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করতে পারলে শিক্ষায় নিযুক্ত থাকতে পারবে না। যদি শিশুদের মতামতকে অবহেলা, নৈঃশব্দ্যের কঠিন নিয়ম চাপিয়ে মুখ বন্ধ আর ভাষার ব্যবহারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করার পরিবর্তে বরং তাদের কথা বলতে উৎসাহ দেওয়া হয় তাহলে তারা শ্রেণীকক্ষকে প্রাণবন্ত স্থান মনে করবে। পড়ানোকে ভবিষ্যৎবাণী আর বিরক্তিকর না ভেবে মনের অসাধারণ ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার আদান প্রদান বলে ভাববে। এই ধরনের পরিবেশ সব বয়সের শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদা বোধে সাহায্য এবং শিক্ষার নিজস্ব গুণকে সুদূরপ্রসারী করে।

শিক্ষক এবং শিশুরা বৃহত্তর সমাজের এক অংশ যেখানে পরিচয়ের ভিত্তি হলো জাতি; লিঙ্গ, ধর্মীয় এবং ভাষাগত গোষ্ঠীর সদস্যপদ। তাছাড়াও অর্থনৈতিক মর্যাদা জানান দেয় তার সামাজিক আদান প্রদান। যদিও ভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক প্রেক্ষিতে তা পালটায়।

আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়। সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্যরা ও মহিলারা সাধারণত তাঁদের পরিচয়ের কারণে এমন অসুবিধেজনক অবস্থায় থাকেন যে সমাজের মূল্যবান সম্পদগুলোর সমান ব্যবহারে ও যোগদানে তারা বঞ্চিত হন । স্কুল প্রক্রিয়ার ওপর গবেষণায় বলে, স্কুলের ভেতর শিশুদের পরিচয় প্রভাব ফেলে তাদের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে। ফলে তারা শিক্ষার অর্থবহ ও সমান সুযোগ পায় না। পড়ানোর অভিজ্ঞতার অঙ্গ হিসেবে বাচ্চাদের কাছে গূঢ় বার্তা পৌঁছে যায় ব্যক্তি সম্পর্কের পথ ধরে। শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি, নিয়মনীতি ও মূল্যবোধ স্কুল সংস্কৃতির অঙ্গ ।এগুলো প্রায়শই সামাজিক বিন্যাসের পুরুষত্ব ও নারীত্বর দূষণ নির্দেশ করে। দলিত ও নিম্ন বর্গের জাতের গোষ্ঠীগুলোর শিশুরা এবং অন্য সামাজিক পৃথকীকৃত গোষ্ঠীগুলো যেমন যৌনকর্মী, এইচ আই ভি আক্রান্ত

> গড়ে দিনে প্রায় ৬ ঘণ্টা আর বছরে এক হাজার ঘণ্টা শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিশুরা স্কুলে কাটায়। যে প্রাকৃতিক পরিবেশে তারা তাদের কাজ করবে তা অবশ্যই স্বাস্থ্যপ্রদ, স্বচ্ছন্দ ও মনোরম হওয়া উচিত। এর জন্য স্কুলে ন্যূনতম সুযোগসুবিধা থাকা প্রয়োজন যেমন প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, প্রাথমিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য (কলঘর, খাবার জল) ইত্যাদি। গ্রামের দিকে অধিকাংশ স্কুলেই বিশেষ করে দলিত ও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে এবং শহরের গরিব মানুষদের ছেলেমেয়েরা পড়ে এমন স্কুলে এই সুযোগ সুবিধাগুলোর ব্যবস্থা থাকে না যদিও এর জন্য সরকারি নিয়মকানুন আছে।
>
> শিক্ষকদের, প্রধান শিক্ষক, গ্রামশিক্ষা কমিটি বা স্কুল উন্নয়ন এবং পরিচালন সমিতির এ ব্যাপারে রাজ্যের সরকারি নিয়মগুলো জানা দরকার। যেখানে এই প্রাকৃতিক পরিকাঠামো ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য যথেষ্ট নয় সেখানে তার ব্যবস্থা করা দরকার যাতে স্কুলের কাজ যত কম অসুবিধায় চলতে পারে। যদি সরকারি খসড়া সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া না যায় তা হলে স্থানীয় কমিটি তার জন্য প্রভাব খাটাতে পারে। তাদের এই অংশগ্রহণ এবং ইচ্ছা এই চেষ্টাকে ফলপ্রসূ করে এবং স্কুল শিক্ষকদের শিক্ষার কাজে মনোযোগী হতে সাহায্য করে।

নিম্নবর্গের পিতামাতার সন্তানদের প্রায়শই শ্রেণীকক্ষের ভেতরে হেয় চোখে শুধু শিক্ষকরা নন উচ্চ বর্গের শ্রেণী সঙ্গীরা দেখে। মেয়েদের ক্ষমতার বিকাশ ও অধিকারের মর্যাদায় সক্ষম করে তোলার চেয়ে চিরাচরিত ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদের ভবিষ্যৎ ভূমিকার (বউ এবং মা) কথা ভাবা হয়। প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রায়ই অসহিষ্ণু পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করতে হয় যেখানে তাদের চাহিদা অবহেলিত হয়। স্কুলের শ্রেণীকক্ষে নিরপেক্ষ পরিবেশ সৃষ্টির গুরুত্বর কথা ভেবে সচেতন হওয়া উচিত যাতে ছাত্রদের আলাদা বা দুর্ব্যবহার এবং লিঙ্গ বৈষম্য বা তপশীল বা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ওপর ভিত্তি করে প্রাপ্ত সুযোগ সবিধা থেকে বঞ্চিত না করা হয়। অন্যদিকে স্কুলের এক সংস্কৃতি হওয়া উচিত যা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার্থী বলে পরিচয় দেয় এবং শিশুদের সম্ভাবনা ও আগ্রহ বাড়ায়।

## ৪.৩ সকল শিশুর অংশগ্রহণ

নিছক অংশগ্রহণ শব্দের কোনো অর্থ নেই। এটি হল অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি তাত্ত্বিক কাঠামো যার সাহায্যে একে সংজ্ঞায়িত এবং একটি রাজনৈতিক নির্মাণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। যেমন, একটি কর্তৃত্বপরায়ণ কাঠামোর মধ্যে কাজে অংশগ্রহণ করার বিষয়টা গণতান্ত্রিক কাঠামোর অভ্যন্তরে অংশগ্রহণের থেকে আলাদা। বর্তমানে বিকাশশীল ক্ষেত্রগুলিতে সর্বদাই 'নাগরিক সমাজ'-এর অংশগ্রহণের বিষয়ে বিস্তর বাগাড়ম্বর করা হয়। কিন্তু নাগরিক সমাজের প্রকৃতি এবং এই অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যের প্রশ্নে সর্বদাই একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে নাগরিক হয়ে ওঠার অর্থে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। এখন, নাগরিক সমাজে অংশগ্রহনের অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে বেসরকারী সংগঠনের অংশগ্রহণ এবং ব্যক্তি নাগরিকদের অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া, যেমন স্থানীয় প্রশাসনকে গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করানো।

ভারত হল বিশ্বের বৃহত্তম এবং প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক দেশ, এই মূল ভিত্তির ওপর স্থাপিত বোধের নিরিখেই এই পাঠ্যক্রমের কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। শিক্ষা একটি জাতির গঠনকাঠামোকে সংজ্ঞায়িত করে এবং প্রতিটি শিশুকে গণতান্ত্রিক পরিচালন-কার্যের একটি ইতিবাচক অভিজ্ঞতা দানের ক্ষমতা শিক্ষার আছে। একটি কারু-কার্যময় বস্ত্রে একত্রে বোনা প্রত্যেকটি সুতোর বুনন, রঙ, এবং প্রকৃতির মতো প্রতিটি ভারতীয় শিশু এই গণতন্ত্রে কেবলমাত্র অংশগ্রহণ নয়, বরং গণতন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্য কীভাবে অন্যদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে এবং যৌথ অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে হবে, সে বিষয়েও শিক্ষালাভে সক্ষম হয়। ব্যক্তিমানুষদের আন্তঃসম্পর্কের প্রকৃতি এবং গুণাবলীই আমাদের দেশের সমাজ রাজনীতির গঠনকাঠামো নির্ধারণ করে। অবশ্য, শিশুদের প্রায়শই পক্ষপাতদুষ্ট রীতিতে সামাজিকীকরণ হয়ে থাকে। বাড়িতে, গোষ্ঠীতে এবং চারপাশের জগৎ থেকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, তার থেকেই শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়েই শিক্ষা লাভ করে। প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টান্তের নিরিখেই যে প্রাপ্তবয়স্কেরা শিশুদের সামাজিকীকরণ করে থাকেন একথা স্বীকার করা প্রয়োজন। দূরদর্শন সহ প্রচারমাধ্যমে শিশুরা যে আদর্শ চরিত্রের সাক্ষাৎ পায় তারাও এই দৃষ্টান্তের অন্তর্ভুক্ত। বর্ণ এবং শ্রেণী, লিঙ্গ, গণতন্ত্র এবং ন্যায় সম্পর্কে তাদের বোধ এই অভিজ্ঞতার শর্তেই বাঁধা থাকে। এইসকল বোধ, যদি এবং যখন একই ধরণের পুনরাবৃত্ত অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রচলিত হয়, তখনই ওরা মূল্যবোধে রূপান্তরিত হয়ে যায়। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের স্তরে, একদল মানুষের অভিজ্ঞতা যখন একই হয়, এবং তাদের মূল্যবোধ ও একইরকম হয়ে যায়, তখনই সেই মূল্যবোধ সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এমনকি কখনো কখনো তা তত্ত্ব বা আর্দশ হয়ে ওঠে। বিষয়টি বহু পাকে জড়ানো এবং প্রত্যেক বার চক্রটি মূল্যবোধের পুনরাবৃত্তি ঘটায় এবং অভিজ্ঞতায় বৈচিত্র্য না আসা পর্যন্ত সংস্কৃতি প্রচলিত হয়। এই বিপরীত অভিজ্ঞতা বেশ জোরালো এবং বাস্তব হতে হয় যাতে পূর্ববর্তী ধারণার বদল ঘটানো যায়। কোনো একদিন সকালে ১৮ বছর রয়সে শিশুরা জেগে উঠে জেনে গেল কেমন করে গণতন্ত্রকে উন্নত এবং রক্ষা করতে হয়, এর প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে করত হয়, এমনটা হতেই পারে না। বিশেষত তাদের যদি কোন প্রাক্ ব্যক্তিগত এমনকি দু

হাতফেরতা অভিজ্ঞতাও না থাকে অথবা কোনো আদর্শ চরিত্রের থেকে এ বিষয়ে কিছু না শিখে নেয়।

শিশুদের অংশগ্রহণ হল অনেক দূরগামী একটি পথ, যেটি অমাদের মৈত্রী গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাম্যের সংস্কৃতিতে এক নতুন স্পন্দন সঞ্চারণ এবং সংরক্ষণ করেছিল। একটি সংহত এবং সুবিন্যস্ত পাঠ্যক্রম যেটি শিশুকে অংশগ্রহণে সক্ষম করবে তারই মাধ্যমে এইসব মূল্যবোধ সবচেয়ে ভালোভাবে অনুভব করা যায়। বিদ্যালয়ে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার প্রতিষ্ঠিত পরিবেশ আমাদের সংবিধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মূল্যবোধ একেবারে বিপরীত মূল্যবোধ প্রচার করবে। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এবং বাইরে গণতন্ত্রে ইতিহাবাচক 'অভিজ্ঞতা' এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে। এইসমস্ত অভিজ্ঞতা শিশু এবং অল্পবয়সিদের অবশ্যই এমন সক্রিয়তায় যুক্ত করবে যাতে অন্তর্ভুক্তির মূল্যবোধ উৎসাহিত হয় এবং পরিণামে একটি অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রের চিত্র অনুধাবন করে সঠিক পথে তারা অগ্রসর হতে পারে।

দুর্বল এবং প্রান্তিকদের ক্ষমতায়ন ও গণতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলার একটা অর্থ। সাম্য, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে একটি দেশ হয়ে ওঠার স্বপ্ন যদি ভারতকে দেখতে হয়, যেখানে তার সমস্ত নাগরিক ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা এবং মৈত্রী উপভোগ করে, তবে শিশুদের অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলা হবে, এই প্রক্রিয়ার মৌলিক পদক্ষেপ। একটি গোষ্ঠী এবং বৃহদার্থে একটি দেশের জীবনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষালাভে সক্ষম হওয়া বিদ্যালয়ব্যবস্থার সাফল্যের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। এ সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে তার ফল হবে এই ব্যবস্থার ব্যর্থতা এবং সেকারণেই একে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গণ্য করা উচিত। এটি যে কেবল গণিত এবং বিজ্ঞান শিক্ষাদানের মতো আবশ্যিক তাই নয়, এমনকি সমস্ত বিষয়শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে এটি তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটি একটি চলমান চিন্তন, এবং শিক্ষার সমস্ত প্রক্রিয়া ও ক্ষেত্রে একে সংযুক্ত করতে হবে এবং সমস্ত বিষয়ক্রম এবং পাঠ্যসূচীর উন্নতিতে একেই সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকার দিতে হবে।

### ৪.৩.১ শিশুদের অধিকার

শিশুর অধিকার সম্পর্কিত চুক্তিতে ভারত সাক্ষর করেছে। এই চুক্তির সবচেয়ে প্রধান তিনটি নীতি হল অংশগ্রহণের সম্মিলনের অধিকার রা সংগঠনের অধিকার এবং তথ্যের অধিকার। শিশু এবং অল্পবয়স্করা যদি তাদের অন্যান্য অধিকারসমূহ বুঝতে পারে তবে এগুলিই হল আবশ্যকীয় অধিকার। শিশুর অধিকার সংক্রান্ত চুক্তিতে শুধুমাত্র শিশুদের সুরক্ষা এবং পরিষেবা ও কর্মসূচীর ব্যবস্থা বা তার সুযোগ দেওয়ার কথাই বলা হয়নি, সেখানে এই জাতীয় পরিবেশ আর কর্মসূচীর প্রকৃতি ও গুণাবলী নির্ধারণের অধিকার যাতে শিশুরা পায় সেটিও নিশ্চিত করা হয়েছে। তদুপরি, সবচেয়ে ভালোভাবে শিশুদের স্বার্থ রক্ষা করতে এবং এই প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিতে কয়েকটি জরুরি নীতির বাতাবরণে CRC-র সমস্ত ধারাগুলিতে দেখতে হবে।

যদিও শিশুরা যাতে তাদের সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে অবাধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে সে বিষয়টি শিশুর অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলন নিশ্চিত করে, তবু প্রায় সর্বদাই সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী যেসব প্রক্রিয়া এবং কর্মকাণ্ড তাদের জীবন ও ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করে, সেখানে শিশুদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে অস্বীকার করা হয়। অন্যান্য প্রাথমিক অধিকারসমূহ যেমন তথ্য জানার অধিকার, একত্রিত হবার স্বাধীনতা এবং প্রভাব ও নির্দেশমুক্ত মতামত গঠনের স্বাধীনতার অনুভবও অংশগ্রহণের অধিকারের ওপর নির্ভরশীল। শিশুদের সম্পর্কিত সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে অংশগ্রহণের নীতি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠা উচিত।

বাস্তবে, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক কাঠামো এখন পর্যন্ত অত্যন্ত বেশি মাত্রায় কর্তৃত্বের এমোচ্চ শ্রেণীবিভাজিত। শিশু এবং অল্পবয়সিরা সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক অংশের বাসিন্দা; তাদের এটা সংগঠিত হবার

সুযোগ দেওয়া হয়, তারই মাত্রার ওপর প্রধানত তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ নির্ভর করে। পরস্পর কাছাকাছি এলে দৃষ্টিশক্তি, ক্ষমতা এবং একটি সামূহিক কণ্ঠস্বর এসবই তারা পেয়ে যায়। ব্যক্তি-বিশেষ, 'হাতে-গোনা' শিশু বা অল্পবয়সিদের অংশগ্রহণের মধ্যে সর্বদাই পক্ষপাতিত্ব থাকে এবং এ জাতীয় 'প্রতিনিধিত্বে' তারা যেহেতু কেবলই নিজেদের উপস্থাপিত করে, সেকারণে এটি অকার্যকর হয়। কম দৃশ্যমান এবং কম সোচ্চার যারা, তারা বাদ পড়ে যায়। এতে সবক্ষেত্রে নিজের সুবিধা করে নেওয়ার সুযোগ বেশি পাওয়া যায়।

অন্যদিকে, শিশু এবং অল্পবয়সিদের বিশেষত বেশি অসুবিধার মধ্যে যারা আছে সেই সব শিশুদের সংগঠিত অংশগ্রহণে শিশুরা শক্তি, আরো বেশি তথ্যের অধিকার, আত্মবিশ্বাস, নিজস্ব পরিচয় এবং মালিকানা লাভ করে। যে সমস্ত শিশু কিশোর-কিশোরী ব্যক্তিগত স্তরে এই জাতীয় গোষ্ঠীসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে তাদের স্বরে সমগ্র গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং আশা-আকাঙ্খা প্রকাশিত হয়। পরস্পরের কাছাকাছি আসার ফলে তারা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়। যাহ হোক, এই সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের বিকাশে অংশগ্রহণ করার সমানাধিকার যাতে সমস্ত শিশু এবং অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের থাকে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

### ৪.৩.২ সংযুক্তি করণের নীতি

সমস্ত বিদ্যালয় এবং আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় সংযুক্তিকরণের নীতি প্রযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। শিশুদের জীবনের সমস্ত বৃত্তে এবং বিদ্যালয়ের বাইরেও সমস্ত শিশুদের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা-দান প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয়গুলি এমন এক একটি কেন্দ্র হয়ে ওঠা প্রয়োজন যেগুলি শিশুদের সমগ্র জীবনের জন্য প্রস্তুত করবে এবং সমস্ত শিশু, বিশেষত ভিন্নরকমে সক্ষম, প্রান্তবাসী শিশু এবং কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থিত শিশুরা যাতে শিক্ষার এই জটিল ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ সুবিধা পায় সে বিষয়টি নিশ্চিত করবে। শিশুদের মধ্যে অনুপ্রেরণা ও সম্পর্ক স্থাপনকে পুষ্ট করতে প্রতিভার প্রদর্শন এবং সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে সেগুলি ভালো করে নেওয়ার সুবিধা হল সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে বারে বারেই আমরা কয়েকটি শিশুকে নির্বাচন করতে চাই। এই ছোট্ট গোষ্ঠী যখন এই সমস্ত সুযোগ পেয়ে আরো আত্মবিশ্বাসী, বিদ্যালয়ে অনেক বেশি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, তখন স্বীকৃতি এবং সঙ্গীদের অনুমোদন অবিরাম আকাঙ্খায় অন্যান্য শিশুরা সমগ্র বিদ্যালয় জীবনে উন্নতির ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্ত হতাশার শিকার হয়। উৎকর্ষ এবং সক্ষমতাকে হয়তো আলাদা করে প্রশংসা করা যেতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে শিশুদের সুযোগ দেওয়া এবং তাদের নির্দিষ্ট ক্ষমতার স্বীকৃতি ও প্রশংসা প্রয়োজন।

প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন শিশুরাও যাদের নির্ধারিত কাজ শেষ করতে আরো সময় কিংবা সহায়তার প্রয়োজন তারাও এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি এ জাতীয় কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনার সময়, শিক্ষক/ শিক্ষিকা যদি শ্রেণীকক্ষের সমস্ত শিশুদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং প্রত্যেকটি শিশুর ক্ষেত্রে কিছু না কিছু অবদানের সুযোগ নিশ্চিত করেন, তাহলেই সবচেয়ে ভালো হয়। অতএব, পরিকল্পনাকালেই, সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রতি শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের অবশ্যই বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। শিক্ষক/ শিক্ষিকা হিসাবে তাদের কার্যকারিতার এটি একটি সূচক হতে পারে।

আমাদের অনেক বিদ্যালয়ে, বিশেষতনাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সেবায় নিয়োজিত বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিতে প্রতিযোগিতার মনোভাব এবং ব্যক্তিগত সাফল্যের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়েছে। প্রায় সর্বদাই শিশু বিদ্যালয়ে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কোনো না কোনো 'হাউস'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারপর থেকে, বিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত কর্মকাণ্ডে নম্বর দেবার ব্যবস্থা যেগুলি সমগ্র 'হাউস'-এর নম্বর হবে এবং তাদের যোগ করে বাৎসরিক পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা থাকে। এই 'হাউস'-বিশ্বস্ততা সম্ভবত সমস্ত শিশুদের যুক্ত করা নিজেদের হাউসের জন্য নম্বর জিতে আনার উত্তেজনা সৃষ্টির ভাসা ভাসা উদ্যোগ। কিন্তু এর ফলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যে বিকৃতি ঘটে।

প্রত্যেকেই নিজ নিজ শর্তে উৎকর্ষ লাভ করবে এবং ভালো কোনো কাজ করলে আপনার মনেই সন্তুষ্ট হবে, এমনটা না হয়ে বরং অতিরিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্য কারোর চেয়ে ভালো করাই অধিক প্রচারিত হয়। প্রায়শই অন্যান্য শিশুদের সতর্ক দৃষ্টির অধীনে এই ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেই সামাজিক সম্পর্কসমূহকে বিকৃত করে সহযোগিতাএবং অন্যের প্রতি সমমর্মিতার মতো মূল্যবোধকে খর্ব করে, সঙ্গীদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বিদ্যালয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে যে মাত্রায় প্রতিযোগিতার উদ্দীপনা প্রবেশ এবং পরিব্যাপ্ত করতে তাঁরা চান, সেই মতো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার প্রয়োজন পড়ে তাঁদের।

বিদ্যালয়গুলিও শিশুদের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েই সংকীর্ণ পূর্বনির্ধারিত মানের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত করে শিশুদের বহুমুখী দক্ষতা এবং প্রতিভাকে খর্ব করে। প্রতিটি শিশুকে একজন ব্যক্তি-মানুষ হিসাবে উল্লেখ করার পরিবর্তেজীবনের সূচনাপর্বেই শিশুদের শ্রেণীকক্ষে পূর্বনির্ধারিত খোপে স্থান দেওয়া হয়। 'তারকা', মাঝারি, মাঝারি-র নীচে এবং 'অকৃতকার্য'। কোনো সময়েই নির্ধারিত এই খোপ থেকে নিজেদের চেষ্টার বাইরে আসার সুযোগ তারা পায় না। এহেন চিহ্নিতকরণের দানবীয় ফলাফল শিশুদের ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক। শিশুদের মধ্যেই এইসব চিহ্নের স্বীকৃতি আদায় করে অবাস্তব ব্যাপ্তিতে বিদ্যালয়গুলি চলছে; নানান নামে তাদের ডাকা হয়। যেমন 'মাথামোটা'। বসার আসন বিন্যাসে তাদের একেবারে আলাদা করে রাখা হয়। এমনকি চিহ্নিতকরণের নানান পন্থায় দৃশ্যত 'সফল' এবং যারা নিজেদের উপস্থাপিত করতে পারেনি তাদের পৃথক করে দেওয়া হয়। ঠিক উত্তর জানা নেই এই ভীতিতে অনেক শিশুই শ্রেণীকক্ষে বোঝা হয়ে থাকে। আর এইভাবে অংশগ্রহণ এবং শিক্ষালাভের সমান সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। তথাকথিত 'ভালো'-র দলও ব্যর্থতার আতঙ্কে সমপরিমাণে পঙ্গু হয়ে পড়ে। ব্যর্থতার ভয়ে নতুন কিছু সন্ধানের দক্ষতা তারা হারিয়ে ফেলে, পরীক্ষায় তুলনামূলক ভাবে খারাপ করে এবং তাদের পদমর্যাদার বিশিষ্ট স্থান হারায়। শিক্ষণ প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ভুল-ভ্রান্তি করার সুযোগ দেওয়া এবং পুরো নম্বর না পাওয়ার ভীতি দূর করা গুরুত্বপূর্ণ। গোষ্ঠী, মাতা-পিতা যারা একেবারে অতি শৈশব থেকেই শিশুদের নিখুঁত হবার জন্য চাপ সৃষ্টি করে, বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও তাদের প্রতি জোরালো সংকেত পাঠানো প্রয়োজন। বাড়িতে অথবা গৃহশিক্ষকের কাছে সময় নষ্ট করার পরিবর্তে, বেশিরভাগ সময়, গল্পের বই পড়ে, খেলাধুলা করে এবং সাধ্যমতো বাড়ির কাজ করে ও পুরানো পাঠ করার অভ্যাস করার কাজে মাতাপিতাদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন। ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য চাপ-সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার পাঠ সন্ধান করার পরিবর্তে, বিদ্যালয় প্রধান এবং পরিচালকদের উচিত তাদের বিষয়সূচীকে চাপমুক্ত করা এবং বিদ্যালয়ের বাইরে শিশুদের জীবন থেকে পড়ার চাপ সরিয়ে দেবার পরামর্শ দেওয়া।

সরকারী বিদ্যালয়সহ যেসমস্ত বিদ্যালয় তীব্র প্রতিযোগিতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়, অন্যরা কখনোই তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে না। চার দশক আগে কোঠারি কমিশন বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার যে আদর্শের সপক্ষে সওয়াল করেছিল, সেটি আজও বহাল রয়েছে কেননা আমাদে সংবিধানে লিপিবদ্ধ মূল্যবোধই এতে প্রতিফলিত আছে। বিদ্যালয়গুলি যদি এমন আত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে যেখানে প্রত্যেকটি শিশু সুখ ও স্বস্তি বোধ করবে, তাহলেই তারা এই সমস্ত মূল্যবোধের প্রসারে সফল হবে। শিক্ষা যেহেতু এখন মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত, যার ফলে প্রথম প্রজন্মের বিদ্যালয়ে যাওয়া লক্ষ লক্ষ বিদ্যার্থী এখন বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করছে আর সেকারণেই বর্তমানে এই আদর্শ আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য, বেসরকারী ক্ষেত্রসহ সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এখানে অনেক শিশু আছে আর সেকারণে বর্তমান প্রেক্ষাপটে দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব বা আকাঙ্খাকে তুষ্ট করার মতো কোনো একটি নিয়মনীতি নেই। বিদ্যালয়ের পরিচালকবর্গ এবং শিক্ষক/ শিক্ষিকাদেরও বোঝা উচিত বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদপট থেকে আসা ছেলেমেয়েরা, যাদের সক্ষমতার মাত্রাও বিভিন্ন তারা যখন একত্রে পড়াশুনা করে তখন শ্রেণীকক্ষের তাত্ত্বিক বাতাবরণ সমৃদ্ধ এবং আরো উদ্দীপনাময় হয়ে ওঠে।

### ৪.৪ শৃঙ্খলা ও অংশগ্রহণের ব্যবস্থাপনা

বিদ্যালয় যেন শিক্ষক/ শিক্ষিকা এবং প্রধান শিক্ষক/ শিক্ষিকার সম্পত্তি, বিশেষত সরকারী বিদ্যালয়, ঠিক তেমনি এটি ছাত্র/ছাত্রীদেরও 'নিজের'। শিক্ষক/ শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি আন্তঃনির্ভরশীল সম্পর্ক রয়েছে, বিশেষ এই ক্ষেত্রে যেখানে তথ্যের লভ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া-নেওয়া ঘটে এবং সম্পদের প্রতিষ্ঠার নিরিখে সৃষ্ট হয় জ্ঞান, যে কাজে শিক্ষক /শিক্ষিকা হলেন কেন্দ্রীয় পরিচালক। একজন ব্যতিরেকে অন্যজন কোনো কাজই করতে পারে না। শিক্ষা দেওয়া-নেওয়ার প্রক্রিয়াটি হিতাকাঙ্খী (শিক্ষক/ শিক্ষিকা) এবং উপকৃত (ছাত্র-ছাত্রী) -এর অবস্থান থেকে সরে এসে বর্তমানে একজন প্রেরণাদাতা ও উৎসাহদানকারী এবং শিক্ষার্থী এই জাতীয় সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। শিক্ষা দেওয়া-নেওয়া যে সত্য সত্যই সংঘটিত হচ্ছে সেটি নিশ্চিত করায় অধিকার এবং দায়িত্ব এদের সকলের আছে।

বর্তমানে, বিদ্যালয়ের নিয়ম, রীতিনীতি এবং প্রচলিত প্রথা ব্যক্তিবিশেষ এবং শিক্ষার্থীদের গোষ্ঠীর জন্য অনুমোদিত 'উত্তম' এবং 'সঠিক' ব্যবহারের সংজ্ঞা দেয়। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব সাধারণত কর্তৃত্বের অবস্থানে যাঁরা আছেন সেইসব শিক্ষক/ শিক্ষিকা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ওপর ন্যস্ত। (প্রায়শই এরা ক্রীড়া, শিক্ষক এবং প্রশাসক)। বেশিরভাগ সময়, এরা শিশুদেরও 'মনিটর' ও 'সর্দার' হিসাবে কাজে লাগান এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং 'শৃঙ্খলা' রক্ষার দায়িত্ব এদের ওপর চাপানো হয়। এ ক্ষেত্রে শাস্তি এবং পুরস্কার প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই নিয়মগুলি যারা প্রয়োগ করে তারা কখনই এদের সম্পর্কে কিংবা এই প্রয়োগের ফলে শিশুদের সামগ্রিক উন্নতি, আত্মসম্মান এবং তাদের শেখার আগ্রহের নিশ্চিত বৃদ্ধি ঘটবে কিনা সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তোলে না। শৃঙ্খলারক্ষার কায়দাকানুন যেমন দৈহিক শাস্তি এবং শিশুদের মুখে এব অন্যভাবে তিরস্কার এখনো অনেক বিদ্যালয়ের নিত্য নৈমিত্তিক 'বৈশিষ্ট্য'। আর অপমান করার জন্য অনেক সঙ্গীদের সামনেই এসব শাস্তি দেওয়া হয়। অবশ্য এইসব অভ্যাসের তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানা না থাকায়, অনেক শিক্ষক/ শিক্ষিকা, এমনকি মাতা-পিতারা এখনো বিশ্বাস করেন যে, এই জাতীয় শাস্তি গুরুত্বপূর্ণ। যেসমস্ত নিয়মকানুন এবং প্রথায় বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হয় তাদের সম্পর্কে, তারা আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা এসব বিষয়ে শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের যুক্তিসংগত প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, মোজার দৈর্ঘ্য এবং খেলার জুতোর শুভ্রতা জাতীয় নিয়মগুলির ক্ষেত্রে শিক্ষা সংক্রান্ত সুরক্ষার কোনো গুরুত্বই নেই। শ্রেণীকক্ষে নীরবতা বজায় রাখা, 'একবারেই একজনের' উত্তরদান, সঠিক উত্তর জানলে কেবলমাত্র তখন উত্তর দেওয়া এ জাতীয় নিয়মগুলি সাম্য এবং সমান সুযোগের মূল্যবোধ খর্ব করতে পারে। শিশু-শিক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা প্রক্রিয়াগুলি, সঙ্গীদের মধ্যে গোষ্ঠী-ভাবনার বিকাশ এ জাতীয় নিয়মকানুনে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে, যদিও এইসব নিয়মনীতির সাহায্যে শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের পক্ষে শ্রেণীটি 'সামলানো সহজ' হয় এবং 'পাঠ্যসূচী শেষ করতে' ও সুবিধা হয়।

শিক্ষার সুবিন্যস্ত অনুসরণ এবং শিশুর আগ্রহ ও ক্ষমতা বিকাশের পক্ষে আত্ম-শৃঙ্খলার মূল্যবোধ অভ্যাসের ধারণা সৃষ্টি করা গুরুত্বপূর্ণ। প্রদত্ত কর্তব্যকর্ম সম্পাদন এবং সঞ্চারণে অবশ্যই সক্ষম করে তোলে এই শৃঙ্খলা। এতে শিক্ষক/ শিক্ষিকা এবং শিশু উভয়কেই স্বাধীনতা, নির্বাচন এবং স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে সক্ষম করে। নিয়ম প্রণয়নের কাজে শিশুদেরই যুক্ত করা প্রয়োজন যাতে একটি নিয়মের পিছনে যে যুক্তি তাকে দেখতে পায় এবং সেটি যাতে অনুসৃত হয় তা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দায়িত্ব অনুভব করে। এইভাবে তারা স্বায়ত্তশাসনের ধারাগুলি স্থির করার প্রক্রিয়া এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ ও গণতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিষয়ে তারা শিক্ষালাভ করতে পারে। অনুরূপে শিশুরা নিজেই শিক্ষক/ শিক্ষিকা বনাম ছাত্র/ছাত্রী ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। শিক্ষক/ শিক্ষিকাকে নিশ্চিত করে জানাতে হবে যে, যতটা সম্ভব কম নিয়ম সে স্থানে প্রচলিত এবং যে নিয়মগুলি যুক্তির বিচারে অনুসরণ করা যায় সেগুলিই সৃষ্টি করা হয়েছে। নিয়ম ভাঙার জন্য শিশুদের অপমান করলে কারোর ভাল হয় না, বিশেষত নিয়মভাঙায় যদি কোনো উত্তম কারণ থাকে। যেমন,

সমস্ত শিক্ষক/ শিক্ষিকা এবং সেইসঙ্গে প্রধান শিক্ষক/ শিক্ষিকা 'কোলাহল মুখর শ্রেণীকক্ষ' বিষয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করেন কিন্তু এমন হওয়াও সম্ভব যে, এই কোলাহল শিক্ষক/ শিক্ষিকা শ্রেণীকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছেন না, এটা তার প্রমাণ নয়, বরং এতে একটি প্রাণোচ্ছল এবং অংশ গ্রহণকারী শ্রেণীকক্ষের সাক্ষর মেলে।

অনুরূপে, প্রধান শিক্ষক/ শিক্ষিকারা পরিস্থিতি বিচার করেই সময়ানুবর্তিতা সম্পর্কে কঠোর হবেন। ট্রাফিক জ্যামের জন্য যে শিশুটি পরীক্ষায় আসতে দেরি করেছে তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। অথচ প্রায়শই দেখা যায় যে উচ্চতর মূল্যবোধের অজুহাতে এই জাতীয় নিয়মকানুন চাপিয়ে দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ যদি এই সমস্ত বিষয়ে অবুঝ হন, তবে ছাত্র-ছাত্রী, তাদের মাতাপিতা এমনকি শিক্ষকদের নৈতিকতাও নষ্ট হতে পারে। একটি কথা স্মরণে রাখলে এ বিষয়ে কিছুটা সাহায্য হবে তা হল, শিশুটিকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, কেন সে নিয়ম ভেঙেছে, শিশুটি কী বলে তা শুনতে হবে, এবং সেই অনুসারে কাজ করতে হবে। একজন বিদ্যালয় প্রধান বা শিক্ষক-শিক্ষিকার ক্ষেত্রে ক্ষমতা অপেক্ষা কর্তৃত্বের প্রয়োগ বেমানান। স্বেচ্ছাচারিতা এবং যুক্তিহীনতা হল ক্ষমতার চরিত্র আর মানুষ একে ভয় করে, শ্রদ্ধা করে না। শিশুরা, প্রধান শিক্ষিক /শিক্ষিকা এবং প্রশাসকবর্গ সকলে একত্রে বিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারী পরিচালনার পদ্ধতি সন্ধান করা প্রয়োজন। শিশু পরিষদে নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য শিশুদের উৎসাহিত করা উচিত এবং অনুরূপে, একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকা, প্রশাসকগণ এবং সেইসঙ্গে মাতাপিতাদেরও সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন।

## ৪.৫. মাতা-পিতা এবং গোষ্ঠীর জন্য পরিসর

নির্দিষ্টরূপে পরিচালিত শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় হল একটি নির্মিত পরিবার, কিন্তু জ্ঞান-নির্মাণ একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যেটি বিদ্যালয়ের বাইরেও ক্রিয়াশীল থাকে। শিক্ষা যদি নিরবচ্ছিন্ন হয় এবং বিদ্যালয় ব্যতিরেকে অন্যত্র যেমন বাড়ি, কর্মক্ষেত্র, গোষ্ঠী ইত্যাদি সর্বত্র যদি শিক্ষালাভ করা যায় তবে বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট শিক্ষা বা বাড়ির কাজ সম্পর্কে একটু অন্যরকম পরিকল্পনা করা উচিত। বিদ্যালয়ে যা ইতিমধ্যেই করা হয়ে গেছে, সেটি আবার করানোর জন্য মাতাপিতার ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। শিশুদের কিংবা তাদের মাতাপিতাকে শিশুদের অন্য ধরনের কাজ করানোর বিষয়ে স্থির করা যায়। এর ফলে, ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে কী শিখছে সে বিষয়ে একটু বেশি কিছু জানার সুযোগ তাদের মাতাপিতাকে দেওয়া যাবে। বিদ্যালয়ের বাইরে বৃহত্তর জগৎ কে স্বীকার করা ও সেখানে অনুসন্ধানের প্রাথমিক উদ্দীপনাও শিশুদের দেওয়া যাবে।

বিদ্যালয়গুলি তাদের অঙ্গনে গোষ্ঠীসমূহকে আমন্ত্রণ জানাতেও পারে এবং পাঠ্যক্রম প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার জন্য বৃহত্তর জগতকে ভূমিকা পালনের সুযোগ দিতে পারে। যে বিশেষ বিষয়টি অধ্যয়ন করা হচ্ছে সে সম্পর্কে নিজেদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য মাতাপিতা এবং গোষ্ঠী সদস্যেরা দক্ষ মানুষ হিসাবে বিদ্যালয়ে আসতে পারেন। যেমন যন্ত্র বিষয়ক কোনো পাঠ নেবার সময়, স্থানীয় মিস্ত্রিরা মেরামতের বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য কথা বলতে পারেন এবং কোনো নির্দিষ্ট যান কীভাবে মেরামত করা যেতে পারে সে বিষয়েও আলোচনা করতে পারেন।

১) শিক্ষা এবং শেখার ক্ষেত্রে শিশুর জগতে গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের জন্য গোষ্ঠীকে অনুমতি দিতে হবে:

ক) মৌখিক ইতিহাস (যার মধ্যে লোককাহিনী, পরিযায়ন, পরিবেশের অবনমন, ব্যবসায়ী, জরিপকারী ইত্যাদি) এবং ঐতিহ্যগত বা চিরায়ত জ্ঞান ফসল বোনা এবং তোলা, মরশুম চিরায়ত হস্তশিল্পের প্রক্রিয়া ইত্যাদি) স্থানান্তরণের যেখানে বিদ্যালয় প্রয়োজন অনুসারে যৌক্তিক প্রতিক্রিয়ায় উৎসাহিত করবে।

খ) বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করার এবং স্থানীয়, বাস্তব এবং যথাযথ উদাহরণ সংযুক্ত করার

গ) অভিযান কর্মে এবং জ্ঞান ও তথ্য সৃষ্টিতে শিশুদের সাহায্য করার।

ঘ) তথ্য-সৃজন, পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে মূল্যায়নে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্রের চর্চায় শিশুদের সহায়তা দানের

ঙ) শিশুদের অধিকার এবং সেই সঙ্গে তাদের অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি বুঝে নেবার ক্ষেত্রে দেখাশুনা করার

চ) শিশুরা যে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে সে বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেওয়ার

জ) বৃত্তিগত শিক্ষার বিষয়গুলি স্থির করতে অংশগ্রহণ করার

ঝ) 'গ্রামই যেন বিদ্যালয়' এই ধারণা অনুধাবন করে শিশুদের জন্য গ্রামটিকে একটি শিক্ষামূলক পরিবেশ হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সক্ষম হওয়ার।

অনুরূপে, নিজেদের পড়িয়ে ভাষা ব্যবহার এবং সেইসঙ্গে বিদ্যালয়ের ভাষায় সহজ হবেও শুরু করার ক্ষেত্রে শিশুদের উপাদান সৃজনের কাজকে উৎসাহিত করতে শিক্ষক/ শিক্ষিকারা স্থানীয় ভাষাভাষী মানুষজনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। বিশেষভাবে পাঠ্যক্রমের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং যে ধরনের বিশেষ জ্ঞান সহজলভ্য ও আয়ত্তাধীন তার ওপরেই এই নির্বাচন নির্ভরশীল। শিক্ষার প্রক্রিয়ায় গোষ্ঠী এবং মাতাপিতার সক্রিয় সংযুক্তির সুবিধা বিদ্যালয় অবশ্যই কাজে লাগাবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষণ পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক সাহায্য করে।

সমস্ত বিদ্যালয়ের উচিত এমন কিছু ক্ষেত্রের সন্ধান করা যেখানে মাতাপিতার অংশগ্রহণ এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাতে উৎসাহিত করা এবং বজায় রাখা যায়। অনেক বিদ্যালয়েরই নিজেদের কাজকর্ম সম্পর্কে মাতাপিতা প্রশ্ন এবং আগ্রহের বৈধতা স্বীকার করে না। প্রায়শই, বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি মাতাপিতাদের নিছক ভোক্তা হিসাবে গণ্য করে তাঁদের সরাসরি জানিয়ে দেয় যে বিদ্যালয় যা করছে— তা যদি তাঁদের পছন্দ না হয় তবে তাঁরা সন্তানদের যেখানে থেকে নিয়ে যেতে পারেন। অন্যেরা ভাব দেখায় যেন দরিদ্র মাতাপিতার কোনো বৈধ অবস্থান নেই যে তাঁরা সন্তানদের সম্পর্কে কোনো খোঁজখবর নিতে পারেন। উভয় ব্যবহারই মাতাপিতার এবং সন্তান সম্পর্কে তাঁদের বৈধ আগ্রহের পক্ষে অসম্মানজনক।

সামগ্রিক ক্ষেত্রে,বিদ্যালয়ের পরিবেশকে শিশুদের সহায়ক করে তোলার জন্য এবং কিছু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আছে যেমন, মাতাপিতা-শিক্ষক সম্মিলনী। জাতীয় উৎসব এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান যেমন সাংস্কৃতিক বা ক্রীড়া দিবস পালনের সময় বেশিরভাগ বিদ্যালয় মাতাপিতাকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ কাজের স্থান হিসাবে বিদ্যালয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি করা যায়। বিদ্যালয় এবং তার সমস্ত সুযোগ সুবিধা বজায় রাখার জন্য গোষ্ঠীগত সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। বিদ্যালয়-ভবন, নানান সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং আরো অন্যান্য কাজের জন্য স্থানীয় সাহায্যের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। অবশ্য গোষ্ঠীগত অংশগ্রহণের অর্থ নিশ্চয়ই দরিদ্র পরিবারের ওপর আর্থিক বোঝা চাপানো নয়। অন্যদিকে, বিদ্যালয়ের পরিসর স্থানীয় অনুষ্ঠানে গোষ্ঠীসমাজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে এবং এই অঙ্গনটি দেখাশোনার দায়িত্ব যৌথ— এমন বোঝাপড়া থাকতেই পারে।

## ৪.৬ পাঠক্রমের ভিত্তি এবং শিক্ষার উপাদান

### ৪.৬.১ পাঠ্যপুস্তক ও বই

কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তককে ভিত্তি করেই যে কোনও পাঠক্রম গড়ে তোলাই প্রচলিত রীতি। যদিও পাঠ্যপুস্তকের সীমা ছাড়িয়ে পাঠক্রম আরও অনেক দূর বিস্তৃত হওয়া উচিত। তবুও পাঠক্রম সংস্কারের সময় পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনা ছাড়া অন্য কোনও প্রয়াস সাধারণত গুরুত্ব পায় না। আলোচনায় ভরা বিষয়বস্তু যত্ন করে লেখা সুচিত্রিত, সুপরিকল্পিত, পেশাদারী দক্ষতায় সম্পাদিত ও সংশোধিত ও উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক যে কোনও পাঠক্রমের পক্ষেই অত্যন্ত জরুরি। পাঠ্যপুস্তকটি তথ্যসমৃদ্ধ হওয়া ছাড়াও যেন শিশু মনকে সক্রিয় হয়ে ওঠার সুযোগ দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। পাঠক্রম পরিকল্পনার সময় পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত শিক্ষার অন্যান্য উপাদান সংযোজনের বিশেষ সুযোগ আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিষয়ানুগ অভিধান ব্যবহার করলে পাঠ্যপুস্তকটিকে বহু সংজ্ঞা ও শব্দার্থে ভারাক্রান্ত করে এনসাইক্লোপিডিয়ার মতো করে তোলার প্রয়োজন হয় না। পাঠ্যপুস্তকটি পরিভাষা জর্জরিত না হবার ফলে শিক্ষক ও বিষয় ভাবনা বা ধারণার বিস্তারে মনোযোগী হবার সুযোগ পান। বর্তমান ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দ্রুতগতি ক্লাস লেকচার, হোমওয়ার্ক এবং প্রাইভেট টিউশনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা যে ত্রিমুখী চাপ বা হ্রাস পেতে পারে যদি পাঠ্যপুস্তকটির লেখক পরিভাষাগুলিকে একটি আলাদা বিষয়ানুগ অভিধানে সংকলিত করে পাঠ্যপুস্তকটিতে বিষয় ভাবনাগুলিকে আরও স্পষ্ট করেন, সমস্যার সমাধানের উপর জোর দেন, দলবদ্ধভাবে ও হাতে-কলমে কাজ করে ভাবনার প্রসার ঘটানোর সুযোগ রাখেন।

এরপরই আসে পরিপূরক বই, ওয়ার্কবুক এবং পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অন্যান্য পড়ার কথা। কিছু কিছু বিষয়ে বিশেষত ভাষা ও সাহিত্যনির্ভর বিষয়গুলিতে এই ধরনের উপাদানগুলির প্রয়োজনীয়তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই উপাদানগুলির আধেয় বস্তু কী হবে তা নতুন করে ভাবার প্রয়োজন আছে। বর্তমানে চালু বইগুলি সাধারণত নীরস ধরনের লেখার (টেক্সট) সমাহার আর ওয়াকবুকগুলিও যেন পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। অঙ্ক এবং ভৌত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলিতে তো এই ধরনের বই এখনও তৈরি করা দরকার। এই বইগুলি শিশুমনকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে নিয়ে গিয়ে তার জীবন ও তার আবহ সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলবে। পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরনের উপাদান উপযুক্ত মানে ও মাত্রায় সহজলভ্য। সেক্ষেত্রে এই উপাদানগুলি শিশুকে গাছপালা, পশুপাখি ও তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান চিনে নিতে প্রভূত সাহায্য করে। এই ধরনের উপাদানগুলিকে ক্লাসরুমে ব্যবহার করবার জন্য আরও বেশি করে শিক্ষকদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞান বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে অ্যাটলাস বা মানচিত্রগুলিও একই ভূমিকা পালন করতে পারে। সমস্ত পর্যায়ে ইতিহাস, ভূগোল ও অর্থনীতি শিক্ষার পরিধি আরও বিস্তৃত করে তোলার জন্য তারা, গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ জীবনচর্যা, ইতিহাস, সংস্কৃতি ইত্যাদির বিন্যাস সম্বলিত অ্যাটলাস ব্যবহার করা যেতে পারে। এই সমস্ত বিষয় এবং তাছাড়াও আরও যেসব বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি বিশেষ জরুরি, সেইসব বিষয়ে পোস্টার ব্যবহার করে শিক্ষাদান করা সম্ভব। লিঙ্গবৈষম্য, সাংবিধানিক মূল্যবোধ বা বিশেষ সাহায্য নির্ভর শিশুদের মূলস্রোতে সংযোজিত করার মতো বিষয়গুলিকে পোস্টার ব্যবহার করে শেখানো যেতে পারে। শিক্ষার এইসব উপাদানগুলি একটি সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে স্কুলগুলিকে ধার নেবার সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে। স্কুল লাইব্রেরিতে এই ধরনের উপাদান সংগ্রহ করা যেতে পারে বা শিক্ষকরা নিজেরাও এগুলি বানিয়ে নিতে পারেন।

শিক্ষকদের জন্য তৈরি ম্যানুয়ালগুলি পাঠ্যপুস্তকের মতোই প্রয়োজনীয়। পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন বা নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষকদের জন্যও হ্যান্ড বুক বা সহায়ক পুস্তক রচনা করা আশু প্রয়োজন। এই সহায়ক পুস্তকগুলি যাতে অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকদের কাছে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছনোরও আগে পৌঁছতে পারে তা দেখা দরকার। শিক্ষকদের জন্য সহায়ক পুস্তকগুলিকে নানাভাবে তৈরি করা যেতে পারে। একটি উপায় হল পাঠ্যপুস্তকের একটি পরিচ্ছেদ অনুসারে সহায়ক আলোচনা সংকলিত করা। তাছাড়াও প্রচলিত রীতির বিশ্লেষণ করে, নূতন

আলোচনা সংযোজন করে এবং অডিও, ভিডিও, ইন্টারনেট সাইট ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট উপাদানের একটি তালিকা সংকলন করেও সহায়ক বই তৈরি করা যেতে পারে। এই বইগুলিতে পাঠক্রম পরিকল্পনার উপযোগী নানা পরামর্শ শিক্ষকদের উদ্দেশে লিপিবদ্ধ থাকবে। বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বা শিক্ষকদের মিটিঙে এই ধরনের উপাদান ও সহায়ক পুস্তক অবশ্যই মজুত থাকা দরকার।

উলম্বস্তরে সংগঠিত দলভিত্তিক শ্রেণীকক্ষগুলির (বিবিধ মান বা ক্ষমতা সমন্বিত) জন্য একমাত্রিক মান বিশিষ্ট শ্রেণীকক্ষের হিসাবে পরিকল্পিত পাঠ্যপুস্তকের যেখানে অনুমান করা হয় যে, শিক্ষক/ শিক্ষিকা সব শিশুদের একত্রে পড়াবে এবং শিশুরা সকলেই একই মানের এবং একইকরম কাজ করবে এমনই প্রত্যাশিত— সেই পাঠ্যপুস্তকের কিছু পরিবর্তন আবশ্যক। এর পরিবর্তে, পাঠ্য এবং শ্রেণীর পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের হাতে বিকল্প কিছু উপাদান পৌঁছে দিতে হবে।

* বিভিন্ন দলের জন্য বিভিন্ন স্তরে বিবিধ অভ্যাস এবং কাজকর্ম সহ তাত্ত্বিক পাঠ

* স্তরে বিন্যস্ত সহজলভ্য উপাদান, শিক্ষক / শিক্ষিকার ন্যূনতম সাহায্যেই শিশুরা যার সঙ্গে স্বউদ্যোগে যুক্ত হতে পারে এবং যেগুলি নিয়ে নিজেরা বা অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে কাজ করার জন্য তারা অনুমতি পেতে পারে।

* সমগ্র-দলীয় কাজকর্ম যথা, গল্প বলা বা ছোটো নাটিকা উপস্থাপনা, যার ভিত্তিতে শিশুরা বিবিধ কাজ করতে পারে যেমন, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত ছাত্র/ছাত্রী একত্রে সিংহ ও খরগোশের গল্পটি অভিনয় করতে পারে এবং তারপর প্রথম এবং দ্বিতীয় দল বিভিন্ন প্রার্থীর নাম সম্বলিত কার্ড নিয়ে কাজ করতে পারে; তৃতীয় এবং চতুর্থ দল একগুচ্ছ ছবি আঁকতে পারে এবং তারপর ছোট ছোট দলে কাজ করে অঙ্কিত প্রতিটি চিত্রের সাপেক্ষে কাহিনী লিখতে পারে; পঞ্চম দল সেই গল্পের কোনো বিকল্প পরিসমাপ্তির প্রস্তাবনায় গল্পটিপুনরায় লিখতে পারে। যথাযথ উপাদানের সাহায্য না পাওয়ায় বেশির ভাগ শিক্ষক/শিক্ষিকা বুঝতে পারেন যে তাঁরা গোটা শ্রেণীকে কৌশলে একমাত্রিক করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। ফলে বেশিরভাগ শিশুর কাজ করার সময় খুব কমে যায়।

### ৪.৬.২ গ্রন্থাগার

স্কুল লাইব্রেরি গঠন ও সংস্কারের কথা বহুদিন ধরে প্রায় সব রকম পরিকল্পনা ও সুপারিশ বলা হলেও কার্যকারি স্কুল লাইব্রেরি আজও দুর্লভ। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে বিদ্যালয়ের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে গড়ে তোলা সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি বিশেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত। শিক্ষা, আনন্দ উপভোগ এবং অভিনিবেশ বৃদ্ধির এক অসাধারণ মাধ্যম হিসাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রশিক্ষণ শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রী সকলকেই দেওয়া প্রয়োজন। স্কুল লাইব্রেরিগুলিকে এমনভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন যাতে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও সেই অঞ্চলের জনগোষ্ঠী এটিকে জ্ঞানচর্চা ও চিন্তা অনুশীলনের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করতে পারে। বই ও অন্যান্য উপাদানের তালিকা এমনভাবে প্রস্তুত করা দরকার যাতে শিশুরা স্বনির্ভর গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী হয়ে উঠতে পারে। বই এবং পত্র পত্রিকা ছাড়াও লাইবেরি যেন আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় ছাত্র ও শিক্ষকদের বৃহত্তর বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত রাখতে পারে সেদিকে দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। পরিকল্পনার প্রাথমিক স্তরে ব্লক ও ক্লাস্টার স্তরের লাইব্রেরিগুলিকে উন্নত করার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের প্রতিটি স্তরের প্রতি স্কুলে যাতে একটি সম্পদশালী লাইব্রেরি স্থাপন করা যায় তা নিশ্চিত করা সেই লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে।

দেশের নানা জায়গায়, গ্রামীণ অঞ্চলে কম্যুনিটি লাইব্রেরি এবং জেলা সদরে ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি কাজ করছে।

শিক্ষার উপাদানগুলির সর্বোত্তম ব্যবহারে.জন্য স্কুল লাইব্রেরির নেটওয়ার্ককে এইসব লাইব্রেরি সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন। এই রকম একটি লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের হাতে উপযুক্ত সম্পদ ও ব্যবস্থা দেওয়া যেতে পারে।— এই সংস্থাটিকে ঐ লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা ও তারপর তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও দেওয়া যেতে পারে।

স্কুলের দৈনন্দিন কার্যকলাপেও লাইব্রেরিটি নানাভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। সপ্তাহে একটি মাত্র পিরিয়ড গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ করাটা শিশুকে পঠনপাঠনের অভ্যাসে লিপ্ত করার যথেষ্ট উপযুক্ত পদ্ধতি নয়। নিয়মিত বই ইস্যু করার সুযোগ থাকা একান্ত প্রয়োজন। লাইব্রেরি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের দেওয়ার ব্যবস্থা করা গেলে বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো সম্ভব। বিদ্যালয় চত্বরে গ্রন্থাগারের জন্য একটি পৃথক ঘর বরাদ্দ করা সম্ভব হলে সেখানে সুঅভ্যাস মেনে চলার মত উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছাত্রদের দেওয়া প্রয়োজন। উপযুক্ত আলোর ও বসবার ব্যবস্থাও ছাত্রদের প্রয়োজনীয় চরিত্রবৈশিষ্ট্য গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এর ফলে গ্রন্থাগারের মধ্যেই একটি ক্লাস নেওয়াও শিক্ষকের পক্ষে সম্ভবপর হবে। এই ধরনের কিছু ক্লাসে শিক্ষক লাইব্রেরির বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে আলোচনা করতে পারেন কোনও কারিগর তাঁর বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেন বা কোনও কথক গল্পও বলতে পারেন। ব্লক এবং ক্লাস্টার স্তরে এই ধরনের গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে পারলে তা শিক্ষকদের পাঠক্রম রচনায় উপযুক্ত সাহায্য করতে পারবে। প্রত্যেকটি ব্লক একটি বিশেষ বিষয়ে বিশেষত্ব অর্জনের চেষ্টা করলে সমষ্টিগতভাবে প্রত্যেকটি জেলায় উপযুক্ত শিক্ষা উপাদানের প্রভূত সম্পদ সংগৃহীত হতে পারে।

**গ্রন্থাগার:**

প্রত্যেক সপ্তাহে একটি পিরিয়ড লাইব্রেরির জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে। ঐ ক্লাসটিতে ছাত্রছাত্রীরা সুশৃঙ্খলভাবেও নীরবে গ্রন্থাগারে বসে পড়াশোনা করবে, আগের সপ্তাহে ধার নেওয়া বই ফেরত দেবে ও নতুন বই নেবে।

লাইব্রেরির আলাদা ঘর না থাকলে শিক্ষক নিজেই সেই বয়সের ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত বই ক্লাসে নিয়ে যাবেন ও ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের পছন্দমত বই নেবার সুযোগ দেবেন। শিক্ষক নিজে বইপছন্দ করে দেবার তুলনায় ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের বই নেবার সুযোগ দেওয়াকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। ভাষা ও সাহিত্যের ক্লাসেও লাইব্রেরির বই আনা যেতে পারে। ক্লাসের প্রজেক্টওয়ার্ক করার জন্য লাইব্রেরির রেফারেন্স বই ব্যবহারের জন্য ছাত্রছাত্রীদের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।

বইয়ে পড়া কোনও গল্প অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের বলার জন্যও তাদের উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে।

**ছুটি বা অবকাশের সময়েও গ্রন্থাগার খোলা রাখা উচিত।**

### ৪.৬.৩ পাঠক্রমের শিক্ষা প্রযুক্তি

ভিত্তি হিসাবে শিক্ষা প্রযুক্তি (Educational Technology) ব্যবহার করার পরিকল্পনা বহুদিন ধরেই স্বীকৃত। কিছু এ ব্যাপারে উপযুক্ত নির্দেশিকা বা কৌশল এখনও প্রস্তুত হয়নি। উপযুক্ত নিয়োগ পরিকল্পনার অনুপস্থিতির কারণে বহু জায়গাতেই ভালো শিক্ষকের অভাব আছে। এই অভাব পূরণের জন্য সাধারণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু শিক্ষাদানের মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষা প্রযুক্তি যেভাবে ব্যবহার হয় তা শিক্ষকদের শিক্ষাদান সম্পর্কে আরও

অনাগ্রহী এবং বিরক্ত করে তুলতে পারে। পাঠক্রমের উন্নয়নের জন্য শিক্ষাপ্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে গেলে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের কেবল অপ্রিয় ভোক্তার ভূমিকায় সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না তাদের সক্রিয় শিক্ষা উপাদান উৎপাদকে পরিণত করা দরকার। শিক্ষা প্রযুক্তি ব্যবহারের পূর্বে এবং চালু করার সময়ে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন কআছে। শিক্ষা প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্রিয় অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য ব্লক, ক্লাস্টার, জেলা, রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি সমস্ত স্তরের বিদ্যালয় ও রিসোর্স সেন্টারগুলিতে এই প্রযুক্তি ব্যবহারে সুযোগ তৈরী করা প্রয়োজন। গ্রামের কোনও বয়স্ক মানুষের সাক্ষাৎকারের অডিও রেকর্ডিং করা থেকে শুরু করে ছোট কোনও ভিডিও তোলা বা ভিডিও গেম চালানোর মত নানা কাজের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত করে তোলা যেতে পারে। সরাসরি মাল্টিমিডিয়া বা তথ্য সম্প্রচার প্রযুক্তি (Information Communication Technologym, ICT) ব্যবহারের মাধ্যমে নানা কনটেস্ট ও অনুষ্ঠান বানানোর সুযোগ দিলেন ছাত্রছাত্রীরা তাদের সৃজনশীলতা প্রকাশের একটি নূতন মাধ্যম খুঁজে পাবে।

এইভাবে শিক্ষাপ্রযুক্তি ব্যবহার করে নানা উপাদান সৃজন করতে পারলে তবেই নতুন প্রজন্ম এক দেশজোড়া যুক্তি পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ও তাকে উপযুক্তরূপে ব্যবহার করতে পারবে। কেবলমাত্র অনুষ্ঠান শুনে বা দেখে এ কাজ কখনও সম্ভব নয়। শুধুমাত্র সি ডি চালানো সম্ভব এখন কম্পিউটারই নয়, ইন্টারনেটে সংযুক্ত মিথস্ক্রিয় কম্পিউটার ব্যবস্থা গ্রামীণ এবং প্রান্তিক অঞ্চলে ও ব্যবহার করতে পারলে তবেই ঐ সব অঞ্চলের সঙ্গে তথ্য ও চিন্তার আদানপ্রদান ঘটান সম্ভব হবে। একমুখী তথ্য গ্রহণের বদলে দ্বিমুখি তথ্য আদান প্রদান করতে পারলে তবেই প্রযুক্তি শিক্ষার উপযুক্ত তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্লাসরুমের বিকল্প গড়ে তোলার চেষ্টা না করে, পাঠ্যপুস্তকের পুনরাবৃত্তি না করে, ল্যাবরেটারি এক্সপেরিমেন্টগুলির অ্যানিমেশন না বানিয়ে বরং ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী ধাপে ধাপে তথ্যজাল ও জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে সংযুক্ত হবার সুযোগ করে দিতে পারলেই শিক্ষা প্রযুক্তি ব্যবহার ফলপ্রসু হবে। আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে এই ধরনের যোগাযোগের সুযোগ এখনও অত্যন্ত সীমিত। এই সীমাবদ্ধতাই গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের এবং আঞ্চলিক ও ইংরাজি ভাষায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বর্তমান বিভেদের একটি প্রধান কারণ। শিশুদের উপযোগী এনসাইক্লোপিডিয়া বা তথ্যচিত্রের সংখ্যা এখনও অত্যন্ত কম। পাঠ্যপুস্তক, হ্যান্ডবুক বা ওয়ার্কবুক রচনার সময় বিষয়ানুগ উন্নতমানের অডিও, ভিডিও বা ওয়েবসাইটের নির্দেশক তালিকা সংযোজিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। ঐসব সূত্র থেকে যাতে অতিরিক্ত তথ্য ও ধারণা আহরণ করতে পারা যায় সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা বিশেষ দরকার। ধ্রূপদী সিনেমার সাথে এইভাবে যোগ স্থাপন করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে গ্রামজীবন সম্পর্কে পঠনপাঠনরত একটি শিশুকে পথের পাঁচালির ছবির সঙ্গে সিডি বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পরিচিত করে দেওয়া অত্যন্ত ফলপ্রদ হতে পারে। নানা বিষয়ের জ্ঞান ও বিবিধপ্রকার অভিজ্ঞতার সম্মিলনে ভবিষ্যতের পাঠ্যপুস্তক এমনভাবে রচনা করা দরকার যাতে তা জ্ঞান আত্তিকরণের সহায়ক হতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় রাজস্থানের ইতিহাস নিয়ে পঠনপাঠনরত একটি শিক্ষার্থী যেন অন্তত একটি মীরার ভজনের সম্পূর্ণ কথা ও সুর জানতে পারে এবং কোনও একটি সূত্র থেকে এম এস শুভলক্ষ্মীর গলায় গানটি শুনতে পায় তার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

এইভাবে তথ্য ও অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন ঘটাতে পারলে তবেই বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির অন্তর্নিহিত একঘেয়েমি ও স্থবিরতা দূর হতে পারবে। অঙ্ক, বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে ও প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষাপ্রযুক্তি ব্যবহারের উপযোগিতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। পাঠক্রমের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ধরনের প্রযুক্তির প্রকৃত ব্যবহার যেমন প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন প্রযুক্তির ব্যবহারে সুযোগ করে দেবার জন্য সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার উপযুক্ত অর্থের সংস্থান করা।

> প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের
> পক্ষে ভিডিও বা অ্যানিমেশান
> কখনোই হাতেকলমে শিক্ষার
> বিকল্প হতে পারে না।

### ৪.৬.৪ যন্ত্রপাতি ও ল্যাবরেটরি

বিভিন্ন শিল্প ও কারিগরি দক্ষতা অর্জনের জন্য যন্ত্রপাতিতে স্কুলগুলিকে সমৃদ্ধ করে তোলা একান্ত প্রয়োজনীয়। মনোযোগী পরিকল্পনার মাধ্যমে উপযুক্ত উপাদান সংস্থান করে নিতে পারলে শিল্প ও কারিগরির মত পাঠক্রম অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলিকে ব্যবহার করে স্কুল ব্যবস্থাটিকে সাধন করা যেতে পারে। ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন কারিগরি দক্ষতা চর্চার জন্য প্রয়োগ ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে লেদ মেশিন, তাঁত, কাঁচি, এমব্রয়ডারি ফ্রেম ইত্যাদি যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক রুটিন অনুসরণ করে এই ধরণের যন্ত্র বা কারিগরি দক্ষতার সঙ্গে পরিচিত করা যেতে পারে। এই ধরণের দক্ষতা অর্জনের পাঠক্রমভুক্ত সুযোগগুলিকে কোনও লিঙ্গবৈষম্য বা জাতবৈষম্যের কবল থেকেও মুক্ত রাখতে না পারলে এই শিক্ষাক্রম চালু করার প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে তার পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করে স্থানীয় সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ করার কাজটিই ব্যর্থ হবে। শিল্পকলা শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই ঘটনাটি সত্য. পাঠক্রমের অন্যান্য রিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া ছাড়াও শিল্পকলা শিক্ষার জন্য কিছু বিশেষ উপাদান ও যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। যন্ত্রপাতির ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। তাদের ব্যরহারে সার্বিক দক্ষতা অর্জন করা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা শেখাটা যে কোনও শিশু শিক্ষার্থীর কাছেই এক অমূল্য অভিজ্ঞতা হতে পারে। বিশেষ সাহায্য নির্ভর শিশুদের ক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহারের প্রয়োগ ধারণাটি রপ্ত করাই যে একটি বিশেষ প্রয়োজন তা সর্বজনবিদিত, শিশুর বোদ এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিল্পকলা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করলে তা স্বাক্ষরতার প্রসার ঘটাতে এবং একা শান্তিকামি সংস্কৃতির বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

অনেক স্কুল বিশেষত গ্রামগুলের স্কুলগুলিতে বিজ্ঞান পরীক্ষাগার বা গণিতচর্চার উপযোগী উপাদানের অভাব আছে। সুযোগের এই অভাব তাদের ভবিষ্যৎ জীবনেও এই সব বিষয় অনুশীলনের ক্ষেত্রে কুণ্ঠিত করে রাখতে পরে। এই কারণেই ল্যাবরেটরিগুলির জন্য উপাদান ও সঙ্গতি সংস্থান করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালগুলিতে একটি বিজ্ঞান ও গণিতচর্চা কেন্দ্রই যথেষ্ট হলেও মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে পুরোদস্তুর বিজ্ঞান পরীক্ষাগার বা ল্যাবরেটরি থাকাটা নিতান্ত প্রয়োজন।

### ৪.৬.৫. অন্যান্য ভিত্তি ও অবস্থানের গুরুত্ব

বিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থিত পাঠক্রমের অন্যান্য কিছু ভিত্তি এবং অবস্থানের গুরুত্বও আলোচিত ভিত্তি বা আধারগুলির মাতাই। এর মধ্যে উল্লেখয়োগ্য হল স্থানীয় ঐতিহাসিক অবস্থান, মিউজিয়াম, স্বাভাবিক ভৌত বৈশিষ্ট সমূহ যেমন নদী, পাহাড় ইত্যাদির মত প্রাকৃতিক অবস্থিতি অথবা বাজার বা পোস্ট অফিসের মতো প্রাত্যহিক ব্যবহার্য অবস্থানগুলি। শিক্ষকরা কতটা কুশলতার সঙ্গে এই সব উপাদানগুলিকে পাঠক্রমের ভিত্তি হিসাবে অঙ্গীভূত করতে পারছেন তার উপর শিশুর শিক্ষার মান সরাসরি নির্ভর করতে পারে। ক্লাসরুমের পঠনপাঠনকে কেবল পাঠ্যপুস্তকের লিখিত তথ্যাবলীতে সীমাবদ্ধ রাখলে তা শিশুদের বিকাশ আগ্রহ উদ্দীপনার ক্ষেত্রে বিশেষ বাধা হিসাবে পরিগণিত

হতে পারে। স্কুলের নির্দিষ্ট বাৎসরিক এবং দৈনিক রুটিনটুকুকেই শিরোধার্য করে ফেললে তা থেকে ঐ প্রকার মুক্ত চিন্তা ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিকূল বহু বাধার সৃষ্টি হবে। তারায় ভরা রাতের আকাশ শিশুদের পরিচিত নয় কারণ স্কুল তার গেট রাতে খোলেনা বা তার ছাদটি ব্যবহার করতে দেয় না। অস্তগামী সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করা বা জুন মাসের শুরুতে বর্ষার পদসঞ্চার অনুসরণ করাও স্কুলের সময়সারণীতে স্থান পায় না। দেশের বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রমণ এমনকি নিকটবর্তী সার্ক (SAARC) গোষ্টিভূক্ত দেশগুলির স্কুলের সঙ্গেও সংযোগ ঘটাতে পারলে তা পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

শিক্ষক ও শিক্ষা আধিকারিকদের সংঘবদ্ধ হয়ে শিক্ষাকে তার বর্তমান নিয়মানুগ অচলায়তন থেকে মুক্ত করা দরকার। উপরন্ত সিলেবাস প্রস্তুতকর্তা, পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা এবং শিতক সহায়িকা রচয়িতাদেরও এই সব পরিকল্পনা এবং সুযোগ সম্পর্কে অবহিত করা এবং শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা নিয়মমাফিক 'এক্সকারশন' যে পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম এই বদ্ধমূল ধারণা পরিত্যাগ করতে হবে।

### ৪.৬.৬ বহুমাত্রিক পদ্ধতি এবং বিকল্প উপাদানের উপযোগিতা

ভারতীয় সমাজের বহুমাত্রিক এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্রই দাবি করে যে শিক্ষার জন্য শুধু বিবিধ পাঠ্যপুস্তকই নয়, শিশুর সৃজনশীলতা ও আগ্রহের বিকাশ ঘটিয়ে তার শিক্ষার মনোন্নয়নের জন্যই অন্যান্য উপাদানও প্রস্তুত করা প্রয়োজন। সব গোষ্ঠির ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজন মিটাতে পারে এরকম কোনও একটি পাঠ্যপুস্তক রচনা সম্ভবপর নয়। তাছাড়াও একই ধারণা বা তথ্যও বিবিধ আধেয় কনটেন্ট সহযোগে উপস্থাপন করা সম্ভব। সরকারি ও বেসরকারি স্কুলগুলি একাধিক পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে থেকে পছন্দমতো বেছে নেবার সুযোগ দিতে পারে। বিভিন্ন বোর্ড এবং পাঠপুস্তক প্রণেতা সংস্থাগুলিও একাদিক পাঠ্যপুস্তকের সিরিজ প্রণয়ন করতে পারে বা অন্যান্য প্রকাশকদের বইগুলির মান বিচার করে তাদের অনুমোদন দিতে পারে। এর ফলে স্কুলগুলি তাদের পছন্দমত বই পাঠ্য করার সুযোগ পারে। পাঠ্যপুস্তকের নানা ত্রুটি দূর করার জন্য ১৯৫৩ সালেই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বেশ কয়েকটি সুপারিশ করে। তাতেই একথা উল্লেখ করা হয়েছিল:-"কোনও একটি বিষয়ের পঠনপাঠনের জন্য কখনোই শুধুমাত্র একটি বইকে নির্বাচন করা যাবে না। উপযুক্ত মান উর্ত্তিণ হতে পেরেছে এরকম বেশ কয়েকটি বইকে পাঠ্য হিসাবে অনুমোদন করে তার বিশেষ কোনও একটিকে পাঠ্য করার সুযোগ স্কুলের উপর ছেড়ে দিতে হবে।" কোঠারি কমিশনও পাঠক্রম সংস্কারের কাজটি সাধারণত একমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে এবং সমগ্র প্রদেশ স্তরে একটি সাধারণ পাঠক্রম। সব স্কুলের জন্যই চালু করা হয়েছে। এই ধরণের প্রয়াস শিক্ষক ও প্রধানশিক্ষকদের সংস্থাগুলিকে অগ্রাহ্য করে এবং অনুসন্ধানমূলক শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই কমিশন তার রিপোর্টে বিশেষ জোর দিয়ে বলে যে কোনও শিক্ষাক্রমের সাফল্যের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা, শিক্ষকদের সহায়িকা গ্রন্থ রচনা এবং অন্যান্য শিক্ষা উপাদান সংগ্রহ করা অত্যন্ত জরুরি।

> কোনও অভিজ্ঞতাকে শিক্ষক যদি শিশুর বিকাশের উপযোগি বলে মনে করেন তাহলেই তাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভূক্ত বলে মনে করতে হবে। এই ধরণের অভিজ্ঞতার চর্চা যেখান থেকেই আহৃত বা যেখানেই আয়োজিত হোক না কেন তাকে সর্বদাই পাঠক্রমভূক্ত মনে করতে হবে। সরকারি সিক্ষা ব্যবস্থা ও উপযুক্ত কতৃপক্ষ যদি শিক্ষাচেতনার এই নব রূপায়ণ সরকারিভাবে স্বীকার করে নেয় তবেই একে কার্যকারী করা সম্ভব।

### ৪.৬.৭ শিক্ষাসামগ্রী আয়োজন ও আহরণ করা

বিবিধ শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী, বই, খেলনা ও খেলা আহরণ করতে পারলে স্কুল শিশুর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কোনও কোনও প্রদেশে DPEP বা অন্যান্য অর্থ ভান্ডার থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ ব্যবহার করে শিক্ষাসামগ্রী সংস্থান করা

সম্বব হয়েছে। এই ধরণের বহু উপাদান সেখানে পাওয়া যায়। কিন্তু এ সবের ব্যবহার এবং তার উপযুক্ত প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষক এবং ব্লক বা ক্লাস্টার স্তরের শিক্ষাকর্মীদের আরো ভালোভাবে অবহিত করা দরকার। বিভিন্ন NGO এবং ছোট ছোট কিছু ব্যবসায়িক সংস্থাও এখন এ ধরণের নানা নতুন প্রিন্ট-মেটিরিয়াল প্রকাশ করেছে। এছাড়াও স্কুলের বিশেষত প্রাথমিক স্কুলের উপযোগী নানা সস্তা উপাদান স্থামীয় উৎসগপলিতে পাওয়া যায়। এগুলি ক্লাসরুমে রাখার পক্ষে উপযুক্ত। শিক্ষাসহায়ক নানা প্রস্তুত করার জন্য শিক্ষকদেরও এমন সস্তা ও সহজলভ্য উপাদান খুঁজে বার করতে হবে যা বছরের পর বছর টিঁকে থাকে। এতে ঐ সব সহায়ক সামগ্রী বানানোয় ব্যবহৃত মূল্যবান সময়েরও সদ্ব্যবহার হবে। স্টাইরো-ফোম বা কার্ডবোর্ড জাতীয় পদার্যগুলি যথেষ্ট শক্ত বা টেঁকসই নয় বলেই শিক্ষার সহায়ক সামগ্রি প্রস্তুত করার জন্য রেক্সিন, রাবার বা কাপড় জাতীয় বিকল্প খোঁজা দরকার।

মানচিত্র বা ছবির সংগ্রহের মত্রে উপাদানগুলিকে ক্লাস্টার স্তরের লাইব্রেরিতে একটি উপাদান সংগ্রহশালা বা রিসোর্স সেন্টার বানিয়ে তাতে সংযোজিত করলে যে কোনও শিক্ষক সেখান থেকে তাদের নিয়ে ব্যবহার করতে পারবেনা। এক জনের ব্যবহার করা হয়ে গেলে তিনি তা পেরত দেবেন ও অন্য একজন তা ব্যবহার করবেন। এই ভাবেই একজন শিক্ষকের সংগৃহীত বস্তু অন্যরাও ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন। এমনকি গোটা ক্লাসের ব্যবহাবের জন্য যথেষ্ট সংখ্যায়ও একাধিক সামগ্রী সংগৃহীত হতে পারে।

এই ধরণের সংগ্রহশালা গড়ে তোলা স্কুলটির অর্থবরাদ্দের উপর নির্ভরশীল এবং বহু স্কুলেরই অর্থ বরাদ্দ খুবই কম। তাহলে স্কুলগুলি এরকম সংগ্রহশালা গড়ে তুলবে কি করে? একটি নিম্ন বুনিয়াদি বা উচ্চবুনিয়াদি বিদ্যালয়ে ন্যূনতম কী কী উপাদান সামগ্রি থাকতে হবে অপারেশন ব্ল্যাকমবার্ডের মত কিছু সরকারি প্রয়াসে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও কয়েকটি নতুন স্কিমে ক্লাস্টার স্তরের স্কুলগুলিতে সাইকেল ও খেলনা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্কুলগুলি এই সুযোগগুলি গ্রহণ করতে পারে যাতে তা থেকে তাদের শিক্ষাসামগ্রির ভান্ডারটি গড়ে উঠতে পারে বা বেড়ে উঠতে পারে। কার্যকারী শিক্ষার প্রসারে বাড়ানোর জন্য শিক্ষা প্রযুক্তির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। অনেক স্কুলে কম্পিউটার ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং অনেক জায়গায় টিভি বা রেডিওর মাধ্যমে পড়াশোনার কাজ শুরু হয়েছে।

কিন্তু এই সব ধারণা প্রয়োগের জন্য একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। সেইরকম উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমেই এই ব্যবস্থায় সকলের অংশগ্রহণ সম্ভব। শিক্ষা যদি কোনও পরীক্ষা প্রদর্শন করার কথা ভাবেন তবে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা দরকার। যদি তিনি কোনও কাজ হাতেকলমে করানোর পরিকল্পনা করেণ তবে সকলের জন্যে যথেষ্ট ব্যবহার সামগ্রি আয়োজন করা দরকার অথবা কাজটি করতে পারে। কেবল একটি শিশুকে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে বলে বাকিদের শুধুমাত্র দর্শক করে রাখলে মূল্যবান শিক্ষা সময়ে অপচয় হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিতে ল্যাবরেটরির উপযোগিতা নিয়ে সবসময়ই নানা আলোচনা হয়। কিন্তু তবুএ যথেষ্ট মাত্রায় ওমানে ল্যাবরেটরি এখনও সহজলভ্য নয়। সব ছাত্রছাত্রী প্রয়োজনিয় পাঠক্রমভূক্ত হাতে কলমে শিক্ষার সুযোগ করে দেবার জন্য অন্ততপক্ষে ক্লা স্টার স্তরের সংগ্রহশালাটি একটি ল্যাবরেটরি আয়োজন করা একান্ত প্রয়োজন। ক্লাস্টারের অন্তর্ভূক্ত স্কুলগুলি অন্তত সপ্তাহে অর্ধদিবস তাদের ল্যাবরেটারি ক্লাস ঐ ক্লাস্টার স্তরের ল্যাবটিতে নিতে পারে। উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সুযোগ করে দেবার জন্য ক্লাস্টার স্তরের সংগ্রহশালটিতে একটি ক্র্যাফ-ল্যাবও গঠন করা যেতে পারে।

শিক্ষার সংস্কৃতি প্রকৃত অর্থে বিকশিত করারা লক্ষ্যে শুধু স্কুলের ক্ষেত্রটুকুই নয় তার বাইরেও আরো নানা ক্ষেত্রকে পশ্চাৎপট হিসাবে ব্যবহার করে নানা সক্রিয় কার্যকলাপ পরিকল্পনা করা যেতে পারে। শিক্ষকরা নিজেরা নানা ক্রিয়াকলাপ পরিকল্পনা করে বা পাঠ্য ও অন্যান্য বই থেকে আহরণ করে শিক্ষার্থীকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জ্ঞান আহরণ ও সৃজন করতে শেখাবেন এটাই কাম্য।

## ৪.৭ সময়

এর পূর্ববর্তী নথিগুলির প্রত্যেকটিতেই সময় সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর একটি পৃথক অনুচ্ছেদ সনযোজিত হয়েছে। সেইসব সুপারিশগুলি আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হিসাবে অনুমোদন করতে চাই। আরো মনে করি মোট কাজের দিনের সংখ্যাটি কোনও অবস্থাতেই প্ররিবর্তন করা উচিত নয় এবং এনসিএফ-১৯৮৮ এর অনুমোদন অনুসারে তা হওয়া উচিত বছরে ২০০ দিন। এনসিএফ-১৯৪৪ এর প্রস্তাবনা অনুযায়ী কাজের দিনের প্রকৃতি বিভাজনের একটা রূপরেখা অনুসরণ করা যেতে পারে। এর মধ্যে থেকেই আমরা প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর সময়টুকুকে আরো কার্যকারি উপায়ে ব্যবহার করার জন্য আমরা কিছু পদ্ধতির কথা বলতে চাই।

বর্তমানে স্কুলের সময় সারণীটি প্রদেশ স্তরে নির্ধারণ করা হয়। সময় সারণী নির্ধারণের পদ্ধতিটির আরো বিকেন্দ্রীকরণ করে আঞ্চলিক স্তরে সময় সারণী নির্ধারণের উপদেশ অনেকেই দিয়েছেন। প্রকৃতই এই পদ্ধতিটির বিকেন্দ্রিকরণ করে জেলা পঞ্চায়েতগুলির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে জেলা স্তরে একটি সময় সারণী চালু করার কথা ভাবা যেতে পারে।

আবহাওয়ার পার্থক্যকে সূত্র হিসাবে ধরে এই ধরণের পরিবর্তন করা যেতে পারে। যেমন, মৌসুমী বায়ুর দ্বারা প্রভাবিত অঞ্চলে বর্ষা ও বন্যার আশঙ্কা থাকে বলে বর্ষার সময়ে ঐ অঞ্চলের স্কুল বন্ধ রাখা যেতে পারে। কোথাও কোথাও গরমের তীব্রতা বেশী হবার দরুন দিনের বেলা খেলা বা বাইরে বের হওয়া সম্ভব হয় না। ঐ সব জায়গায় অভিভাবকেরা গরমে স্কুল খোলা রাখার অনুরোধ করেন। কোথাও ফসল কাটার সময়ে অভিভাবকরা ছুটি দিতে অনুরোধ করেন। ওর ফলে ছাত্ররা তাদের পরিবারিক কাজেওঅংশ নিতে পারে। এই রকম নমনীয় সময় রণী অনুসরন করা সম্ভব হলে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের জীবন ও আবহ থেকে আরও বেশী তাদের জীবন-চালনার নানা প্রথা-প্রকরণ শিখবার সুযোগ পাবে এবং স্কুলের কারণে জীবনের নানা সুখ-সুবিধা বা অভিজ্ঞতাকেও বিসর্জন দেবার প্রয়োজন হবে না। স্থানীয় ছুটির দিনগুলিকে ব্লক স্তরে নির্ধারণ করা যেতে পারে। স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দিনগুলি শিক্ষকরা সকলে মিলে আলোচনার মাধ্যমে স্থির করতে পারেন। এক্ষেত্রে গ্রামীন শিক্ষা সমিতির বক্তব্যও শোনা যেতে পারে। স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধকারী শিক্ষা এবং শিক্ষামূলক ভ্রমণের বিষয়টিও আগাম পরিকল্পনা করতে হবে।

> নির্দিষ্ট কাজে ব্যয়িত সময় নির্ধারণ করে তাকে একজন শিক্ষার্থীর প্রকৃত জ্ঞানার্জনে ব্যবহৃত সময় হিসাবে বিচার করার প্রথা চালু আছে। পড়া, পড়াশোনা, লেখা, আলোচনা করা বা কোনও কিছুতে সক্রিয় অংশ নেবার সময়টুকু এর মধ্যে যোগ করা হয়। কিন্তু কিছু টুকে নেওয়া বা পুন:অধ্যায়ন করার সময় এর মধ্যে গণ্য করা হয় না। পাঠক্রম পরিকল্পনার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রকৃত জ্ঞানার্জনের সময় যথাসম্ভব বাড়িয়ে নেওয়া যায়।
>
> শিক্ষার্থীদের বিশেষত উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার মোট সময় কতটা ব্যয় হচ্ছে তা সিলেবাস বা পাঠক্রম রচনা করার সময় বিচার করা দরকার। এর মধ্যে স্কুলে সরাসরি পড়া শিক্ষকের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ, নিজে নিজে পড়ার সময় ও হোমওয়ার্ক করার সময় ধরতে হবে।
>
> সামগ্রিক বাড়ীর কাজের সময়
>
> প্রাথমিক : দ্বিতীয় শ্রেণী অবধি কোনো বাড়ির কাজ নেই এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে সপ্তাহে দু-ঘণ্টা।

মধ্যস্তর : দিনে এক ঘন্টা (সপ্তাহে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা)

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক : দিনে দু ঘন্টা (সপ্তাহে প্রায় দশ থেকে বারো ঘন্টা) শিশুদের যে বাড়ির কাজ দেওয়া হবে সে বিষয়ে শিক্ষক / শিক্ষিকাদের একত্রে পরিকল্পনা করা এবং বাড়ির কাজের পরিমাণকে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনায় স্থির করা প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য যে এইসব নমনীয় ব্যবস্থার অপব্যবহার যাতে না হয় সে ব্যাপারেও যত্নবান হতে হবে। সমস্ত জনগোষ্ঠীর রীতিনীতিই শিশুশিক্ষার পক্ষে আদর্শ নয়। কোনও বিশেষ সমাজ যদি নমনীয় বৈষম্যমূলকভাবে ব্যবহার করে বা কোনও সমাজ যদি লিঙ্গবৈষম্য, জাতবৈষম্য বা সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের প্রচলিত ধারণাগুলিকে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে তবে সেখানে শিক্ষার মূলউদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। নমনীয় শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে শিশুটিকে তার অবসর সময়ে শিশুশ্রমিক হিসাবে নিয়োগের প্রবনতাও তৈরি হতে পারে। বুঝতে হবে যে শিশুদের অবসর সময় কাটানোর অধিকার আছে। কিছু কিছু আঞ্চলিক সমাজ শিশুকে এই রকম খোলামেলা জীবন কাটাতে দেওয়ার পক্ষপাতি কিন্তু অন্য কিছু কিছু সমাজের রীতি প্রকরণ এই ধারণার বিরোধী। প্রায়শই দেখা যায় কন্যাসন্তানটির উপর অল্প বয়স থেকেই সাংসারিক কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীদের উপর পড়ার চাপ উত্তরোত্তর বাড়ছে এবং স্কুলের সময়ের আগে ও পরের তাদের একাধিক গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে যেতে হচ্ছে, ফলত খেলার সময় তারা কমই পায়। স্কুলগুলির পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের বিরোধের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলা এবং শিশুদের খোলামেলা জীবন কাটানোর পক্ষে তাদের অভিভাবকদের বোঝানোরও চেষ্টা চাপিয়ে যাওয়া দরকার।

গ্রাম পঞ্চায়েতের পরামর্শমতো স্কুল কতৃপক্ষ স্কুলের সময়সীমা নির্ধারণ করতে পারবেন। স্কুলে আমার জন্য কতটা দূর থেকে ছাত্রছাত্রীদের আসতে হচ্ছে সে দিকে লক্ষ্য রেখেই স্কুলের সময়সীমা নির্ধারণ করা উচিত। আরও বেশি ছাত্রছাত্রী যাতে স্কুলে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে নজর রেখেই এই নমনীয়তার কথা প্রস্তাব করা হচ্ছে। এই প্রস্তাবে অবশ্য জোমেরর সঙ্গে চাওয়া হচ্ছে যে একটি শিশু স্কুলে, যে সময় কাটার বা স্কুলের পাঠনপাঠনে ব্যয়িত সময় কোনওভাবেই দিনে ছ' ঘন্টার কম হওয়া চলবে না (ECCE) পিরিয়ডের জন্য নূন্যতম তিন ঘন্টা সময় দিতে হবে)। যে সমস্ত অঞ্চলে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের বহুদূর থেকে যাতায়াত করতে হয়, সেখানে বাসের সময় এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে তাদের নির্দিষ্ট সময়ে আসা যাওয়া করতে কোনও অসুবিধা না হয়। বাসের সময়ের জন্য তাদের নিয়মিত দেরিতে আসতে ও আগে চলে যেতে বাধ্য করাটা উচিত বলে গণ্য করা যাবে না।

স্কুলের দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর, টার্ম ইত্যাদি সময়সীমাগুলিকেও সুপরিকল্পিতভাবে রুটিন এবং বৈচিত্র্যের সংমিশ্রণে নির্ধারণ করা দরকার। শিশুদেরর জীবনে রুটিন এবং বৈচিত্র্য দুইএরই গুরুত্ব আছে। এবং আমরা যে ধরণের শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাবতে চাইছি তাতে এই বিবিধতার প্রয়োজন আছে। আমারা মনে করি স্কুল ব্যবস্থার মূল াকাটামোটি অর্থাৎ পরিকল্পনা এবং স্কুলের শিশুটি কতটা সময় কাটাবে এই রকম বিষয়গুলি কিছু প্রচিষ্ঠানিক নিয়ম-নীতি দ্বার নির্ধারিত হবে, কিন্তু অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের খুঁটিনাটি স্কুল তার নিজের সুবিধা ও প্রয়োজন অনুসারে ঠিক করে নিতে পারবে।

বেশিরভাগ স্কুল শুরু হয় সকালের প্রার্থনা সমাবেশ দিয়ে। অনেক স্কুলই এই সময়টাকে স্কুলের সকলকে এক জায়গায় জড়ো করতে কাজে লাগায়। ঐ সময়ে বিশেষ বিশেষ ব্যায়াম করার রীতি চালু আছে। আমরা এর সঙ্গে আর কয়েকটি কাজ সংযোজন করার প্রস্তাব করতে চাই : যেমন, সমবেতভাবে অন্য গান গাওয়া, গল্প শোনা,

অঞ্চলের কোনও বিশেষ মানুষকে অতিথিরূপে এনে তার বক্তৃতা কোনও আঞ্চলিক বা জাতীয় কোনও বিষয় বা ঘটনাকে বিষয় করে একটি অনুষ্ঠান করা, কোনাও একটি ক্লাস কোনও ভালো প্রজেক্ট করে থাকলে এই সময়টাতে তারা তাদের অভিজ্ঞতা অন্যদের বলতে পারে। প্রচিতদিন না হলেও সপ্তাহে একবার বা দুবার এরকম একটু বেশী সময়ের প্রার্থনা সমাবেশ করা যেতে পারে। মিশ্র স্কুলেগুলিতে বিষয় ভাবনার উপর নির্ভর করে ছোটদের ও বড়দের পার্থনা সমাবেশ আলাদা করে করা যেতে পারে। মুজফ্‌ফরাবাদের বাসযাত্রার মত যে সব সংবাদের বিশেষ গুরুত্ব আছে তা একটি আলাদা সামগ্রিক অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করে অনুষ্ঠানটিকে পাঠক্রমভুক্ত করে নেওয়া যেতে পারে।

সমস্ত প্রস্তাবেই স্কুলের সময় সারণীতে ৪৫ মিনিটের একটি পিরিয়ডকে শিক্ষায় ব্যয়িত সময়ের একক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় এই সময়টিকে কার্যত ৩০ বা ৩৫ মিনিটে এনে ফেলা হয়েছে। ঐ সময়টুকু কোনও বিষয় শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ও অর্থবহ বলে মনে করা যায় না। এক একটি পিরিয়ডকে অনেকগুলি লিখিত পাঠ বা টেক্সট লেসন্ শিক্ষার গঠনগত একক বলে মনে করা যেতে পারে।

**সকলের প্রার্থনা সমাবেশ**

শ্রেণীকক্ষগুলিকে এবং স্কুলটিকে দিনের কাজের জন্য উপযুক্ত করে সাজিয়ে গুছিয়ে নেবার মধ্যে দিয়ে দিন শুরু হয়। শৌচাগার থেকে শুরু করে সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, নোটিস বোর্ডগুলিকে উপযুক্ত স্থানে রাখা। ক্লাসের জন্য দরকারি জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখা এই সব কাজের মাধ্যমে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে শুরু করেণ। এতে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ববোধ বাড়াতে ও স্কুল টিকে নিজের বলে মনে করতে সাহায্য করে। এই সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে তারা পরস্পরের সঙ্গ আগের দিনের ঘটনাবলী নিয়ে আলো চনা করতে পারে ফলে ক্লাস চলাকালীন কথাবার্তার প্রয়োজন কমে যায়।

সকালের প্রার্থনার সময় সবাই একসাথে বসতে পারে। এক্ষেত্রে শ্রেণী বিভাজন অনুসরণ না করে সাধারণ ভাবে ছোটদের সামনে ও বড়দের পিছনে পিছনে বসতে দেওয়া হয়। এই সময়টুকুতে কোনদিন ছাত্ররা কোনও উৎসাহোদ্দীপক গল্প শোনে, কোনওদিন গান শোনে বা কোনও অতিথির বক্তৃতা শোনে বা সংবাদপত্র থেকে কোনো চিত্তাকর্ষক প্রতিবেদন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে। তারপর ছাত্ররা তাদের নিজ নিজ ক্লাসে চলে যায়।

স্কুলে কিছু কিছু একঘন্টার বা দেড়-ঘন্টার (দুটি একত্রিত পিরিয়ড) পিরিয়ড অন্তর্ভক্ত করারও প্রয়োজন আছে। শিল্প, কলা, কারিগরি শিক্ষা বা ল্যাবরেটরি পিরিয়ডগুলিকে এরকম বেশি সময়ের পিরিয়ড করা যেতে পারে। দলবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য বা পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত বিষয়গুলি শিক্ষার জন্যও ঐ সময়টাই উপযুক্ত। যখনই একাধিক শ্রেণীকে নিয়েএকসঙ্গে কোনো কাজ করতে হবে তখনই পূর্বপরিকল্পনার প্রয়োজন হবে। শিক্ষক ঠিক করবেন কতটা সময় শিক্ষক নিয়ন্ত্রিণ করবেন। কতটা ছাত্ররা নিজেরা কাজ করবে বা কতটুকু একাধিক শ্রেণী একমাসে কাজ করবে। ভাষা বা অঙ্কের মত কিছু বিষয়ে রোজই ক্লাস হওয়া দরকার কিন্তু অন্য কিছু বিষয়ে প্রাত্যহিক ক্লাস দরকার হবে না। সাপ্তাহিক রুটিনে বৈচিত্র্য ও ভারসাম্য রাখা প্রয়োজন। শিক্ষকারা বিচার করবেন কোনও বিষয়ে বেশী বা কম সময় ব্যয় হচ্ছে কি না, এবং সেই অনুসারে রুটিন পরিমার্জনা করবেন। মূল সময় সরণির সঙ্গে ভারসাম্য রেখে সাপ্তাহিক সময় সরনিতে প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে। তবে পুরো পরিমার্জন প্রকৃয়াটি সুপরিকল্পিত হওয়া দরকার।

### ৪.৮. শিক্ষকের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার এবং পেশাগত স্বাধীনতাঃ

ছাত্রছাত্রীদের বিবিধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে গেলে শিক্ষকের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার জরুরী। ছাত্রের যেমন ক্ষেত্র চয়নের স্বাধীনতা, নমনীয়তা ও সম্মান প্রয়োজন, শিক্ষকেরও এগুলি প্রয়োজন। বর্তমান ব্যবস্থায় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা এবং কেন্দ্রীভূত পরিচালন ব্যবস্থা শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষকের স্বাধিকারের পরিপন্থি। যেখানে পাঠক্রম স্বাধীনতা দেওয়া আছে সেখানেও শিক্ষকরা নতুন কিছু করতে আত্মবিশ্বাসী বোধ করেন না কারণ নতুনভাবে কিছু করলে পরিচালন কতৃপক্ষের কাছে সমলোচিত হবার সম্ভাবনা থাকে। তংাদের স্বাধীনাতা ও বিষয় করনের অধিকারকে সম্মান জনানো দরকার। ক্লসরুমে গণতান্ত্রিক নমনীয় ও সহনশীল সংস্কৃতি আচরণ যেমন জরুরী কতৃপক্ষের ক্ষেত্রেই সেই একই কক্ষ প্রযোজ্য। শিক্ষককে শুধু আদেশ নির্দেশ দেওয়াই নয়। যে সব বিষয় করাকরি ক্লাসের উপর প্রভাব ফেলে সেসব বিষয়ে শিক্ষকের বক্তব্যও ঊর্ধ্বতন কতৃপক্ষকে যত্ন সহকারে শুনতে হবে। শিক্ষকের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের বা অধ্যক্ষের সম্পর্ক সমানাধিকার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আলোচনা ও সহমতের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সমঝোতার আবহাওয়া রক্ষা করতে হবে ও মতান্তর সমাধানের ব্যবস্থাও করতে হবে।

প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে, বিশেষত TV, রেডিও ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় শিক্ষকের মতামত ছাড়াই এগুলি ক্লাসে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং আশা করা হয় তাঁরা তা ব্যবহার করবেন। কিন্তু কিভাবে তা ব্যবহার করা হবে সে ব্যাপারে তাঁদের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

### ৪.৮.১. ভাবনা ও পরিকল্পনার সময়ঃ

* দৈনিক অন্তত ৪৫ মিনিট দিনের কাজ পর্যালোচনা করা, পরের দিনের দরকারি জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়া বা যেসব ছাত্রের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার তাদের সম্পর্কে নোট রাখার জন্য ব্যয় করতে হবে (এই সময়টুকুকে হোমওয়ার্ক সংশোধন করার সময় বাদ দিয়ে ধরতে হবে।

* সপ্তাহে অন্তত একদিন (ন্যূনতম দু'/তিন ঘন্টা) পড়াশোনার পর্যালোচনা, প্রজেক্ট পরীক্ষা করা, নতুন প্রজেক্ট তৈরি করা বা পাঠ পরিকল্পনা করা দরকার।

* বছরের শুরুতে বা শেষে (অন্তত দু' বা তিন দিন) স্কুলের বাৎসরিক সময় সারণী তৈরির কাজ করতে হবে। এই সময়ে ঠিক করে নিতে হবে গোটা স্কুল একসাথে কিকি করা যায়, কী কী আঞ্চলিক ছুটি দিতে হবে, কোন কোন অনুষ্ঠান পালন করা হবে (এর মধ্যে জাতীয় অনুষ্ঠান, ক্রীড়ানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ইত্যাদি ধরতে হবে), শিক্ষক-অভিভাবক মিটিঙের দিনগুলি, শিক্ষামূলক ভ্রমণের সূচী, ফিল্ড-ট্রিপ, দলবদ্ধ কাজের পদ্ধতি ও বিষয় এবং একাধিক শ্রেণীকে একসঙ্গে করে কী কী করান যেতে পারে তার বিষয়বস্তু। স্কুল এবং ক্লাসের আবহ কী হবে তাও শিক্ষকরা ঠিক করে নেবেন। পোষ্টার বদলানো, ডিসপ্লে পালটানো শিক্ষার্থীদের নানা কাজ সংগঠিত করার উপায় এসবও ঠিক করে নিতে হবে। পরিকল্পনার জন্য এরকম আলাদা একটু সময় স্থির করে রাখা খুবই প্রয়োজন। এই অবকাশেই স্কুল সমজের সঙ্গে তার সম্পর্ক, ভর্তির নিয়ম-নীতি, উপস্থিতি, স্কুলের সাফল্য ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা করতে পারে।

* বর্তমানে কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে সময় স্থির করা আছে (বছরে ২০ দিন) তার একটা অংশ ভাবনা ও পরিকল্পনার জন্য ব্যবস্থার করা যেতে পারে।

* ক্লাস্টার স্তরে একই বিষয়ের শিক্ষকদের ভাবনার আদান প্রদানের জন্য একটা আলোচনা ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

**নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (V-VI) ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যন্ত্র বিষয়ক ক্লাসের পরিকল্পনা**

১ম ক্লাস:

খেলা-আমি যখনই একটা শব্দ বলব তোমার মনে আর যা যা জিনিসের কথা আসবে তা লিখে ফেল। সেই সব বস্তুগুলির শ্রেণীবিভাগ কর।

এদের সম্পর্কে আলোচনা করো। কোনও মিলের উপর ভিত্তি করে তাদের শ্রেণীবিভাজন আলোচনা করো। এদের অন্য কোনওরকম শ্রেণী বিভাজন করা কি সম্ভব?

শিক্ষার্থীরা নানা যন্ত্রের ছবি সংগ্রহ করে চার্ট তৈরি করবে।

২য় ক্লাস:

যন্ত্র সম্পর্কে যা যা প্রশ্নের উত্তর তুমি জানতে চাও তা লিপিবদ্ধ করো। কী কী উত্তর জানা আছে।ার কিকি জানা নেই তা চিহ্নিত কর।

শিক্ষক ঘুরে ঘুরে ছাত্রছাত্রীদের বলে দেবেন কী করে কোন কোন বই থেকে, অন্য সূত্র থেকে বা কারও সঙ্গে কথা বলে উত্তর পাওয়া যাবে।

ছাত্ররা ভেবে হোমওয়ার্কের জন্য একটি প্রশ্ন ঠিক করবে যেমন: কোন যন্ত্রটিকে তোমার সবচেয়ে 'ভালো' যন্ত্র বলে মনে হয়, কারণ সহ ব্যাখ্যা কর। প্রশ্নটি বাড়িতে বাবা-মা, ভাইবোন বা বন্ধুদের সাথে আলোচনা করবে।

৩য় ক্লাস:

শিক্ষক সকলের উত্তর দেখবেন, ছাত্ররা সব উত্তর পর্যালোচনা করবে। সবাই মিলে উত্তর খুঁজবে ও আলোচনা করবে।

শিক্ষক জানতে চাইবেন যন্ত্র বিষয়ে কেউ কোনও পদ্য জানে কিনা। না জানলে তিনি লিখিয়ে দেবেন (এ ব্যাপারে পূর্ব-প্রস্তুতি থাকা দরকার)।

৪র্থ ক্লাস:

পাঠ্যপুস্তক থেকে যন্ত্র বিষয়ক অধ্যায়টি পড়া হবে ও প্রশ্নোত্তর আলোচনা হবে।

৫ম ক্লাস:

ছাত্রছাত্রীরা একটি খেলনা ট্রাক বানাবে। রেফারেন্স বই-এর সাহায্য নিয়ে ক্লাসে সংগৃহীত জিনিস দিয়ে ট্রাকটি বানাতে হবে। ৪র্থ ক্লসের শেষে শিক্ষক উপাদান সামগ্রিক একটা তালিকা দিয়ে প্রস্তুত হয়ে আসতে বলতে পারেন।

৬ষ্ঠ ক্লাস:

সমগ্র ব্যাপারটি পর্যালোচনা করে বিষয়টি শেষ হবে। শিক্ষক সকলকে বলবেন ক্লাসের পর আরো কী কী প্রশ্নের উত্তর তারা নিজেরা খুঁজতে পারে।

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য বিষয়টির বিস্তৃতি পরিকল্পনা

কে বলতে পারে যন্ত্র কাকে বলে? উদাহরণ বা ব্যাখ্যা নয়, সংজ্ঞা চাওয়া হবে। কোনও অভিধান থেকে উত্তর খোঁজা হবে ও বোর্ডে লেখা হবে। এবার কোনও বিজ্ঞান বই বা বিজ্ঞান অভিধান থেকে সংজ্ঞাটি নেওয়া হবে। তুলনা করে দেখতে হবে কোনও পার্থক্য আছে কি

না। কোন উত্তরটা বোঝা সহজ আর কোনটা সঠিক তা আলোচনা করা হবে। টুল, মেশিন (যন্ত্র) আর ইনস্ট্রুমেন্ট-এর পার্থক্য নির্ধারণ করা যাচ্ছে কি ?

সমাজ বিজ্ঞান:

কে কোন দেশে কখন প্রথম তালিকাভুক্ত যন্ত্রগুলি বানিয়েছিলেন? তালিকায় থাকবে: ছাপাখানা, টেলিফোন, ইলেকট্রিক বাল্ব, গাড়ি, রেডিও/ টেলিভিশন, হুইল-চেয়ার, হিয়ারিং এইড, রান্নার গ্যাস ও স্টোভ, সেলাই মেশিন, ফ্রিজ, কম্পিউটার। প্রথমে অনুমান ওপরে তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাক এদের আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ কিভাবে বাঁচত আজকের জীবনে এগুলি না থাকলে কী হবে? বিকল্প কোনও ব্যবস্থা আছে কি ?

আলোচনার বিষয়:

সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী কি বেশি যন্ত্র আবিষ্কার করেছে না কি নীচুতলার লোকেরা বেশী আবিস্কারের অধিকারি? পুরুষারা বেশী আবিস্কার করে না মহিলারা? কারা বেশী যন্ত্র ব্যবহার করে পুরুষরা না মহিলারা?

ইংরাজি:

রচনা লেখো : একটি যন্ত্র যা আমার জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছে (হিয়ারিং এইড বা হুইল চেয়ার) অথবা একটি যন্ত্র যা আমি কিনতে চাই।

প্রজেক্ট:

ভালো এবং খারাপ অর্থে কোন কোন যন্ত্র আমাদের জীবন বদলে দিয়েছে। কী কী যন্ত্র আমাদের আছে আর কী কী নেই? কিভাবে সময়, সুবিধা এবং খরচের দিক থেকে যন্ত্রগুলি আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। কীভাবে একটি যন্ত্রকে ভবিষ্যতে আরও উন্নত করা যেতে পারে। ভবিষ্যতের জন্য একটি যন্ত্র আঁকড়ে বর্ণনা করতে ও ব্যাখ্যা করতে হবে।

কি গাড়ি, মোটর সাইকেল বা হুইল চেয়ারের নকশা বানানোর সময় কোন কোন দিকে নজর রাখা উচিত ? কীভাবে এই যন্ত্রগুলির কার্যকারিতা এবং সৌন্দর্য বাড়ানো যায়?

# পঞ্চম অধ্যায়
## পদ্ধতিগত সংস্কার



স্কুল পাঠ্যক্রমে জাতীয় কাঠামোর বিভিন্ন দিক নিয়ে যে আলোচনা বিগত অধ্যায়গুলিতে হল সেগুলির উৎপত্তি সামাজিক বিবেক সম্পন্ন শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য থেকে। এই লক্ষ্যের কেন্দ্রে আছে ছাত্ররা যাদের কাজ শুধুমাত্র শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করা নয় বরং তাদের কাজ হবে একক ভাবে বা অনেকে মিলে কার্যকরী ভাবে নিজেদের জ্ঞানে ভাণ্ডার তৈরি করা। এ জাতীয় পাঠ্যক্রম অনুসরণ করতে হলে একে সাহায্য করতে হবে এর কাঠামোর এবং সেইসব প্রতিষ্ঠানের পদ্ধতিগত সংস্কার করে যারা স্কুলের এবং স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রদের অংশগ্রহণকে লালন করে। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল, সদাজাগ্রত দৃষ্টি এবং শিক্ষামূলক নেতৃত্বের মাধ্যমে শিক্ষক/ শিক্ষিকা প্রস্তুতি এবং তাদের বৃত্তিমূলক অভ্যাসে সাহায্য করার জন্য ব্যবস্থা; পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষাসংক্রান্ত উপকরণ প্রস্তুতির ব্যবস্থা; বিকেন্দ্রীকরণ এবং পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানসমূহ; কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (VET) এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গঠন বৈশিষ্ট্য— পরীক্ষাতন্ত্র। এই পাঠ্যক্রম বাস্তবায়িত হবে পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষকদের কাজ এবং ছাত্রদের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে। স্কুলগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং শিক্ষকদের কর্মপদ্ধতি বিশেষভাবে নির্ভর করবে এই নতুন পদ্ধতির কাঠামোর উপর। কোন কোন বিশেষ ব্যাপারের উপর মনোযোগ দেওয়া দরকার সেগুলি এরপর আলোচিত হয়েছে।

### ৫.১. গুণগত মান সম্বন্ধে সচেতনতা

আমাদের দেশে শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা আছে বিভিন্ন স্তরে তার ব্যাপক মনোন্নয়ন করতে হলে সেই কর্মসূচীর কেন্দ্র হবে পাঠক্রমের সংস্কার। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কিছু বাস্তব দিক সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি প্রয়োজনীয় :

- জ্ঞানের সঙ্গে তথ্যকে মিশিয়ে ফেলার যে প্রবণতা রয়েছে তাকে দমন করা দরকার। এই প্রবণতা থাকলে আলোচ্য বিষয়ের মান প্রায়শই নিম্নগামী হয়।

- শিশু শিক্ষার ফল হিসাবে যা পাওয়া যাচ্ছে তা পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন। এর পরিবর্তে শিক্ষাব্যবস্থার মান এমন করতে হবে যা ছাত্রদের অর্ন্তনিহিত শক্তি এবং চালিকাশক্তির বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

- প্রাক-বিদ্যালয় পর্ব থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত উৎপাদনশীল কাজকে জ্ঞান আহরণ, মূল্যবোধের বিকাশ এবং বিবিধ দক্ষতা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাদানকারী মাধ্যম হিসাবে দেখা প্রয়োজন।

- শিশু শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে পাঠ্যসূচীর পছন্দের তালিকা এমনভাবে করতে হবে যেন তার মধ্যে যথেষ্ট নমনীয়তা এবং বহুমুখীনতা থাকে, যে ব্যাপারে জোর দিয়েছে NPE ১৯৮৬ এবং POA ১৯৯২।

- চট্টোপাধ্যায় কমিশন (১৯৮৪)-এর সুপারিশ অনুযায়ী নিয়োগ নীতি। নিয়োগের আগের এবং চাকুরিরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ এবং চাকরির শর্ত ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার পেশাদারিত্বের বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

- ক্লাসরুমে শিক্ষা দেওয়া এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষাদানের বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিকে একটি সহায়ক পদ্ধতি হিসাবে দেখতে হবে। একে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের বিকল্প হিসেবে দেখলে চলবে না।

উপরোক্ত সুপারিশ থেকে এটা পরিস্কার হওয়া উচিত যে আমরা বোঝাতে চাইছি সুপ্রযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে অর্জিত মানই হচ্ছে গুণগত মান, শুধুমাত্র উপদেশ বা জ্ঞানসঞ্চয় নয়। আত্মসচেতনতার লক্ষণ হিসেবে কোনো পদ্ধতির গুণগত মান বলতে বোঝায় পদ্ধতির সেই ক্ষমতাকে যার দ্বারা নিয়মিত সংস্কারের মাধ্যমে পদ্ধতি নিজের দুর্বলতা হ্রাসের লক্ষ্যে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন সম্ভবনার সৃষ্টি করে। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে যে প্রধান সংস্কারগুলি এখন প্রয়োজন সেগুলির সাহায্যে পদ্ধতির অন্তর্গত একগুঁয়েমি এবং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি সম্পর্কে উদাসীনতার মনোভাব দূর করা সম্ভব। এই বাধাটির কথাই POA ১৯৯২ তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আরও বেশি নমনীয়তার জন্য আধুনিকতার প্রয়োজনের কথা বলে। যেহেতু একটি বিকেন্দ্রীকৃত শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষা এবং কর্মশিক্ষা উভয়কেই প্রাসঙ্গিক হতে হবে সেইজন্য শিক্ষাসংস্কারের লক্ষ্য এবং পদ্ধতি কী হবে তা যথার্থ এবং স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। অগ্রাধিকার তালিকায় আসবে:

- স্কুলগুলিকে তাদের নিজস্ব স্তরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন, জিনিসপত্র কেনবার বেলায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা এবং সম্পর্ক স্থাপন, বেসরকারী স্কুলসহ অন্যান্য স্থানীয় স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া।

- পাঠ্যসূচী তৈরি এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা।

- পরিকাঠামোতৈরি করা যা পাঠ্যসূচী এবং পাঠ্যপুস্তক রিভিশনের জন্য স্কুলের শিক্ষকদের এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষকদের একত্র কাজকরার সুযোগ করে দেবে।

- এমন জায়গা তৈরি করতে হবে যাতে নিজেদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষকরা স্থানীয় প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একত্রে বসে কাজ করতে পারেন।

০ স্কুল কমিটি এবং এন জি ও-দের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন।

০ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন স্তর এবং পরিকাঠামোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন, এবং স্বচ্ছতাকে উৎসাহ দান।

গুনমান কেবলমাত্র দক্ষতা বিচারের মাপকাঠি নয় এর একটি মূল্যবোধের দিকও আছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের চেষ্টা তবেই সফল হবে যদি এর সঙ্গে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও একসঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে। সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থার গুণাবলীর ওপর উপরিভাগের বহুমুখীনতা এবং বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট গড়ন ক্ষতিকারক প্রভাব সৃষ্টির চেষ্টা করে। কারণ সমাজের অধিকতর সোচ্চার অংশের সমগ্র মনোযোগ ছাত্রসমষ্টির একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের ওপর পড়ে। দেশের বিবিধ অঞ্চলের গুণাবলীর তুলনীয় মান যেটি জাতীয় পাঠ্যক্রম গঠনের উদ্দেশ্য এবং শিশুরা যখন বিবিধ প্রেক্ষাপট থেকে একত্রে পড়তে আসে, তখন সেই তুল্যমান নিশ্চিত করতে সাধারণ বিদ্যালয়-ব্যবস্থার বিকাশ কাঙ্খনীয়। এই দলিলে যদি পাঠ্যবস্তু সংক্রান্ত দৃষ্টি (নমনীয়তা, বিষয়মুখীতা, এবং বহুমাত্রিকতা) যদি সাধারণ বিদ্যালয় ব্যবস্থা বিকাশের ভিত্তি গড়ে ওঠে, তবে একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় যেখানে কোনো দুটি বিদ্যালয় বাস্তবে সমরূপ হতে পারে না। পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার অর্থ একটি উদ্দেশ্য হিসাবে সামাজিক ন্যায়ের অনেক তাৎপর্য আছে তার মধ্যে কয়েকটি আবার খুব সূক্ষ্ম। একটি অতিপ্রয়োজনীয় তাৎপর্য এই যে শিক্ষা যেন শিক্ষার্থীদের মনে একটি অভিন্নতার ভাব গড়ে তোলে। ভারতবর্ষের সংবিধানের আদর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন ভাষা এবং ধর্মভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এবং যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। উপজাতিদের ক্ষেত্রে কিছু রাজ্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। যার ফলে সেইসব রাজ্যের শিশুরা অল্পবয়সেই মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে। বহুভাষাবিদ শিক্ষক পাওয়ার জন্য আরও কিছু উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও প্রসারিত ও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিতে হবে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সূক্ষ্ম দিকগুলি্ হচ্ছে চ্যালেঞ্জিং। এর মোকাবিলা করার জন্য যা দরকার তা হচ্ছে, শিক্ষকদের দক্ষতা এবং সচেতনতা, তার সঙ্গে চাই শিক্ষক, পুস্তক প্রণেতা এবং পাঠ্যসূচী প্রণেতার নিজেদের মধ্যে সমন্বয় এবং নমনীয়তা।

শিক্ষা ছাত্রদের কাছে একটি যত্নশীল পরিচর্যাকরী ব্যবস্থা। আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের কোনো ভেদাভেদ না করে, এই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজন।

শিক্ষকদের যথাযথ শিক্ষাব্যবস্থা এবং পাঠ্যসূচী এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া বর্তমানে, বি. এড ও এম. এড শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের যেসব ব্যবস্থা আছে সেগুলিকে ক্লাসরুম কালচার তৈরির ব্যাপারে বিশেষ জোর দেওয়া হয় না। এই ক্লাসরুম কালচারই পারে, বিশেষ করে যারা দলিত এবং প্রান্তিক সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে এসেছে, সেই সব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একাত্মবোধ গড়ে তুলতে। পাঠ্যসূচী তৈরি বা পাঠ্যপুস্তক লেখার সময় সাংস্কৃতিক প্রভেদের মতো সংবেদী বিষয়গুলি পরে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু এগুলিকে মূল পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। জাতীয় পাঠক্রমের খসড়া তৈরির সময় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যেসব অসংখ্য প্রস্তাব NCERT-র কাছে আসে তার একটিতে একজন ছাত্রী প্রস্তাব দিয়েছে বালিকাদের প্রতি বালকদের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত সেটা শেখানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এই জাতীয় সংস্কৃতিবান প্রতিটি ক্লাসরুমে এবং বিদ্যালয়ের নীতির মধ্যে প্রসারিত করে নেওয়া যেতে পারে।

### ৫.১.১. বিদ্যালয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা তা কার্যকর করবার ভাবনাঃ

পরিকল্পনা অনুযায়ী স্কুলে শিক্ষাদানের বর্তমান অভ্যাসটির কাজ হচ্ছে সারা বছর ধরে পড়ানোর সময়টা বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া এবং স্কুলের অন্যান্য কাজকর্ম কীভাবে হবে তা ঠিক করা। SCERT অথবা রাজ্য শিক্ষা দফতর রাজ্যের সমস্ত স্কুলের জন্য এই একই পদ্ধতি তৈরি করে দেয় এবং স্কুলগুলিও তা মেনে চলে।

স্কুল পর্যায়ে পরিকল্পনা তৈরির ওপর জোর দিয়েছিলেন কোঠারী কমিশন এবং বলেছিলেন প্রতিটি স্কুলের জন্য আলাদা পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন তৈরির কথা।

বিদ্যালয়ের পরিকল্পনাকে অর্থবহ হতে হলে বিভাগীয় প্রধান এবং সমস্ত শিক্ষকদের এতে অংশগ্রহণ করতে হবে। পরিকল্পনার একটা অঙ্গ হচ্ছে স্কুলের সম্পদের বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন। দ্বিতীয় হচ্ছে ছাত্রদের বহুমুখী প্রয়োজনের কথা ভেবে তাতে সাড়া দেওয়ার জন্য স্কুলের কী সম্পদ এবং সহযোগিতা প্রয়োজন সেগুলি ঠিক করা। পরিকল্পনা তৈরির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি যার দ্বারা স্কুলে ছাত্রদের শিক্ষাদানে সমাজের বৃহত্তর অংশের সমর্থন এবং অংশগ্রহণ আদায় করা যায়। এই অংশের মধ্যে আছে সেই এলাকার শিক্ষা কমিটি এবং বিধিবদ্ধ সংস্থা যেমন পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি। অনুপুঙ্খ পরিকল্পনা, যার মধ্যে থাকবে গ্রামস্তরে স্কুলে অংশগ্রহণের চিত্র তৈরি করা (স্কুলে নিবন্ধিত নয় এমন শিশু, উপস্থিতির ধরণ, যাদের কিছু আলাদা প্রয়োজন আছে এমন বাচ্চা) তার সঙ্গে মানবিক সম্পদের শনাক্তকরণ, স্কুলকে সাহায্য করে প্রতিটি শিশুর জন্য আরও বাস্তবসম্মত কর্মসূচী তৈরি করতে। পরিকল্পনা তৈরির পর্যায়ে এবং সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য স্কুলকে আরও স্বাধীনতা দেওয়ার লক্ষ্যে এটা প্রয়োজনীয় যে আর্থিক বরাদ্দ যেন স্কুলগুলিকে নিজেদের পরিকল্পনা এবং মানোন্নয়নের জন্য এবং আর্থিক ব্যয়বরাদ্দের হিসাবে আরও স্বচ্ছতা এবং গ্রহণযোগ্যতা আনার জন্য বেশি নমনীয়তা প্রদান করে।

এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা একেবারে নিচুতলা থেকে বিস্তৃতভাবে সঠিক পরিকল্পনা গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত থাকবে। একমাত্র তখনই ছাত্রদের প্রয়োজননুসারে স্কুলের স্বায়ত্তশাসন, স্কুল এবং শিক্ষকের ক্ষেত্রে পছন্দ করার সুযোগ এবং স্কুলের দায়িত্ববোধ সৃষ্টি সম্ভব হবে। উন্নতি করার পরিকল্পনার একটি বিস্তৃত কাঠামো, যা শুরু হবে একটি বিশেষ এলাকার স্কুলগুলিকে নিয়ে, পরবর্তীকালে যা ঘনীভূত হবে ক্লাস্টার বা ব্লক পর্যায়ে দেখতে হবে যেন জেলাস্তরে প্রকৃতই বিকেন্দ্রীকৃত একটি পরিকল্পনার সৃষ্টি হয়। লক্ষ্য স্থির করা, তার জন্য পরিকল্পনা করা এবং দায়িত্ব নেওয়া এইসবগুলি সমন্বয়ে বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হবে।

### ৫.১.২. স্কুলের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে নেতৃত্ব ও সামগ্রিক দেখাশোনা:

স্কুলে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে নেতৃত্বদানে প্রধানশিক্ষকের ভূমিকা এখনও সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি। বর্তমানে প্রধানশিক্ষকের অধিকাংশ কাজই হচ্ছে প্রশাসনিক। যদিও এই কাজ কররার মতো প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তাদের নেই। এমনকি স্কুলের নিয়মিত কাজকর্ম সুনিশ্চিত করার ক্ষমতাও তাঁদের নেই। প্রায়শই দেখা যায় স্কুলের কার্যক্রম সম্বন্ধে কোনো কিছু মানোন্নয়নের বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বা অধিকার কোনোটিই তাঁদের নেই। প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকদেরও চিহ্নিত করতে পারা উচিত যে তারা স্কুলের জন্য কী সহায়তা চান। তাঁদের স্পষ্ট ভাবে বলতে হবে, প্রশিক্ষণের বিষয়, ব্লক এবং ক্লাস্টার থেকে মনোনীত ব্যক্তিদের পরিদর্শন, এবং স্কুলে দেখাশোনা বা তত্ত্বাবধান তাঁদের অংশগ্রহণে তাঁদের প্রত্যাশা কী? বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষাসংক্রান্ত ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকদের বিশেষ করে একই শৃংখলভুক্ত কয়েকজন প্রধান শিক্ষকদের ভূমিকা কী তা বিশেষভাবে উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন, এদের ক্ষমতা দেওয়ার দিকে নজর দেওয়া উচিত।

মান বৃদ্ধি, পরিবেশ সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে এখন অনেক কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছে। এইসব কর্মসূচী পরিচালনা বা তাতে অংশগ্রহণের কাজে আবদ্ধ হয়ে থাকছেন। দেখা যাচ্ছে এইসব অনেক কর্মসূচীর উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্ধতি যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। স্কুল পর্যায়ের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে কী ধরনের অনুষ্ঠান তাদের প্রয়োজন এবং কী ধরনের অনুষ্ঠানকে স্কুলের নিয়মিত কাজকর্মের অর্ন্তভুক্ত করা হবে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা স্কুলের থাকবে। তারপরেই ব্লক এবং ক্লাস্টার পর্যায়ে এই অনুষ্ঠানগুলির সমন্বয় করা সম্ভব হবে।

প্রথাগতভাবে স্কুলের কাজকর্ম তদারকির ভার স্কুল ইন্সপেক্টরের। এই প্রথায় স্কুলগুলির উপর কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ রাখা গেছে কিন্তু শিক্ষকদের কোনো সাহায্য হয়নি। স্কুল ইন্সপেক্টরদের অনেক কাজ করতে হয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে তাঁর এলাকার স্কুলগুলি পরিবর্তন। এই পরিদর্শনগুলি হয় অনেকদিন অন্তর, এবং এই পরিদর্শনের সময় স্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষকরা পরিদর্শকের সামনে স্কুলের ভালো দিকগুলোই তুলে ধরেন। বাস্তব অবস্থা যাই হোক না কেন বিশেষত ছাত্ররা এটি করে শাস্তির ভয়ে, এর ফলে ইন্সপেক্টরের স্কুল পরিদর্শন যেন পুলিশ আসার মতো হয়ে গেছে। স্কুলের মনোন্নয়নের জন্য নজর রাখা হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যা ক্লাসে শিক্ষাদান ও গ্রহণ সম্পর্কে গঠনমূলক সমালোচনা করে স্কুলকে সাহায্য করে। বর্তমানে যে নজরদারি পদ্ধতি আছে,উদ্দেশ্যের কথা ভেবে সতর্কভাবে তার বিশ্লেষণ করা অবশ্যই দরকার। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই প্রথার যে পদ্ধতি এবং মান তারও বিশ্লেষণ প্রয়োজন, ক্লাসের শিক্ষা এবং শিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রতিটি স্কুলের সঙ্গে আলাদাভাবে আরও বেশি মতের আদানপ্রদান প্রয়োজন।

### ৫.১.৩. পঞ্চায়েত এবং শিক্ষা

৭৩তম সংবিধান সংশোধনের ফলে আমরা এক ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পেয়েছি, গ্রাম তালুক এবং জেলা স্তরে। এই ব্যবস্থা দেশবাসীকে দিয়েছে যৌথ স্বার্থে চিন্তা করতে, সিদ্ধান্ত নিতে এবং কাজ করতে, উন্নয়নের কাজে আরও বেশি অংশগ্রহণের ক্ষমতা। আরও বেশি করে গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ এবং সামাজিক ন্যায় ও আর্থিক উন্নয়েনের পরিকল্পনার রূপায়ণ। ৭৩তম সংবিধান সংশোধন ২৯টি বিষয়কে চিহ্নিত করেছে যা পঞ্চায়েতের অধিকারে থাকবে, এর মধ্যে আছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও অপ্রচলিত শিক্ষা, গ্রন্থাগার, কারিগরী প্রশিক্ষণ এবং বৃত্তি শিক্ষা। সমস্ত র‍্যজ্য সরকার তাদের পঞ্চায়েত রাজ্য আইন অনুযায়ী কাজ করছে যাতে গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সংবিধানের নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়।

#### অধিক্রমণ এবং কাজে অনিশ্চয়তা:

দেশের অনেকগুলি রাজ্য পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের জন্য কাজ নির্দিষ্ট করেছে। কিছু রাজ্যে আবার পঞ্চায়েতের ওপর বিশাল কাজের ভার দেওয়া হয়েছে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, পঞ্চায়েত বিশেষ করে তালুক এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে কিছু কাজ হচ্ছে। কিন্তু কিছু রাজ্যে বেতন দেওয়ার কাজ বাদ দিলে তালুক এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে এমন কোনো কাজ করেনি যার বিন্দুমাত্র তাৎপর্য আছে। একই কথা বলা যায় স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, নারী ও শিশুদের উন্নয়নের ক্ষেত্রেও। এছাড়াও বিভিন্ন স্তরে কাজে অনেক অনিশ্চয়তা এবং অপরকে টপকে যাওয়ার প্রবণতাও আছে। এই অনিশ্চয়তার কারণে অনেক সময় আবার দুটি স্তরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিতি হয়, বিভিন্ন ইস্যুতে যেমন কে পরিকল্পনা করবে আর সিদ্ধান্ত নেবে? কে বাছাই করবে. অর্থের জোগান দেবে? ইত্যাদি। বাস্তবিকই কে কোন কাজ করবে সে ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন ধারণা নেই।

#### সহায়তার নীতি:

পারস্পরিক সাহায্যের মাধ্যমে কাজ করাই হচ্ছে পঞ্চায়েতের কর্মপদ্ধতির ভিত্তি। সহায়তার নীতির মূলকথা হচ্ছে— যে কাজটা যে স্তরে সবচেয়ে ভালোভাবে করা যায় সে কাজটা সেখানেই হওয়া উচিত তার ওপরের স্তরে নয়। সবথেকে নীচের স্তরে যে কাজগুলি সবচেয়ে ভালোভাবে করা সম্ভব সেই কাজগুলি নীচের স্তরেই করতে হবে। এর জন্য দরকার পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে যেসব কাজ করা হয় তার যুক্তি এবং বাস্তবসম্মত বিশদ আলোচনা। একই সঙ্গে কাজগুলি করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগানকেও সুনিশ্চিত করতে হবে।

**পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করা:**

রাজ্যস্তরে জেলা সাক্ষরতা সমিতি ডি. পি. ই. পি. সোসাইটি, এস. এস. এ. সোসাইটি এবং গ্রাম ও তালুক স্তরে এজাতীয় বিভিন্ন সমান্তরাল স্বয়ংশাসিত সংস্থা গড়ে তোলার প্রবণতা পঞ্চায়েত রাজ্য-এর ক্ষমতাকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাঙের ছাতার মতো এই সমান্তরাল সংগঠন গড়ে উঠছে। প্রত্যেকটি গ্রামেই তাদের নিজস্ব শিক্ষা কমিটি, জলনিকাশি সমিতি, বন কমিটি, দাঙ্গা নিবারণ সমিতি জাতীয় বিভিন্ন সংগঠন আছে। এদের কেউই পঞ্চায়েতের কাছে জবাবদিহি করে না। এরা বিভিন্ন বেসরকারী উৎস থেকে আর্থিক সাহায্য পায় এবং এদের নিয়ন্ত্রণ করে গ্রামের কিছু কর্তাব্যক্তি।

**সংক্ষেপে পঞ্চায়েতের কর্মসম্পাদনের প্রধান সমস্যাগুলি হল:**

- পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে যে কাজের ভার দেওয়া হয় এবং যে অর্থ মঞ্জুর করা হয় সেই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না।
- গ্রামস্তরে সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন সমান্তরাল কমিটি গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত পঞ্চায়েতের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়, এবং ভালো করে যেন তারা বিভিন্ন কাজে স্থানীয় লোকের অংশগ্রহণ বাড়াচ্ছে।

কিছুদিন ধরে ব্লক বা জেলা স্তরে বিভিন্ন নির্দেশিকা যেমন, নিবন্ধীকরণ, ছেড়ে যাওয়া, সাফল্য ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এগুলিকে আবার স্কুলের কাজকর্মের ও বৃহত্তর স্কুল পরিচালনার মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। একে তো এইধরনের রেকর্ড নিয়মিত রাখার জন্য সরকারী নির্দেশ স্কুলের ওপর বোঝা বাড়াচ্ছে তার ওপর এই ধরনের তথ্য প্রায়শই যা পাওয়া যায় তা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। বিভিন্নস্তরে স্কুলের পরিমাণগত (গুণগত নয়) কাজের মূল্যায়নের ওপরেই অনাবশ্যক জোর দিচ্ছে, অথচ শিক্ষাক্রম এবং বিদ্যালয় পরিকল্পনার কাজের তুলনামূলক আলোচনাটি অবহেলিত থেকে যাচ্ছে।

ব্লক রিসোর্স সেন্টার এবং ক্লাস্টার রিসোর্স সেন্টার এখন সমস্ত জেলাতেই আছে স্কুলের এবং শিক্ষকদের কাজের ওপর নজরদারির জন্য। প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য জেলা স্তরে DIET স্থাপন করা হয়েছে। এইসব সংস্থাগুলির কার কী কাজ তা পরিষ্কার না হওয়ার জন্য এবং একে অপরকে টপকে যাওয়ার প্রবণতার জন্য নিজেদের কাজে প্রায়ই ঠোকাঠুকি লেগে যায়। প্রায়শই রিসোর্স সেন্টারের কর্মীসংখ্যা কমিয়ে তাদের প্রশাসনিক এবং তথ্য সংগ্রহের কাজে লাগানো হচ্ছে। বিকেন্দ্রীকৃত স্কুল স্তরে শিক্ষা পরিকল্পনা এবং শিশুশিক্ষার্থীদের প্রয়োজন শিক্ষাক্রমের সংজ্ঞা নিরূপণে শিক্ষকদের কার্যকরী এবং সৃষ্টিশীল ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে এটা জরুরী যে বি. আর সি. এবং সি আর. সি. দের আরও উৎসাহিত করা প্রয়োজন, যাতে তারা সুবিধাজনক ভূমিকা পালন করতে পারে। এইসব কেন্দ্র (বি. আর. সি., সি. আর. সি.) রিসোর্স কর্মীদের ভূমিকা নিরূপণ করা প্রয়োজন। এইসব কর্মীদের, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে, তাদের বিষয়ের প্রতি জ্ঞানবৃদ্ধি করে, কাজের উপযুক্ত জায়গা দিয়ে এবং কিছুটা পর্যন্ত স্বশাসনের অধিকার দিয়ে, কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা দরকার। যত্রতত্র তৈরি হওয়া ওয়ার্কশপগুলিকে রুটিনমাফিক দেখাশোনা করতে পরিবর্তে এই সেন্টারগুলি এলাকাভিত্তিক প্রয়োজনানুযায়ী তৈরি হওয়া ওয়ার্কশপগুলির বিস্তৃত দেখাশোনা করতে পারে। স্কুল পরিদর্শনের নিয়মাবলী ঠিক করা, স্কুলের কাজকর্ম নিয়মিত দেখাশোনা করা ও তার রিপোর্ট দেওয়ার রূপরেখা তৈরি করা এবং শিক্ষাসম্পর্কিত কাজে সাহায্য করাও এই সেন্টারগুলির কাজ হবে। এছাড়াও এই সেন্টারগুলির এমন গঠনতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে যাতে বিভিন্ন সেন্টারগুলির কাজের সমন্বয়ের মাধ্যমে অনেক বেশি "সম্মিলিত ফল" পাওয়া যায়। শিক্ষাদানের কাজে শিক্ষকদের স্কুলভিত্তিক সাহায্য জোরদার করার জন্য গ্রাম, ব্লক, ক্লাস্টার এমনকি শহরতলীতেও যারা তথ্য সরবরাহ করতে পারে এমন ব্যক্তিদের তালিকা করা প্রয়োজন। এইসব লোকেরা নিয়মিত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে শিক্ষকদের নতুন নতুন ধারণা এবং পদ্ধতির সাহায্যে কাজ করতে সাহায্য করবে। এই ধরনের সহযোগিতাকে ব্লক এবং ক্লাস্টার পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিলে একে একটি 'নিয়মিত শিক্ষক-সহায়ক কাজ' হিসাবে অন্তর্গত করে নেওয়া যাবে এবং তখন এরজন্য অর্থবরাদ্দ পাওয়া

সম্ভব হবে।

### ৫.২. পাঠ্যক্রম নবীকরণের লক্ষ্যে শিক্ষকদের শিক্ষাদান:

যদিও শিক্ষকদের জন্য পেশাগত প্রস্তুতিকে ১৯৬০ থেকেই চূড়ান্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তবুও বাস্তব অবস্থাটি এখনও চিন্তার কারণ। কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬) জোর দিয়েছিলেন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন শিক্ষার মূল ধারার ভিতর আনতে। কিন্তু শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলি এখনও সংকীর্ণ হয়েই রয়েছে। চট্টোপাধ্যায় কমিটি (১৯৮৩-৮৫)র সুপারিশ অনুযায়ী ১২ ক্লাস অবধি পড়াশোনার পর পাঁচ বছরের প্রশিক্ষণ পর্ব হওয়া উচিত। তিনি এও বলেছিলেন কলা এবং বিজ্ঞান শাখার কলেজগুলিতে "এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট খোলা উচিত যেখানে ছাত্ররা এই প্রশিক্ষণ নিতে পারবে। যশপাল কমিটির রিপোর্ট (১৯৯৩) "লার্নিং উইদাউট বার্ডেন" - এ বলা হয়েছে প্রশিক্ষণে জোর দেওয়া উচিত স্ব-শিক্ষা এবং স্বাধীন ভাবনা করার ক্ষমতা তৈরির ওপর।

বাস্তব অবস্থানে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বর্তমানে শিক্ষকদের শেখায় সেই ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে যে ব্যবস্থায় শিক্ষা বলতে বোঝায় তথ্য সম্প্রসারণ। পাঠক্রম সংস্কার প্রচেষ্টার সঙ্গে সহযোগী হিসাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণের যথেষ্ট উন্নতি ঘটানো হয়নি। প্রচুর পরিমাণে প্যারা টিচার নিয়োগ করে পেশাদার শিক্ষকদের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। নব্বই-এর দশকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শিক্ষকদের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের ওপর। এর ফলে চাকরিপূর্ব এবং চাকরি চলাকালীন প্রশিক্ষণের ভিতর বিভাজন আরও স্পষ্ট হয়ে গেছে। উক্ত শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষকরা বিচ্ছিন্ন হয়েই রয়ে গেছেন এবং তাদের প্রকৃত প্রয়োজনের কথা কেউ বলেনি। বাকি কার্যক্রমগুলি শিক্ষার রূপরেখা বা স্কুলের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে কিছু বলেনি।

#### ৫.২.১. বর্তমান ব্যবস্থায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ :

শিক্ষক / শিক্ষিকাদের শিক্ষা-কর্মসূচীতে বর্তমানে শিক্ষক / শিক্ষিকাদের এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মানানসই হয়ে ওঠার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যে ব্যবস্থাকে তথ্যের সংবহন হিসাবে গণ্য করা হয়। পাঠ্যসূচী সংস্কারের উদ্যোগ তেমন পর্যাপ্ত আকারে শিক্ষক /শিক্ষিকাদের শিক্ষায় সমর্থিত হয়নি। ব্যাপক মাত্রায় পাঠ্য-শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের ফলে পেশাগত ভাবে শিক্ষক /শিক্ষিকা এই পরিচয়টির গুরুত্ব হারিয়েছে। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ে শিক্ষক /শিক্ষিকাদের কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণের বিষয়টি কেন্দ্রীয়ভাবে গুরুত্ব পায়। এরই ফলে শিক্ষক / শিক্ষিকাদের শিক্ষায় প্রাক্-কর্মজীবন এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক /শিক্ষিকারা ক্রমাগত উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে এবং তাদের বৃত্তিগত বিকাশের প্রশ্নটি উপেক্ষিত থেকে যায়। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষক /শিক্ষিকাদের শিক্ষা-কর্মসূচীতে কোনো স্থান নেই অথবা বিদ্যালয় এবং সমাজমধ্যস্থ যোগসূত্রের প্রশ্নটি সেখানে উচ্চারিতও হয় নি। শিক্ষাসংক্রান্ত উদ্ভাবনী পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে যুক্ত থাকার কোনো সামান্য পরিসরও সেখানে নেই।

শিক্ষক /শিক্ষিকাদের শিক্ষা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, সেখানে জ্ঞানকে একটি প্রদত্ত বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়; যেন পাঠ্যক্রমের মধ্যেই এটি দৃঢ়ভাবে নিহিত আছে এবং কোনো প্রশ্ন ছাড়াই একে গ্রহণ করতে হবে। পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী এবং পাঠ্যপুস্তককে ছাত্র/ছাত্রী-শিক্ষক /শিক্ষিকা অথবা স্থায়ী শিক্ষক /শিক্ষিকারা কখনোই যুক্তিনিষ্ঠায় পরীক্ষা করেন না। শিক্ষক / শিক্ষিকার ভাষার প্রতি দখল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং প্রচলিত শিক্ষক /শিক্ষিকারা শিক্ষা কর্মসূচী পাঠ্যক্রমে ভাষার কেন্দ্রীয় ভূমিকা স্বীকার করে না। অনুমান করা হয় যে, নির্দেশ-সংক্রান্ত আদর্শ এবং নির্দিষ্ট বিষয়গুলির শিক্ষাদান কর্মসূচী চলাকালীন এ দুয়ের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই যোগসূত্র গড়ে উঠবে। অধিকাংশ শিক্ষক /শিক্ষিকা শিক্ষা-কর্মসূচীতে ছাত্র/ছাত্রী তথা শিক্ষক / শিক্ষিকার নিজস্ব অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত করার কোনো সুযোগই থাকে এবং ফলত, শিক্ষা/শিক্ষিকাদের পরিবর্তনের দূত হিসাবে শক্তিশালী করে তোলার কাজেও এই শিক্ষা ব্যর্থ হয়।

### ৫.২.২. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য মনোযোগ :

বিদ্যালয় ব্যবস্থায় অধুনা-উদ্ভূত যে দাবীসমূহ, শিক্ষক /শিক্ষিকাদের শিক্ষা অবশ্যই তার প্রতি অধিক মনোযোগী হবে। সেকারণে এই শিক্ষা শিক্ষক /শিক্ষিকাদের অবশ্যই এমনভাবে প্রস্তুত করবে যাতে তাঁরা আপন ভূমিকায় হয়ে ওঠেন এমন একজন যিনি:

* শিক্ষা-শিক্ষণ পরিস্থিতির মধ্যে শিক্ষার্থীকে (ছাত্র-ছাত্রী) তাদের স্বীয় প্রতিভা আবিষ্কার, পূর্ণতর মাত্রায় নিজেদের শারীরিক এবং বৌদ্ধিক ক্ষমতা অনুভব করা এবং একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে নিজ নিজ চরিত্র এবং কাঙ্খিত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে উৎসাহদাতা, সহায়ক এবং মানবিক গুণ-বৃদ্ধিকারী; এবং

* একটি দলের সক্রিয় সদস্য হিসাবে পাঠ্যক্রম নবীকরণের জন্য সচেতন উদ্যোগ নেয়, যাতে পরিবর্তিত সামাজিক প্রয়োজন এবং শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সঙ্গে এটি সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

* এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনে সক্ষম হবার জন্য শিক্ষক /শিক্ষিকাদের শিক্ষায় অবশ্যই নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকবে যাতে ছাত্র/ছাত্রী - শিক্ষক /শিক্ষিকা সমকক্ষ হয়ে ওঠেন:

* যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা অনুধাবনে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সংবাহী মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করতে;

* পাঠ্যপুস্তকের বহিস্থ বাস্তবতায় জ্ঞান নিহিত আছে এমন ধারণার বিপরীতে জ্ঞানকে শেখানো-শেখার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নির্মিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হিসাবে দেখতে;

* যে সামাজিক, পেশাগত এবং প্রশাসনিক বিষয়বস্তুর মধ্যে তাদের কাজ করতে হবে, তাদের প্রতি সচেতনতায়।

* উপরোক্ত বোধগুলি কেবল প্রকৃত বাস্তবতার মধ্যে সন্ধান না করে তাদের সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিকাশে;

* ভাষার ক্ষেত্রে একটি গভীর জ্ঞানের ভিত্তি এবং দক্ষতা অর্জনেও;

* আপন প্রত্যাশা, আত্মবোধ, দক্ষতা এবং প্রবণতা সনাক্তকরণে;

* নির্দ্দিষ্ট পরিস্থিতির নিরিখে শিক্ষক /শিক্ষিকা হিসাবে নিজস্ব পেশাগত প্রবণতার সূত্রায়নের সচেতন উদ্যোগে;

* নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষামূলক প্রক্রিয়া হিসাবে প্রশংসাসূচক স্বীকৃতির মান্যতায়;

* শিল্প শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মনে শৈল্পিক এবং নান্দনিক বোধ বিকশিত করতে;

* প্রান্তিক এবং প্রতিবন্ধী সহ সমস্ত শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তায় সোচ্চার হতে।

* পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতের প্রসঙ্গে, শিক্ষক /শিক্ষিকাদের বৃত্তিগত ক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে শিক্ষক /শিক্ষিকার শিক্ষাসংক্রান্ত সুসংহত একটি আদর্শ রূপ অনুসরণ করা অবশ্যকর্তব্য।

* শিক্ষাগত, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত নিত্য-নৈমিত্তিক সমস্যাগুলির সমাধান অনুসন্ধানে শিশুদের প্রয়োজনীয় বিশিষ্ট সাহায্যের 'সহায়ক', 'উৎসাহদাতা' হয়ে ওঠার দক্ষতা এবং পরামর্শদানের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন।

* বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে, মূল্যবোধ বিকাশে ও বিবিধ দক্ষতা শিক্ষার জন্য কেমন করে একটি শিক্ষাদানকারী মাধ্যমে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড তৈরি করা যায় তার শিক্ষা।

শিক্ষকদের প্রস্তুত থাকা দরকার:

- শিশুদের যত্ন নেওয়া এবং তাদের ভালবাসা।
- সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে শিশুদের বুঝতে পারা।
- গ্রহণ করার এবং নিরন্তর শেখবার মানসিকতা।
- ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অর্থ খুঁজতে গিয়ে চোখে দেখে শিক্ষালাভ এবং নিরন্তর চিন্তা বা মননের সাহায্যে শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চয়।
- দেখে শেখার মাধ্যমে জ্ঞান বলতে শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের ছাপা বইয়ের শিক্ষা নয় শেখা এবং শেখানোর মাধ্যমে তৈরি হওয়া জ্ঞান এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বোঝায়।
- সমাজের প্রতি এবং সুন্দরতর পৃথিবী গড়ার জন্য নিজস্ব দায়িত্ব।
- শ্রেণীকক্ষের ভিতরে ও বাইরে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে উৎপাদনশীল কাজের ক্ষমতা এবং হাতে-কলমে কাজের অভিজ্ঞতাকে প্রশংসাকরা
- গঠন, নীতি, প্রয়োগ এবং বিষয়কে বিশ্লেষণ করা।

### ৫.২.৩. : শিক্ষক / শিক্ষিকা- শিক্ষা কর্মসূচীতে প্রধান প্রধান দিকবদল

* শিক্ষার্থীকেই গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন এই বোধ। শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় একজন নিরাসক্ত গ্রহীতা হিসাবে নয় বরং সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসাবে দেখতে হবে এবং তার দক্ষতা ক্ষমতাকেও কোনো নির্দিষ্ট, স্থিরবস্তু হিসাবে না দেখে প্রত্যক্ষ আত্ম-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিকাশে সক্ষম এবং পরিবর্তনশীল বস্তু হিসাবে গণ্য করতে হবে। শিক্ষার্থীদের খেলা ও কাজে যুক্ত হবার প্রত্যক্ষ সুযোগ সৃষ্টি প্রাকৃতিক এবং সামাজিক ঘটনাবলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন এবং নিরীক্ষণ অনুধাবনে শিক্ষক /শিক্ষিকাদের সাহায্য করার দলিল প্রস্তুত এবং মনোযোগ, কৌতুক এবং সহমর্মিতায় শিশুদের কথা শোনার সুযোগ যাতে সৃষ্টি করা যায় সেই ভাবে পাঠ্যক্রম তৈরি করা পরিকল্পনা করতে হবে।

* শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ সঙ্গী সেই সঙ্গে ব্যাপকতর সামাজিক গোষ্ঠী বা সামগ্রিকভাবে দেশের সামাজিক প্রসঙ্গে যেসব ঘটনা ঘটছে তারই অংশগ্রহণকারী প্রক্রিয়া হিসাবে অবশ্য মান্যতা নিতে হবে। বিবিধ চিন্তাবিদ যেমন গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ, মিদুভাই, জে কৃষ্ণমূর্তি, দেওয়ে এবং অন্যান্যদের শিক্ষাসংক্রান্ত আদর্শ প্রায়শই কোথা থেকে সেগুলি উদ্ভূত তার প্রসঙ্গ এবং অন্যান্য বিষয় ব্যতিরেকে বিচ্ছিন্ন পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করা হয়। এগুলি যে কেবলই পড়া এবং মুখস্থ করাই হয়, যেসব শিক্ষক /শিক্ষিকা তথা শিক্ষাবিদরা শিক্ষানবিশ শিক্ষক /শিক্ষিকাদের

সামনে এইসব ধারণা উপস্থাপিত করেন, তাঁরাও যে খুব কম ক্ষেত্রেই এগুলি প্রয়োগ করেন তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। অংশগ্রহণকারী প্রক্রিয়া হল নিজস্ব-অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক একটি প্রক্রিয়া যেখানে শিক্ষার্থী নিরীক্ষণ, প্রতিফলন, তর্কবিতর্ক এবং আত্মীকরণের মাধ্যমে নিজস্ব পদ্ধতিতে তার জ্ঞান নির্মাণ করে।

* পাঠ্যক্রম বা প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রদত্ত শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক আদেশের কার্যনির্বাহী, শিক্ষা দেওয়া-নেওয়ার সামগ্রিক প্রক্রিয়ার পরিচালক ও অভিভাবক এবং জ্ঞানের উৎস হিসাবে শিক্ষক /শিক্ষিকাদের যে ভূমিকা ছিল সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। বর্তমানে, জ্ঞানের উৎস থেকে পরিবর্তিত হয়ে তাঁর ভূমিকা তথ্যকে জ্ঞানের রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে একজন উৎসাহদাতা এবং শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষাগত লক্ষ্য অর্জনে ক্রমাগত উৎসাহদানে, বিবিধ উন্মেষের মাধ্যমে শিক্ষাকে বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে একজন সহায়ক হয়ে উঠেছে।

* জ্ঞানের ক্ষেত্রে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ পালাবদল ঘটেছে জ্ঞান সংক্রান্ত ধারণায় যেখানে নিরীক্ষণ, যাচাই এবং অন্যান্য উপায়ে বাস্তব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত একটি আরব্ধ হিসাবে, একটি সাপেক্ষ বর্ণনক্ষম অনবচ্ছিন্ন বিষয় হিসাবে জ্ঞানকে গ্রহণ করা হয়। শিক্ষক /শিক্ষিকাদের শিক্ষায় জ্ঞানের উপাদান শিক্ষার পাঠ্যবিষয়ে প্রশস্তগত ক্ষেত্র থেকে নির্নিত হয় এবং সেই ভাবে এটিকে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। এর অর্থ হল যে, 'শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ' সহ সম্পর্কিত বিষয়গুলি থেকে আহৃত তাত্ত্বিক ভাবনাসমূহের নিছকনির্দিষ্ট উল্লেখের পরিবর্তে বরং শিক্ষার প্রেক্ষাপট থেকে এগুলির একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপনের সচেতন উদ্যোগ প্রয়োজন।

* শিক্ষক /শিক্ষিকাদের শিক্ষায় জ্ঞান হল শিক্ষার বিষয়সমূহের মধ্যে চারিত্রিক বিচারে আন্তর্বিষয়ী বস্তু। অন্যভাবে বললে, শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের শিক্ষায় ধারণাসংক্রান্ত বিষয় এমনভাবে উচ্চারিত হওয়া প্রয়োজন যাতে তারা শিক্ষা সম্পর্কিত ঘটনাবলী— কার্যকলাপ, কর্তব্যকর্ম, উদ্যোগ, প্রক্রিয়া, ধারণা এবং ঘটনাকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে।

* এমন একটি শিক্ষক /শিক্ষিকার শিক্ষণ কর্মসূচীতে একটি তাত্ত্বিক বোধ এবং তার বাস্তব দিকগুলিকে দুটি পৃথক উপাদান হিসাবে না দেখে বরং অনেক সুসংহত ভঙ্গিতে দেখার পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়। মাঠপর্যায়ের গবেষণার প্রসঙ্গে একটি যুক্তিনিষ্ঠ সচেতনতার বিকাশে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রী তথা শিক্ষক /শিক্ষিকাকে এটি সক্ষম করে তোলে। এইভাবে একাধারে নিজের এবং অন্যদের প্রচেষ্টায় এই কর্মসূচী শিক্ষার আদর্শ ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যেকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে এহেন শিক্ষক /শিক্ষিকা অনেক বেশি দক্ষ হয়ে উঠবে এবং প্রয়োজনীয় প্রাযুক্তিক ব্যবহারিক জ্ঞান ও আস্থার সঙ্গে প্রচলিত শর্তাদিকে নিছক মেনে না নিয়ে তাদের উন্নতির চেষ্টা করবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ায় সামাজিক ঘটনা বা বিষয়সমূহের প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত বোধের পরিবর্তন।

* শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক / শিক্ষিকারা যে সামাজিক পরিবেশ বিষয়সমূহ থেকে এসেছেন, ভাষার ওপর তাদের বিপুল প্রভাব। বিদ্যালয়ের সামাজিক আবহাওয়া এবং শ্রেণী শিক্ষা এবং শিক্ষণ পদ্ধতির ওপর সামগ্রিকভাবে গভীর প্রভাব ফেলে। এইসব কারণে ব্যক্তি হিসাবে একজন শিক্ষার্থীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর নিরিখে তার মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রের ওপর আত্মবিহ্বলী গুরুত্ব দেওয়ার অবস্থান মেনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানান্তরণের প্রয়োজন হয়েছে।

* বিভিন্ন প্রসঙ্গ শিক্ষাদানে ভিন্নতা আনে। বিদ্যালয়ের বাইরে যে বৃহত্তম সামাজিক প্রেক্ষাপট তারই দ্বারা বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রভাবিত ও বর্ধিত হয়।

* শিক্ষক/শিক্ষিকাদের শিক্ষা কর্মসূচীতে সমসাময়িক ভারতীয় সমাজের আলোচ্য বিষয় ও প্রশ্নগুলি, এর বহুমাত্রিক

চরিত্র এবং আত্মপরিচয়ের লিঙ্গ, সাম্য, জীবনযাপন এবং দারিদ্র্যের প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয় পরিসর দেওয়া জরুরি। শিক্ষাকে প্রাসঙ্গিক করতে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য ও সমাজের সঙ্গে এর সম্পর্কের বিষয়ে গভীর বোধ গড়ে তুলতে এই পরিসর শিক্ষক /শিক্ষিকাদের সাহায্য করতে পারে।

| হইতে | গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন প্রতি |
|---|---|
| * শিক্ষক /শিক্ষিকা কেন্দ্রিক স্থায়ী নকশা | * শিক্ষার্থী কেন্দ্রীক, নমনীয় পক্রিয়া |
| * শিক্ষক / শিক্ষিকা দিকনির্দেশ এবং সিদ্ধান্ত | * শিক্ষার্থীর স্বায়ত্তশাসন |
| * শিক্ষক / শিক্ষিকা পথপ্রদর্শন ও উপদেষ্টা | * উৎসাহদাতা, সহায়ক এবং শিক্ষায় আগ্রহ সৃষ্টি |
| * শিক্ষার নিষ্ক্রিয় বা অনাসক্ত গ্রহীতা | * শিক্ষার সক্রিয় অংশগ্রহণ |
| * শ্রেণীকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে শিক্ষা | * বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষা |
| * জ্ঞান 'প্রদত্ত' এবং নির্দিষ্ট রূপে | * জ্ঞান যা উদ্ভূত ও সৃষ্ট হয় |
| * কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি | * বিবিধ বিষয়ক, শিক্ষাগত কেন্দ্রবিন্দু |
| * সরলরৈখিক প্রকাশ | * বিবিধ এবং বহুমুখী প্রকাশ |
| * প্রশংসা, সংক্ষিপ্ত, স্বপ্ন | * বহুবিধ, নিরবচ্ছিন্ন |

* শিক্ষক /শিক্ষিকাদের শিক্ষা কর্মসূচীতে কর্মসম্পাদনের জন্য প্রশংসার ক্ষেত্রে স্থানবদল ঘটে এটি যে বার্ষিক ঘটনা থেকে এখন নিরবচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয়েছে সে বিষয়টি স্বীকার করা প্রয়োজন। শিক্ষক /শিক্ষিকা তথা শিক্ষাদাতারা ছাত্র/ছাত্রী তথা শিক্ষক /শিক্ষিকার সহযোগিতা এবং একত্রে কর্মসম্পাদন, অনুসন্ধান এবং সুসংহত করার যে ক্ষমতা তার মূল্যায়ন করেন এবং সেইসঙ্গে লেখনে ও কথনের দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও উপস্থাপনার মৌলিকত্ব ইত্যাদি বিষয়ের মূল্যায়ন করেন। সমস্ত মূল্যায়নেরই উদ্দেশ্য হল উন্নতি, ব্যক্তি মানুষের শক্তি ও দুর্বলতা বোঝা, কোনটা শক্তিশালী করতে হবে তা অনুধাবন করা এবং শিক্ষার প্রক্রিয়ার পরবর্তী উদ্দেশ্যগুলি চিহ্নিত করা।

* এই মূল্যায়ন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংখ্যায় দেওয়া হয় না (সংখ্যাক্রম) কিন্তু এর একটি মাত্রাভেদ (গুণাত্মক) থাকে, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা অর্জনকে সাপেক্ষ বর্ণণক্ষম অনবচ্ছিন্ন বিষয় হিসাবে মূল্যায়ন করা হয় এবং বিবিধ কার্যকলাপে তার কর্মসম্পাদন অনুসারে তার স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয়।

* সংক্ষেপে, শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যেহেতু তাৎপর্যময় আমূল রদবদল ঘটে গেছে, সেকারণে শিক্ষার এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যালয় ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রশ্নে অনেক বেশি অনুভবী। প্রধান প্রধান পরিবর্তনগুলি বাম দিকে বিধৃত।

### ৫.২.৪ শিক্ষকদের চাকরিকালীন শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ

শিক্ষকদের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধিতে এবং স্কুল সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজে পরিবর্তন আনার মাধ্যম হিসেবে চাকুরি চলাকালীন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। শিক্ষকদের কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে এবং তাদের

অভিজ্ঞতাকে আশ্বস্ত করার মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। শিক্ষকদের সুযোগ করে দেয় অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে পেশাগত যোগাযোগ গড়ে তুলতে এবং নিজের জ্ঞানকে আধুনিক করে তুলতে। এডুকেশন কমিশন (১৯৬৪-৬৬) সুপারিশ করেছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এবং শিক্ষক সংগঠনগুলির শিক্ষকদের জন্য চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত যাতে শিক্ষকরা প্রতি পাঁচ বছরে একবার করে দু থেকে তিন মাসের প্রশিক্ষণ পান। এই প্রশিক্ষণগুলি হবে গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাগুলিকে বারো মাস ধরেই কাজ করতে হবে, এবং রিফ্রেশার কোর্স, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন করতে হবে। ''ন্যাশনাল কমিশন অন টিচার্স (১৯৮৩-৮৫)''- এর রিপোর্টে টিচার্স সেন্টার-এর একটি ধারণা আনা হয়েছিল (যে ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছনো যায়নি), যেখানে শিক্ষকরা মিলিত হবেন এবং যেখানে মেধাবীদের একজায়গায় জড়ো করার মাধ্যমে শিক্ষকরা একে অপরের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারবেন। প্রস্তাব করা হয়েছিল শিক্ষকরা ''স্টাডি লিভ'' নিয়ে শেখবার জন্য সেন্টারে যেতে পারবেন। ন্যাশনাল পলিসি অন এডুকেশন (১৯৮৬) চেয়েছিলেন চাকরিপূর্ব্ব এবং চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণকে একটি continuum অর্থাৎ শৃঙ্খলে আনতে যার প্রথমটির সঙ্গে শেষেরটির মানের অনেক ফারাক থাকবে। এই রিপোর্টে ভাবা হয়েছিল প্রতিটি জেলায় একটি করে DIET স্থাপনের, ২৫০টি কলেজকে উন্নতমানের করে সেগুলিকে শিক্ষক প্রশিক্ষণের কলেজ করার কথা, ৫০টি IASE স্থাপনের এবং SCERT-কে শক্তিশালী করার কথা আচার্য্য রামমূর্তি রিভিউ কমিটি (১৯৯০) উল্লেখ করেছিলেন চাকুরিকালীন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করার প্রশিক্ষণগুলি হবে। শিক্ষকদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনানুযায়ী এবং প্রশিক্ষণের একটা অংশ হবে মূল্যায়ন করা প্রশিক্ষণের ফলাফলের খোঁজ রাখা।

যে সমস্ত স্থানে প্রাথমিক শিক্ষাকে সাধারণের নাগালের মধ্যে আসার প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করার জন্য বহুস্তরভিত্তিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে এহেন শ্রেণীকক্ষ সামাল দেবার জন্য শিক্ষক /শিক্ষিকাদের বিশেষ শিক্ষণ প্রয়োজন। এই ধরনের শ্রেণী সংগঠন এবং শ্রেণীকক্ষ পরিচালনার অভিজ্ঞতা যাদের আছে, তাদেরই এ কাজ করা উচিত। যেসব শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের অভিজ্ঞতা এবং কল্পনা সম্পূর্ণরূপে একস্তরীয় কাঠামো ঘিরে আবর্তিত, প্রতিটি একক এবং বিষয় পরিকল্পনায় পরামর্শ বা যথাযথ উপকরণের সহায়তা ব্যতিরেকে তাদের শুধুমাত্র কেমন করে সামলাতে হবে এজাতীয় নিদানে কোনো সাহায্য করা যায় না। কী করতে হবে শুধুমাত্র সেই কথা বলার পরিবর্তে, বিশদরূপে একক সংগঠনের পরিকল্পনায় আলোচনা এবং সেইসঙ্গে যেখানে বহুস্তরীয় শ্রেণীশিক্ষা চর্চা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানের প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং এজাতীয় পরিস্থিতির বর্ণাকারী চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা প্রয়োজন যাতে নিজেদের ওপর আস্থার অভাব অতিক্রম করতে শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের সাহায্য করা যায়।

## ৫.২.৫ চাকুরিকালীন শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি এবং কৌশল

NPE (1986)-র পরে DIET, IASE এবং CTE -র মতো প্রতিষ্ঠান তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য। ৫০০টি DIET, ৮৭টি CTE ৩৮টি IASE এবং ৩০টি SCERT স্থাপিত হয়েছিল যদিও এর বেশ কয়েকটি এখনও কাজ শুরু করতে পারেনি। ব্লক এবং ক্লাস্টারের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে DPEP আনা হয়েছিল এবং শিক্ষণ ব্যবস্থায় নতুন প্রাণসঞ্চারের জন্য চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ এবং তৎপরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণকে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। নির্দিষ্ট কিছু জায়গায়, যেখানে কিছু উন্নতি হয়েছিল, বিস্তৃত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের পেশার ওপর বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। শিক্ষক প্রশিক্ষণের উৎকর্ষতা মাপার একটি নির্দেশক হলো শিক্ষকদের প্রয়োজনানুযায়ী এর প্রাসঙ্গিকতা। কিন্তু এই ধরণের বেশির ভাগ প্রশিক্ষণই প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী সংগঠিত হয় না। গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গী এখনও ভাষণ নির্ভর

যেখানে শিক্ষার্থীদের কার্যকারী ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ খুবই কম। কর্মভিত্তিক শিক্ষা, বড় ক্লাস পরিচালনার শিক্ষা, বহুমাত্রিক শিক্ষা, দলবদ্ধভাবে শিক্ষা এবং একে অপরকে সাহায্য করে অনেক মিলে শিক্ষা, এগুলি হাতে কলমে প্রদর্শনের সাহায্যে শেখানো প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে বিপরীতটাই হয়, কেবল ভাষণের মাধ্যমেই শেখানোর চেষ্টা করা হয়। প্রশিক্ষণের পরে স্কুলে তার পরবর্তী কাজগুলি করার ব্যাপারটা শুরুই হল না এবং ক্লাস্টার স্তরে মিটিংগুলিও শিক্ষকদের একসঙ্গে বসে কাজ এবং আলোচনা করার উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের জন্য একটি পেশাদারি সংগঠন গড়ে তুলতে ব্যর্থ। যে কোনো পাঠ্যক্রম সংস্কার কর্মসূচীর জন্য প্রয়োজন চাকুরিকালীন শিক্ষণ এবং স্কুলভিত্তিক শিক্ষক সমর্থনের একটি সুচিন্তিত এবং পদ্ধতি-মোতাবেক পরিকল্পনা। চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ কিন্তু একটি বিচ্ছিন্ন অংশ নয়। এর মধ্যে থাকবে জ্ঞান, মানসিকতার উন্নতি ও পরিবর্তন, মেধা, স্থানান্তর এবং স্কুল। আয়োজিত কর্মশালায় হবে সরাসরি যোগাযোগের অভ্যাস। শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন নয় পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষকদের ছাত্র হিসাবে অন্তর্ভুক্ত এবং দলে ভাগ হয়ে নিজেদের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা; এগুলিকে সামগ্রিক পরিকল্পনার অর্ন্তগত করা উচিত। নিজেদের কাজকর্মের পর্যালোচনা করাকে এই জাতীয় পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। একটি প্রশিক্ষণ নীতি ঠিক করতে হবে যেখানে প্রশিক্ষণের মেয়াদ, বিষয় এবং পদ্ধতি-জাতীয় সূচক থাকবে। কিন্তু সেখানে ''রুটিনমাফিক' মুখোমুখি আদানপ্রদানের পরিবর্তে, প্রকল্পের মান মজবুত করার জন্য, প্রশিক্ষণ এবং বদলির পদ্ধতি এবং স্পষ্ট উদ্দেশ্যসহ আরও বেশি বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনা প্রয়োজন। বিজ্ঞানসম্মত নতুন ধরনের পদ্ধতিকে বিশালাকারে প্রশিক্ষণ কিছু ক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে তবে অনেক বেশি সততা ও সৃষ্টিশীল হওয়া প্রয়োজন যদি ভাবতে হয় কর্মরত শিক্ষকদের উদ্বেগের কথা, পেশাদারিত্ব থেকে বিচ্যুত সেই পরিবেশের কথা যেখানে তাদের কাজ করতে হয় এবং তাদের মানসিক বিচ্ছিন্নতার কথা।

বিক্ষিপ্ত পদ্ধতিতেও পাঠ্যক্রম সংস্কারের ভালো বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলা যায় যদি সেই পদ্ধতিতে বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা এবং বিতর্কের আয়োজন করা হয় যাতে অংশগ্রহণ করবেন শিক্ষকরা, প্রশিক্ষণের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। শিক্ষকদের জন্য নিজের হাতে কর্মসূচী তৈরি করার টাটকা অভিজ্ঞতা হওয়া দরকার যাতে নতুন প্রযুক্তি সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ বাড়ে। এটা একটা কারণ যার জন্য স্কুল এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের জন্য নতুন যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষমতাকে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা যায়নি।

চাকুরির আগের শিক্ষা এবং চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে শিক্ষকদের মধ্যে সেই সামর্থ্য গড়ে তুলতে হবে যার দ্বারা শিক্ষকরা পাঠ্যসূচীর খাতা বা কাঠামো-কে গ্রহণ করতে পারবেন। বুঝতে পারবেন এবং এর চ্যালেঞ্জের সফলভাবে মোকাবিলা করতে পারবেন। DIET গুলি, যাদের দায়িত্ব এই ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, এমনভাবে ব্যবস্থা করুক যাতে শিক্ষকরা এবং তাদের স্কুলগুলি প্রশিক্ষণ থেকে উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষাদপ্তর থেকে অ্যাড হক পদ্ধতিতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানোর পরিবর্তে যদি কয়েকটি স্কুলকে নির্দিষ্ট করে তার প্রত্যেকটির থেকে কয়েকজন করে (অন্ততপক্ষে দু-জন করে যাতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা যায়) শিক্ষককে ডেকে নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তবে সেটাই অনেক ভালো হবে। DIET গুলি B.R.C র সঙ্গে সমন্বয় করে স্কুলগুলিকে নির্দিষ্ট করতে পারে। এটা এমনভাবে করতে হবে যাতে স্কুলে পড়ানোর সময় ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং শিক্ষকরা থিয়োরি এবং প্র্যাকটিসের মধ্যে যোগসূত্র পান। প্রশিক্ষণের বাধ্যতামূলক দিনগুলিকে সারা বছরের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং প্র্যাকটিকাল ক্লাসগুলি যেন নিজেদের ক্লাসরুমেই করতে পারেন।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভাষণ শোনা ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করা, ক্লাস্টার-এর স্কুলে কর্মশালা করা, ক্লাসরুমে প্রজেক্ট এবং অন্যান্য কাজ ছাড়াও প্রশিক্ষণের ভিতর আরও অনেক কাজ থাকতে পারে। একজন শিক্ষকের চাকুরিপূর্ব এবং চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণকে একসূত্রে আনার জন্য একই স্কুলে চাকুরিপূর্ব শিক্ষানবিশির জায়গা হতে পারে এবং শিক্ষার্থী শিক্ষকদের বলা যেতে পারে তাদের প্রশিক্ষণের অন্তর্গত ক্লাসরুমের কাজগুলি নিজেদের ক্লাসরুমে করতে।

এর ফলে শুধু যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে শক্তিশালী করার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষকরা তথ্যাদি পাবেন তাই নয় শিক্ষার্থীরাও তাদের প্রশিক্ষণপর্বের পরবর্তী অংশে গিয়ে নিজেদের কাজের সমালোচনার একটি ভিত্তি পাবেন। পদ্ধতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনার অধ্যায় থাকবে যাতে তারা শিক্ষার্থী শিক্ষকদের প্রয়োজনমতো ক্লাসের ব্যবস্থাপনায় কিছু অদলবদল করতে পারেন। নজরদারি এবং ফলাফল জানার ব্যবস্থার মধ্যে SCERT, DIET, BRC এবং CRC কে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে যাতে গবেষণা, প্রকল্পের নথিকরণ ইত্যাদির কাজে সাহায্য পাওয়া যায়।

বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা থেকে সমস্যা সমাধানকারী এবং দক্ষতাভিত্তিক পরীক্ষা, বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা বিবিধ বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মন্দ প্রভাব বিস্তার করে এবং শিক্ষাকে নষ্ট করে দেয়, দুটিই পরীক্ষার সময় দৃষ্ট টানাপোড়েনের কারণ। ব্যাখ্যা, মূল্যায়ন এবং প্রয়োগের ওপর বিশেষ জোর কমাতে বুনিয়াদী সারণি এবং সূত্র দেওয়া যেতে পারে। আরো নমনীয় সময়ে সংক্ষিপ্ততর সময় সীমার মধ্যে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার অভিমুখে বদল যেখানে ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ সংক্ষিপ্ত উত্তরদানের প্রশ্ন এবং অবশিষ্টাংশ হবে সুপরিকল্পিত বিবিধ পছন্দের প্রশ্নাবলী। সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৯০ শতাংশ পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্রটি শেষ করতে এবং পুনরায় দেখে নিতে অবশ্যই সক্ষম হবে।

* ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের বিদ্যালয়ে বা নিকটস্থ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা পরিচালনা করা ভালো। অন্য বিদ্যালয় থেকে পরিদর্শক নিয়োগের মাধ্যমে দুষ্কর্ম বন্ধ করা যায়।

* যেকোনো অবস্থাতেই পরীক্ষা স্থগিত রাখা পরিহার করা উচিত।

* ছাত্র-ছাত্রীরা যতগুলি বিষয়ে নিজেদের প্রস্তুত করতে পেরেছে, সেগুলি পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি তাদের দিতে হবে এবং তিনবছর সময়সীমার মধ্যে তাকে বোর্ডের শংসাপত্রের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা শেষ করতে হবে। বোর্ডগুলি 'চাহিদা ভিত্তিক' পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাও করতে পারে, যাতে ছাত্র/ছাত্রীরা যখন / যেভাবে প্রস্তুত হবে সেইমতো পরীক্ষা দিতে পারবে।

* 'পাশ-ফেল' শব্দটি বাদ দিতে হবে; পুনরায় পরীক্ষা বা পুনরায় অবতীর্ণ হওয়া বা পুনরায় সুপারিশ নেওয়া জাতীয় শব্দের মাধ্যমে পর্যাপ্ত দক্ষতার অভাব চিহ্নিত করতে হবে।

* ফল ঘোষণার অব্যবহিত পরেই বোর্ড পুনরায় পরীক্ষা নেবে যাতে যেসব ছাত্র/ছাত্রীদের একটি বা দুটি বিষয়ে পুনরায় পরীক্ষা দানের প্রয়োজন হবে তাদের পরবর্তী পর্যায়ে যাবার জন্য একটা বছর যেন নষ্ট না হয়।

* গণিত এবং ইংরাজির মতো বিষয়গুলিতে দুই স্তরে পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে; আদর্শ এবং উচ্চতর স্তর। সুদূর ভবিষ্যতে সমস্ত বিষয়েই দুস্তরীয় পরীক্ষা নেওয়া যায়—ছাত্র/ছাত্রীদের আদর্শ স্তরের ছটির মধ্যে অন্তত দুটি/ তিনটি এবং উচ্চতর স্তর থেকে অবশিষ্ট তিন/চারটি ছাত্র/ছাত্রীদের করতে হবে।

* শিশুদের মধ্যে চাপ কমাবার একটা কার্যকর উপায় হল একটি 'নমনীয় সময়সীমা'-র মধ্যে পরীক্ষা।

* চাপ সংক্রান্ত সমস্যা মেটাতে এবং ছাত্র/ছাত্রীদের ওপর চাপ কমানোর জন্য শিক্ষক, মাতাপিতা ও ছাত্রছাত্রীদের পথনির্দেশ করতে বিদ্যালয়ে নির্দেশিকা এবং পরামর্শ সহজলভ্য করতে হবে। বোর্ডগুলির সহায়ক কর্মীরাও ছাত্র/ছাত্রী এবং মাতাপিতাদের সাহায্য করতে পারে।

## ৫.৩ পরীক্ষা (পদ্ধতির) সংস্কার

"লার্নিং উইদাউট বার্ডেন" রিপোর্টটিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ক্লাস টেন এবং টুয়েলভ-এর শেষে যে পরীক্ষা হয়, তার পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। কেননা এইসব পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক এবং "ক্যুইজ" ধরনের যেসব প্রশ্ন করা হয় তা থেকে ছাত্রদের ওপর অতিরিক্ত পরিমাণ দুশ্চিন্তা এবং চাপ সৃষ্টি হয়। যেখানে শহরের মধ্যমানের ছাত্ররা অত্যন্ত ভালো রেজাল্ট করার প্রয়োজনে মানসিক চাপের মধ্যে থাকে সেখানে গ্রামের ছাত্ররা নিশ্চিত হতে পারে না যে তাদের প্রস্তুতি দিয়ে তারা আদৌ পাশ করতে পারবে কিনা। বেশি পরিমাণে ফেল করা, বিশেষত গ্রামীণ, অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল, সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের ক্ষেত্রে, মূল্যায়ন এবং পরীক্ষা এই পুরো পদ্ধতিটার কঠিনভাবে পুনর্বিচার প্রয়োজন। কারণ এই পদ্ধতি যদি ঠিকভাবে কাজ করত তাহলে ছাত্রদের শিখতে না পারার বা উন্নতি করতে না পারার কোনো কারণ নেই।

### ৫.৩.১ প্রশ্নপত্র তৈরি, পরীক্ষা এবং ফল প্রকাশ

বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হলে প্রশ্নপত্র তৈরির পুরো ব্যাপারটাকে নতুন করে ভাবতে হবে। প্রশ্নপত্র তৈরির বদলে প্রশ্ন তৈরির ওপর মনোযোগ দিতে হবে। এই প্রশ্ন যে শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞরা তৈরি করবেন তা নয়। বিস্তৃত প্রচার চালিয়ে, শিক্ষক সেই বিশেষ বিষয়ের কলেজের প্রফেসর, অন্যান্য রাজ্যের শিক্ষাবিদ এমনকি ছাত্রদের কাছ থেকেও চেয়ে সারা বছর ধরে প্রচুর ভালো প্রশ্ন জমা করা হবে। এই প্রশ্নগুলিকে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বিচার করিয়ে নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করতে হবে। ভাগ করার সময় দেখতে হবে প্রশ্ন কতখানি কঠিন, বিষয়ের কোন জায়গা থেকে করা, বিষয় সম্বন্ধে ধারণার মূল্যায়ন কতটা করা যাবে, সমাধান করতে কত সময় লাগবে ইত্যাদি। এই পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি এর ব্যবহার এবং পরীক্ষার নথি (record) রাখতে হবে যা তৈরি করতে হবে প্রশ্নপত্র তৈরি করার সময়েই। যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ না করে পরীক্ষকদের যদি খাতা দেখতে বাধ্য করা হয় তাহলে সেই কাজের মান এবং ধারাবাহিকতা ভালো করার জন্য তাঁদের উজ্জীবিত করা খুবই শক্ত। যেহেতু বোর্ডগুলির আর্থিক অবস্থা ভালোই অতএব আশা করা যায় এই কাজে অর্থ কোনো প্রতিবন্ধক হবে না। কম্পিউটারাইজেশন হয়ে যাওয়ার ফলে পরীক্ষক এবং পরীক্ষার্থী উভয়ের পরিচয় গোপন রাখা কোনো সমস্যা নয়। উত্তরপত্রগুলিও যদৃচ্ছ এলোমেলোভাবে কোনো পরীক্ষকের কাছে পাঠানো সম্ভব যাতে অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ থাকে না। পরীক্ষার্থীরা বাইরে থেকে সাহায্য নিয়ে যাতে ঠকতে না পারে তার জন্য এমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে যে পরীক্ষার প্রথম ৯০মিনিট কেউ বাইরে যেতে পারবে না এবং তারপরেও পরীক্ষা চলাকালীন কেউ প্রশ্নপত্র নিয়ে বাইরে যেতে পারবে না। প্রশ্নপত্র দিয়ে দেওয়া হবে পরীক্ষা শেষ হলে।

কম্পিউটারাইজেশন হওয়ার ফলে পরীক্ষার্থীদের মাননির্ণয়ের নানাধরণের অনেক মাপকাঠি হয়েছে। শুধুমাত্র নম্বর বা গ্রেড, সেই বিষয়ের সমস্ত পরীক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্ন দলে ভাগ করে র‍্যাঙ্ক বা একই গ্রাম বা শহরের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন দলে ভাগ করে র‍্যাঙ্ক দেওয়া। পরীক্ষকদের মান বা ধারাবাহিকতাও বিশ্লেষণ করে দেখা সম্ভব হবে।

আমরা মনে করি শেষ মাপকাঠিটি হবে মেধার কঠোর পরীক্ষা। এটা করলে তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত লোকেরা উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে মেধার ধারণা সম্পর্কে আরও উচ্চ এবং প্রাসঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

এই ধরণের বিশ্লেষণ হলে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে যেখানে ছাত্ররা কিছু ফী জমা দিয়ে অনুরোধ করলেই তাদের

উত্তরপত্রের স্ক্যান করা বা জেরক্স কপি দেখতে পাবে, উত্তরপত্র আবার পরীক্ষা করে দেখার অনুরোধ ভীষণ কমে গেছে।

মোটামুটি বলা যায় যে স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের দিকে আমাদের আরও বেশি করে সরে যাওয়া প্রয়োজন। এমন উপায় বার করতে হবে যার সাহায্যে এই ধরণের মূল্যায়ন আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়। প্রতিটি বিদ্যালয় প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয়, নিরাময় এবং শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিরবচ্ছিন্ন এবং বোধগম্য মূল্যায়নের একটি নমনীয় ও প্রয়োগযোগ্য পরিকল্পনা অবশ্যই উদ্ভাবন করবে। এই পরিকল্পনা বিদ্যালয়ে লভ্য সুযোগ সুবিধা এবং সামাজিক পরিবেশকে অবশ্য গুরুত্ব দেবে। অনুভূতিশীল শিক্ষকরা সাধারণত ছাত্রদের শক্তি এবং দুর্বলতা বুঝে ফেলেন, এই ধরনের অন্তর্দৃষ্টি কাজে লাগানোর উপায় থাকতে হবে। একই সঙ্গে স্কুলগুলির ক্ষমতার অপব্যবহার (বা এখন হয় প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার সময়) আটকানোর জন্য তাদেরও গ্রেড দেওয়া যেতে পারে আপেক্ষিক মাপকাঠির ওপর। এক্স্টারনাল পরীক্ষায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। উন্নতি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবস্থাপনার ওপর আরও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

### ৫.৩.২. মূল্যায়ণের নমনীয়তা

একগুচ্ছ মনস্তাত্ত্বিক তথ্যাবলী থেকে বর্তমানে প্রস্তাবিত হয় যে বিভিন্ন শিক্ষার্থীরা বিভিন্নভাবে শেখে (এবং পরীক্ষা দেয়।) অতএব, পরীক্ষাগৃহের কাগজ-পেন্সিলের পরীক্ষা ছাড়াও মূল্যায়নের আরও বিবিধ পদ্ধতি থাকা উচিত। মৌখিক পরীক্ষা আর দলগত কর্মের মূল্যায়নকে উৎসাহিত করা উচিত। সমস্ত দেশ জুড়ে ছোট ছোট প্রারম্ভিক পরিকল্পনা হিসাবে বই-খুলে পরীক্ষা এবং সময়সীমাহীন পরীক্ষার প্রবর্তনা মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে। এই সময় উদ্ভাবনে পরীক্ষার কেন্দ্র নিছক স্মৃতিশক্তি পরখ করা থেকে উচ্চতর স্তরের দক্ষতা যেমন, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং সমস্যা সমাধানকারী দক্ষতার অভিমুখে স্থানান্তরণের একটা অতিরিক্ত সুবিধা থাকতে পারে। এমনকি আরো ভালো প্রশ্নপত্র নির্মাণ এবং পরীক্ষার্থীদের আদর্শ এবং কাঙ্খিত তথ্যের (যেমন মৌল পর্যায়ক্রম সারণি, ত্রিকোণমিতির অভেদ, মানচিত্র এবং ঐতিহাসিক তারিখ, সূত্রাবলী ইত্যাদি) সরবরাহ করে প্রচলিত পরীক্ষাকেও এই একই অভিমুখে সামান্য এগিয়ে দেওয়া যায়।

শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বিভিন্নতার এবং শিক্ষাদানের ব্যাপক পরিবর্তনশীল গুণাবলীর কারণে, প্রতিটি বিষয়ে পরবর্তী স্তরের শিক্ষায় পৌঁছোনেরা জন্য, সমস্ত পরীক্ষার্থীর দক্ষতার সমান স্তর প্রদর্শন করা উচিত এমন প্রত্যাশা অযৌক্তিক। ভারতের শহর ও গ্রামের মধ্যে যে ফারাক তার বিচারে এই প্রত্যাশা সামাজিকভাবে পশ্চাদমুখিনতাও বটে। যেমন, গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে সবচেয়ে বেশি অকৃতকার্যতা এবং পড়া ছেড়ে যাবার কারণ হিসাবে দুটি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায়—অঙ্ক এবং ইংরাজি। ছাত্র/ছাত্রীদের এই বিষয়গুলিকে দুটি স্তরে একটি -একটি করে পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেবার সম্ভাবনার বিষয়টি বোর্ডগুলি ভেবে দেখতে পারে। এর জন্যে বিভিন্ন স্তরে পাঠ্যক্রম বা পাঠ্যবিষয় ভিন্ন হবার প্রয়োজন নেই।

'একটা পরীক্ষা সবার ক্ষেত্রে উপযুক্ত' নীতি, সাংগঠনিকভাবে যতই সুবিধাজনক হলেও ছাত্র/ছাত্রী কেন্দ্রিক নয়। ভারতীয় চাকরির বাজার তার ক্রমবর্ধমান ভিন্নতা সহ যেভাবে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার সঙ্গে এই ব্যবস্থা মোটেই তাল রাখতে পারছে না। মূল্যায়নের এই শিল্প সন্নিবিষ্ট আদর্শের পরিবর্তে আরো মানবিক এবং ভিন্ন জাতীয় আদর্শ প্রয়োজন। অর্থনীতিবিদদের ভবিষ্যদবাণী অনুযায়ী, যদি পরবর্তী দশকে প্রতি চারটি নতুন চাকরির সবকটিই পরিষেবা ক্ষেত্রের হয়, তবে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পট পরিবর্তন প্রয়োজন। যেহেতু অনেক কম

সংখ্যক ভারতীয় আদর্শ কৌশল তৈরি করে এবং তারা সহ-নাগরিকদের সমস্যা সমাধানের জন্য আরো আরো বেশি কাজ করে, সেকারণে ভারতীয় পরীক্ষা ব্যবস্থা আরো খোলামেলা, নমনীয়, সৃজনশীল এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া উচিত।

### ৫.৩.৩ অন্যান্য স্তরে বোর্ডের পরীক্ষা

বিদ্যালয়ের পঞ্চম, অষ্টম কিংবা একাদশ শ্রেণীতে কোনো অবস্থায় বোর্ডের বা রাজ্যস্তরের কোনো পরীক্ষা নেওয়া চলবে না। বস্তুত, দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে দশম শ্রেণীর পরীক্ষা নিয়ে ছাত্র/ছাত্রীদের একই বিদ্যালয়ে থেকে যাবার অনুমতিদানের বিষয়টি বোর্ডগুলির বিবেচনা করা উচিত।

### ৫.৩.৪ প্রবেশিকা পরীক্ষাসমূহ

প্রতিযোগীতামূলক প্রবেশিকা পরীক্ষার সঙ্গে বিদ্যালয়ের শেষ-বোর্ড পরীক্ষার যোগসূত্র ছিন্ন করা প্রয়োজন। ছাত্র/ছাত্রীদের যত কম প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হবে, ততই বিষয়টি তাদের পক্ষে কম পীড়াদায়ক হবে। বছরে বেশ কয়েকবার সারা দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া, এ বিষয়ে নজর দেওয়া এবং যথাসময়ে পরীক্ষা পরিচালনা ও ছাত্র/ছাত্রীদের জ্ঞানার্জনের সূচক তথা ফলঘোষণা নিশ্চিত করা— এদের মধ্যে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সংস্থা সংযোগ স্থাপন করতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৃত্তিমূলক পাঠক্রমে ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তির সময় সমস্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ এহেন জাতীয় পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর কাজে লাগাতে পারবে। অবশ্য এদের বাস্তব নকশা এবং টেস্ট পরীক্ষা এই কেন্দ্রীয় সংস্থার এক্তিয়ারভুক্ত হবে না।

## ৫.৪. কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষা

কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষায় দেখা যায় যে, শিশুদের জন্মস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জীবনযাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত জ্ঞানের ভিত্তি, সামাজিক অন্তর্দৃষ্টি এবং দক্ষতা, বিদ্যালয় জীবনে তাদের মর্যাদা ও শক্তির উৎস হয়ে উঠতে পারে। বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমের অভিজ্ঞতা সংগঠিত করার একটি অর্থপূর্ণ এবং বিষয়ভিত্তিক সূচনাবিন্দু হিসাবে একে স্বীকৃতি দিতে হবে। এর অর্থ হল, সামাজিক সংযোগসহ বিদ্যালয়ে কাজের আরো নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে পরীক্ষমূলক ভিত্তিকে আরো বিকশিত করা যায়। প্রাথমিকভাবে সংবিধান থেকে উদ্ভূত এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত মূল্যবোধের বিকাশ এবং বিশ্বায়নের আওতাধীন অর্থনীতির জটিল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিবিধ দক্ষতা গঠন এবং বিষয়মুখী জ্ঞানের অভিমুখে শিশুর প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ প্রচারে যাকে উৎসাহিত করবে এই শিক্ষাপদ্ধতি এমনই প্রত্যাশিত। উৎপাদনশীলতা এবং কাজের অন্যান্য রূপের সঙ্গে সার্বিক জ্ঞানকে যুক্ত করে জটিল শিক্ষাদান-পদ্ধতির প্রয়োগের আহ্বান যে পদ্ধতিতে জানানো হয়, এ হল সেই শিক্ষাদান পদ্ধতি।

বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে শিক্ষাদানের একটি মাধ্যম হিসাবে উৎপাদনশীল কাজের প্রর্বতন শিক্ষাব্যবস্থার বিবিধ মাত্রা—দার্শনিক, পাঠক্রমিক, গঠনগত এবং সাংগঠনিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনক্ষম প্রয়োগের সাক্ষর রাখবে। কতকগুলি নির্দিষ্ট দিক যেমন, শিক্ষাগত স্বশাসন এবং দায়ভাগ; পাঠক্রমের পরিকল্পনা, করের উৎস, শিক্ষক/ শিক্ষিকা নিয়োগ এবং তাদের শিক্ষা; শৃঙ্খলার মতবাদ, উপস্থিতি এবং বিদ্যালয় পরিদর্শন; বিষয়গুলি সীমা অতিক্রমকারী জ্ঞান, বিদ্যালয়ের দিনপঞ্জি, শ্রেণী এবং পড়ার ঘণ্টা সংগঠিত করা; বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষার স্থান সৃষ্টি করে;

মূল্যায়নের পদ্ধতি এবং এই সংক্রান্ত সূচক এবং গণপরীক্ষা—এজাতীয় নির্দিষ্ট বিষয়ের পুনর্নির্মাণ এবং পুনরায় তাত্ত্বিক সূত্র প্রণয়নের জন্য কর্ম-কেন্দ্রিক আহ্বান জানাবে। এই সমস্ত আলোচনায় বোঝা যায় যে, পাঠক্রমের সংস্কার এবং গুণ সংক্রান্ত উন্নতির সঙ্গে সহজাত সম্বন্ধে পদ্ধতিগত সংস্কার যুক্ত।

### ৫.৪.১ বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

বর্তমানে বৃত্তিমূলক শিক্ষা কেবলমাত্র + ২ পর্বে দেওয়া যায় এবং সেখানেও পাঠভিত্তিক ধারার সমান্তরালে একটি নির্দিষ্ট ধারায় এটি সীমাবদ্ধ। ২০০০ সালের মধ্যে বৃত্তি-শিক্ষায় + ২ পর্বের মোট ভর্তির ২৫ শতাংশকে যুক্ত করার NPE-র লক্ষ্যে প্রতিতুলনায় বর্তমানে ৫ শতাংশেরও কম ছাত্র/ছাত্রী এই সুযোগ কাজে লাগায়। ২৫ বছরেরও বেশি ধরে, তাত্ত্বিক, পরিচালন এবং উৎসের প্রতিবন্ধকতার মধ্যে এই কর্মসূচী দুর্বল হয়ে পড়েছে। একটি নিম্নমানের ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করা ছাড়াও খারাপ পরিকাঠামো, বাতিল যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণহীন বা নিম্নলিখিত শিক্ষক/ শিক্ষিকা (প্রায়শই আধা-সময়ের জন্য নিযুক্ত), পুরোনো বাতিল হয়ে যাওয়া অনমনীয় পাঠ্যসূচী, উল্লম্ব বা তির্যক যে কোনো গতিময়তার অভাব, 'কাজের জগত' থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত, কার্যকরী মূল্যায়ন, কৃতিত্বের স্বীকৃতি এবং শিক্ষানবিশী ব্যবস্থার অভাব, পরিশেষে, নিম্নমানের চাকুরির সুযোগ—এই সমস্ত কারণে এটি রুগ্ন (মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিশিক্ষার কেন্দ্রীয় অনুদানপ্রাপ্ত পরিকল্পের সংশোধনের জন্য কর্মরত দলের প্রতিবেদন, NCERT, ১৯৯৮)। স্পষ্টত, বৃত্তিশিক্ষার একটি কার্যকর ও গতিশীল কর্মসূচী নির্মাণের বিশালাকার ও জরুরী কর্তব্যকর্ম দীর্ঘ সময় যাবৎ বাকি পড়ে আছে। প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে + ২ স্তর পর্যন্ত বিদ্যালয় পাঠক্রমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক করে তোলায় বিশ্বায়নের আওতাভুক্ত একটি অর্থনীতির চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলায় বৃত্তিশিক্ষার পুনর্তাত্ত্বিক এবং পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি স্থাপিত হবে এমনই প্রত্যাশা।

অতএব প্রস্তাবিত হল যে, বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের (VET) একটি নয়া কর্মসূচী যেখানে বিভিন্ন গ্রামসংগঠন এবং ব্লক স্তর থেকে উপ-বিভাগীয়/ জেলা শহর এবং মহানগরীর এলাকায় প্রতিষ্ঠিত পৃথক পৃথক বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রগুলিকে যুক্ত করে একটি লক্ষ্য নির্ধারিত ভঙ্গিতে তত্ত্ব অনুধাবন এবং প্রয়োগের পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেই কর্মসূচীর অভিমুখে আমরা স্তর বিভাজিত উপায়ে অগ্রসর হব। যেখানে সম্ভব সেখানেই, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো কাজে লাগিয়ে জাতীয় স্বার্থে VET-এর জন্য নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে বিদ্যমান সুযোগসুবিধার দেশব্যাপী দৃশ্যচিত্রের সঙ্গে একযোগে এহেন VET কেন্দ্র। প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলা প্রয়োজন। এর ফলে আই টি আই, পলিটেকনিক, কারিগরি বিদ্যালয়, কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র, গ্রামীণ বিকাশ সংস্থা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (এবং তাদের আনুষঙ্গিক পরিষেবা), ইঞ্জিনিয়ারিং কৃষি এবং মেডিকেল কলেজ, S&T গবেষণাগার, সমবায় এবং সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রের বিশিষ্ট শিল্প প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সুযোগের প্রসার ঘটবে। এই উদ্যোগের ফলে স্বভাবতই বর্তমান ৬০০০-বেমানান উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সম্পদের সঙ্গে বৃত্তিমূলক ধারাকে যুক্ত করে নতুন VET কর্মসূচীতে তাদের জোড় মেলাবার জন্য সম্পদ স্থানান্তরণ এবং মানানসই করে তোলার ডাক দেওয়া হবে। বর্তমানে এই সমস্ত বিদ্যালয়ে বৃত্তিশিক্ষার যেসব শিক্ষক/ শিক্ষিকা আছেন তাদের সামনে দুটো উপায় খোলা থাকবে— হয় তাঁদের ঐ একই বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা কর্মসূচীতে নেওয়া হবে অথবা তাঁরা সেই অঞ্চলের নতুন VET কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন।

যে সমস্ত শিশুরা অতিরিক্ত দক্ষতা অর্জন করতে চায়/অথবা বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে অথবা অর্ধসমাপ্ত রেখেই বৃত্তিশিক্ষার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে চায়, তাদের সকলের জন্যই VET-এর পরিকল্পনা প্রচলিত বৃত্তি-শিক্ষা ধারার একেবারে বিপরীত ভাবনায়, VET একটি চরম বা 'শেষ আশ্রয়' জাতীয় সুযোগের পরিবর্তে 'পছন্দসই'

এবং পদমর্যাদা সম্পন্ন' বাছাই-এর সুযোগ দেবে। বিদ্যালয়গুলির মতো এই সমস্ত VET প্রতিষ্ঠানগুলির এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যাতে ঐতিহাসিকভাবে যারা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পশ্চাদ পসারতার কারণে কষ্ট পাচ্ছে শুধুমাত্র তারাই নয়, এমনকি শারীরিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদেরও দক্ষতা বিকাশের সুযোগ দেওয়া যাবে। জীবনে উন্নতি করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মনস্তত্ত্বের সুবিন্যস্ত সুবিধা এবং পরামর্শদানকে বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করে, ভবিষ্যৎ বৃত্তি বা জীবিকার অভিমুখে অগ্রসর হবার সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা করতে শিশুদের সক্ষম করে তোলা হবে এবং পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলির নেতৃত্বকে পরামর্শ দেওয়া হবে। বিষয়ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিচার করে বিবিধ সময়সীমার (স্বল্প সময়সীমা সহ) নমনীয় এবং নিয়ন্ত্রিত শংসাপত্র বা ডিপ্লোমা পাঠ্যসূচী প্রস্তাবিত VET-তে চালু করা হবে। প্রতিটি VET কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠান বা তাদের গুচ্ছের নিজস্ব স্তরে, এইসব পাঠ্যসূচী বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনায় একটি প্রদত্ত এলাকার মধ্যে উৎপাদন ও পরিষেবার ধরন ও কারিগরিতে দ্রুত সংঘটিত পরিবর্তন, আর এর সঙ্গে বিপুল সংখ্যক জনসমষ্টির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীবিকার নাগাল-পাওয়ার ক্ষমতায় দ্রুত হ্রাসমানতার বিষয়গুলি বিচার করতে হবে। এই পাঠ্যসূচীতে বিবিধ স্থানে যোগদান ও নিষ্ক্রমণের সুযোগ এবং সহজাত মূল্যায়ণের সুবিধা থাকবে। একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী যেসমস্ত প্রয়োজন অনুভব করবে তার ভিত্তিতে যতবেশি বিবিধ সুযোগ দানের ক্ষমতা এই VET কেন্দ্রের থাকবে তারই ওপর এর শক্তি নির্ভর করবে।

VET পাঠক্রমকে সময়ে সময়ে পুনর্বিচার এবং সমসাময়িক করতে হবে যাতে কর্মসূচীকে নির্দ্দিষ্ট এলাকা বা অঞ্চলের জীবিকা ও বৃত্তির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং কৃষ্ণপ্রায় হয়ে না পড়ে। কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত প্রধান অথবা প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও সম্পদের নাগাল পাওয়া প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে প্রতিবেশী এলাকায় কাজের জায়গা (অথবা কর্মস্থান বা কর্মস্থল) কিংবা স্থানীয় গ্রামীণ হস্ত শিল্প, কৃষিজ বা অরণ্যভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং শিল্প ও পরিষেবা প্রতিষ্ঠা করে নাগালের মধ্যে পাওয়া মানবিক এবং ভৌত উপাদানকে শেষমাত্রা পর্যন্ত ব্যবহারের প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব এবং শিক্ষাগত স্বাধীনতা তাদের ওপর ন্যস্ত করতে হবে। এই একত্রে কাজ করার ব্যবস্থাপনার তিনটি সুবিধা আছে। প্রথমত, VET কর্মসূচী একেবারে ন্যূনতম অর্থ বিনিয়োগে স্থাপন করা যায়। দ্বিতীয়ত, যে অঞ্চলে সহজলভ্য কৃৎকৌশল এবং সর্বাধুনিক কারিগরি ছাত্র/ছাত্রীরা কর্মে নিযুক্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা পাবে এবং নকশা, উৎপাদন এবং বিপণনের ক্ষেত্রে তাদের বাস্তব জীবনের সমস্যার মুখোমুখী হতে হবে। এই উদ্দেশ্যে কৃষি, বনসৃজন সরকারী ও বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রসমূহ (বয়ন ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ) যারা উৎপাদন ও পরিষেবার কাজে যুক্ত তাদের সঙ্গে একত্রে সে স্থানে প্রয়োজনীয় 'কাজের জায়গা' (বা কর্মস্থান বা কর্মস্থল) এবং তৎসহ প্রশিক্ষণ ও দেখাশুনার সহায়তা করে ছাত্র/ছাত্রীদের সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা দান বাধ্যতামূলক।

মূলায়ন, সমতুল্যতা, কৃতিত্বের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ('কাজের জায়গা' এবং ব্যক্তিগত দক্ষতা পর্যন্ত প্রসারিত করে) এবং শিক্ষানবিশীর একটি বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থা নির্মাণ করার ওপরেই VET কর্মসূচীর সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষত উত্তর-পূর্ব, পাহাড়ি এলাকা, সমুদ্রতটবর্তী অঞ্চল এবং মধ্যভারতের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার মত আর্থিক ভাবে অনগ্রসর এলাকায় সে সব বৈশিষ্ট্যপূণ্য বিবিধ জ্ঞান ও দক্ষতা আছে, কোনো মান যেন তাদের বাতিল/অনুপযুক্ত ঘোষণার নেতিবাচক হাতিয়ার হয়ে না ওঠে সে বিষয়ে যত্নবান হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। VET কেন্দ্র এবং প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, পশুপালন, মৎস্য এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিশারদ, হস্তশিল্পী মিস্ত্রি, কারিগর, শিল্পী এবং অন্যান্য স্থানীয় পরিষেবা দাতা (IT সহ)-দের মূল্যবান ব্যক্তিত্ব বা অতিথি শিক্ষক /শিক্ষিকা হিসাবে যুক্ত করার জন্য একটি যথাযথ কাঠামোগত পরিসর এবং উষ্ণ আমন্ত্রণী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

২০১০ সাল পর্যন্ত VET পাঠক্রমের যোগ্যতা পঞ্চম শ্রেণীর শংসাপত্র অবধি শিথিল করা যেতে পারে, কেননা ঐ

বছরের সর্ব শিক্ষা অভিযান UEE অর্জন করবে এমন প্রত্যাশা করা হচ্ছে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে যখন সার্বিক পাঠ্যক্রম শিক্ষার লক্ষ্যপূরণের বছরটি আসবে, তখন এই মান প্রথমে অষ্টম শ্রেণীর শংসাপত্র এবং স্বভাবতই পরে দশম শ্রেণীর শংসাপত্র অবধি উন্নীত হবে। অবশ্য কোনো অবস্থাতেই ষোল বছরের কমবয়সি কোনো শিশু VET কর্মসূচীতে ভর্তি হবার যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবে না। তবে প্রাথমিক স্তর থেকেই VET কেন্দ্রগুলি সমস্ত শিশুদের দক্ষতা এবং শখ মেটানোর কেন্দ্র হিসাবে কাজ করতে পারে ও বিদ্যালয়ের সময়সীমার আগে বা পরে তাদের জন্য এদের দরজা খোলা রাখা যেতে পারে। এমনকি বিদ্যালয়ের সময়সীমার মধ্যেও কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের জন্য বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজনে এইসব কেন্দ্রগুলি অবশ্যই সহযোগী ব্যবস্থার বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারে।

VET-এর এই দৃষ্টিভঙ্গি অভ্যাসে পরিণত করার জন্য ভূপালে NCERT-এর PSSCIVE ধরনের চালু জাতীয় সম্পদ সংগ্রাহী প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনরায় সক্রিয় এবং শক্তিশালী করা ব্যতিরেকেঅনেক নতুন নতুন সহায়ক কাঠামো এবং মূল্যবান প্রতিষ্ঠান জেলা, রাজ্য/UT এবং কেন্দ্র সহ বিবিধ স্তরে গড়ে তুলতে হবে।

## ৫.৫ চিন্তা ও তার প্রয়োগ নতুনত্ব

### ৫.৫.১ বহু পাঠ্যপুস্তক

পাঠ্যসূচী তৈরির সময় ছাত্রদের এবং তাদের ভাষা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, এই পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নকে বিকেন্দ্রিত করার সময় লেখকদের যোগ্যতা এবং পদ্ধতি যা এই ব্যাপারটাকে সম্ভব করবে তা খুবই জরুরি। পাঠ্যপুস্তক লেখার জন্য যেসব যোগ্যতা প্রয়োজন তা হল, শিক্ষাসম্পর্কিত এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান, ছাত্রদের উন্নতির স্তর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, মানসিক ভাব আদানপ্রদানের এবং পরিকল্পনার দক্ষতা ইত্যাদি। বর্তমানে SCERT-র উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের। তাদেরই এই কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে রেখে বইয়ের বিষয়বস্তু বাছাই এবং লেখার কাজটা, কোনো একজন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে করাবার পরিবর্তে, বাছাই করা কয়েকটি দলকে দিয়ে সহযোগিতার ভিত্তিতে করাতে হবে। দলবদ্ধভাবে কাজ করানোর পিছনে কয়েকটি কারণ হলো, প্রেক্ষিত তৈরি, ছাত্ররা কীভাবে শেখে সে সম্পর্কে অনুমানের ব্যাখ্যা, তথ্য ও বিষয়সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রয়োজনীয় সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ, শিশুদের সঙ্গে মানসিক আদানপ্রদানের উপায় জানা, দলগতভাবে বাস্তব সম্মত চিন্তা এবং তথ্য ফেরতের জন্য সুযোগ তৈরি যা কাজ চালিয়ে যেতে থাকবে ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাসংক্রান্ত এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সমর্থন, N.G.O. দের মূল্যবোধ অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারজীবীদের অভিজ্ঞতাও এই পদ্ধতির মূল্যবান তথ্য।

পাঠ্যপুস্তককে পিছিয়ে পড়াটা একটা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার বিষয়। প্রায়শই দেখা যাচ্ছে বইয়ের কিছু অধ্যায় ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাচ্ছে যার বিষয়বস্তু কখনও গভীর কখনও বা নগন্য। অনেক সময় এমন সব অধ্যায় বইয়ে লেখা হয় যা স্কুলে পড়ানোর জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না। এমন একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে বইয়ের প্রাথমিক অধ্যায়গুলি স্কুলে পরীক্ষামূলকভাবে পড়ানো হবে এবং বইটির লেখক পড়ানোর ফলাফলের ওপর নজর রাখবেন এবং ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের কাছ থেকেই রিপোর্ট পাবেন। শিক্ষকদের প্রস্তুতি এবং ক্লাসরুমের বাস্তবতার মধ্যে পড়ানো ও বোধগম্য হওয়ার জন্য পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন করার জন্যও উপরোক্ত পদ্ধতিটি জরুরি।

পরবর্তী বিষয়টি হচ্ছে আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে আমরা চাইছি পাঠ্যপুস্তকের প্রাচুর্য যার ফলে শিক্ষকদের পছন্দ করার সুযোগ থাকবে অনেক এবং ছাত্রদের প্রয়োজন এবং উৎসাহ অনুযায়ী বিভিন্নতার সুযোগ থাকবে। যখন প্রচুর

সংখ্যক বই এবং তাদের সহায়ক উপাদান সমূহ উপস্থিত থাকবে তখন শিক্ষকও তার ছাত্রদের কোনো নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ পড়াবার জন্য পাঠ্যপুস্তকের কোন বিষয়টি সঠিক হবে, তা নির্দিষ্ট করতে উৎসাহ পাবেন। এই ব্যবস্থা শিক্ষকের স্বাধীনতা এবং পছন্দ ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দেবে। অন্যদিকে এই ব্যবস্থা ছাত্রদের বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান করতে এবং একই বিষয় কেমন করে বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করা যায় তা বুঝতে সাহায্য করবে। গ্রন্থাগার ব্যবহার করাকেও উৎসাহিত করবে। একটি সহায়ক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। এই ব্যবস্থায় শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ বা কর্মশালার ব্যবস্থা থাকবে, যেখানে শিক্ষকরা শিখবেন এবং অভ্যস্ত হবেন পাঠ্যপুস্তক এবং সহায়ক উপাদানগুলি ব্যবহার করতে যেগুলি হচ্ছে শিক্ষাকার্যক্রমের উৎস। এখানে তারা গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। এই গ্রন্থাগার স্কুলের মধ্যে হতে পারে অথবা কয়েকটি স্কুলের জন্য তৈরি একটি কেন্দ্রেও হতে পারে সরকারী এবং প্রাইভেট স্কুলের মধ্যে ভাগ করে গ্রন্থাগার ব্যবহার করার পরিকল্পনাও করা যেতে পারে। যৌথ গ্রন্থাগার তৈরির বিষয়টিও চিন্তা করার মতো।

স্কুল থেকে বলে দেওয়া মান অনুযায়ী নানারকম পাঠ্যবই প্রণয়ন করার বিষয়টি প্রাইভেট সেক্টরকে পাঠ্যবই প্রকাশনায় উৎসাহিত করবে। এর ফলে রাজ্যের যে শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ সংস্থা আছে, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা যাদের একটি দায়িত্ব তাদের আরও উপযুক্ত করতে হবে এবং ক্ষমতা তৈরি করতে হবে যাতে তারা ব্যবসায়ী প্রকাশকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে। আগে যেমন বলা হয়েছে, SCERT যদি সেইভাবে সহযোগিতার ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক উৎপাদন করে তাহলে এই সব সংস্থার বইয়ের মান বাড়বে, যোগ্যতা বাড়বে এবং এরা উৎসাহিত হবে। N. G. O. রাও অত্যন্ত ভালো কিছু পাঠ্যপুস্তক এবং তার সহযোগী উপাদান তৈরি করেছে যা স্কুলে ব্যবহার করা যেতে পারে। জায়গায় জায়গায় কিছু নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাও সৃষ্টি করা যেতে পারে যাদের কাজ পাঠ্যপুস্তক লেখকরা কিছু নীতি ও সংবিধান নির্দেশিত কিছু মূল্যবোধ যেমন সমতা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র মেনে চলছেন কিনা দেখা। এছাড়াও তারা দেখবেন বইগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা বা বইয়ের বিষয়বস্তুর উন্নতির যথার্থতা ইত্যাদি। এসব ছাড়াও তাদের দেখতে হবে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন যেন শুধুমাত্র ব্যবসায়িক লাভের কথা ভেবে না হয় রা শিক্ষার সহজ পথকে যেন অস্বীকার না করে। পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে শিক্ষক, অভিভাবক এবং নাগরিকদের মধ্যে আলোচনাকে উৎসাহিত করতে হবে। দেখতে হবে এগুলি যেন "ডোমেনে" পাওয়া যায় (ইন্টারনেট -এর জন্য) জায়গার ব্যবস্থা করতে পারে এবং পাঠ্যপুস্তকগুলি যাতে ওয়েব-এ পাওয়া যায় তারও ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে যাতে স্কুল সম্বন্ধে গবেষণা থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

### ৫.৫.২ পরিবর্তনকে / নতুন প্রথাকে উৎসাহ দান

ব্যক্তিগতভাবে অনেক সময়েই শিক্ষকরা অনেক অসুবিধা যেমন স্থানাভাব, অনেক বেশি ছাত্র, পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা, ইত্যাদি সত্ত্বেও ছাত্রদের প্রয়োজনীয় পাঠ্য বিষয়টি তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করেন। এই প্রচেষ্টাগুলি খুবই বাস্তবসম্মত, সৃষ্টিশীল এবং উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন। কিন্তু অনেক সময়েই তা স্কুল কর্তৃপক্ষ বা বৃহত্তর শিক্ষক সমাজের কাছে অদৃশ্য থেকে যায়। এমনকি সেই শিক্ষক নিজেও এর সঠিক মূল্যায়ন করেন না। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার আদান প্রদান এবং বিভিন্ন ক্লাসে পড়ানোর ফলে শিক্ষকরা যখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন তখন স্কুলের মধ্যেই শিক্ষাগত আলোচনার সুযোগ তৈরি হয়। এই জাতীয় আলোচনা থেকে নতুন ধারণা সৃষ্ট ও উদ্ভাবনের সম্ভাবনা সৃষ্ট হয়। কীভাবে শিক্ষা এবং শিক্ষণের উদ্ভাবনী এবং সৃষ্টিশীল উপায়কে পদ্ধতির অঙ্গ হয়ে যেতে পারে। এই পদ্ধতিটি একটি বিশেষ স্থান পায় যখন সেই উপায়গুলিকে সেই সামগ্রিক পদ্ধতির মধ্যেই তৈরি করে নেওয়া হয়। শুরুতে, স্কুলের ভিতরে এবং ক্লাস্টার ও ব্লক স্তরে শিক্ষকদের জন্য সুচিন্তিত

সুযোগ তৈরি করতে হবে যাতে শিক্ষকরা তাদের ক্লাসবয়ের কাজ এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। যদি দেখা যায় এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে তাহলে পদ্ধতির অর্ন্তগত করে চালিয়ে যেতে হবে। স্কুলের এবং অন্যান্য স্কুলের শিক্ষকদেরও একত্রিত করে বিভিন্ন তথ্যাদি দিয়ে এবং একসঙ্গে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিয়ে সাহায্য করতে হবে। এই পর্যায়ের ভালো কাজগুলির লিখিত বিবরণী রাখা এবং সেগুলিকে নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। বর্তমানে এজাতীয় কাজের জন্য অর্থসাহায্য দেয় DIET যাদের কাজের একটি অংশ হচ্ছে উদ্ভাবনী কাজের নির্দিষ্টকরণ এবং লিপিবদ্ধতা। SSA স্কুলভিত্তিক গবেষণার জন্য অর্থ বরাদ্দ করে। এর কিছুটা শিক্ষকরা ক্লাসে যেসব বহুমুখী কাজ করেন তার বিবরণী রাখায় ব্যয় করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দেওয়া ছাড়াও একটি পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন যা এধরণের বেড়ে উঠতে সাহায্য করে।

ক্লাস্টার স্তরে সম্পদ কেন্দ্র (resource centre)গড়ে তোলার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্কুলগুলির বিচ্ছিন্নতা ভেঙে শিক্ষকদের নিয়মিত একত্রিত করে তাদের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার আদানপ্রদান ঘটানো। শিক্ষকরা যদি তাদের পেশাদারি অস্তিত্বের উন্নতি দান তাহলে এটি জরুরি। এর মাধ্যমে শিক্ষকদের মধ্যে আরও বেশি করে প্রতিনিধিত্ব, অঙ্গীকার এবং নিবিষ্ট হওয়ার মনোভাব গড়ে উঠবে।

### ৫.৫.৩ টেকনোলজির ব্যবহার

টেকনোলজির বিচক্ষণ ব্যবহার শিক্ষাসংক্রান্ত কাজের বিস্তৃতি আরও বাড়িয়ে দেয়, ব্যবস্থাপনা সুবিধেজনক হয়। এর সঙ্গে শিক্ষার নির্দিষ্ট প্রয়োজনগুলিকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। যেমন মাস মিডিয়া ব্যবহার করে শিক্ষক প্রশিক্ষণকে সাহায্য করা যায় এবং ক্লাসের শিক্ষায় সাহায্য পাওয়া যায়। বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষা নেবার এবং দেবার সম্ভবনা, স্ব-শিক্ষা, আলাদা আলাদা প্রণালীতে শিক্ষা এসব ব্যাপারেই টেকনোলজির ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। ইন্টারনেটের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার সম্ভব করেছে—বিশাল তথ্যভাণ্ডারের অংশ নেওয়ার নানারকম বিষয়ে বিতর্কে এবং আলোচনায় অংশ নেওয়া যা এতকাল সম্ভব ছিলোনা। ছাত্রদের শিক্ষায় কিছু বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে যেসব উপযুক্ত সরঞ্জাম দরকার হয় তা পাওয়া যায় যন্ত্রের নতুন আবিষ্কারের ফলে। যেটা সবিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল টেকনোলজিকে বিচ্ছিন্ন করে না রেখে শিক্ষার বৃহত্তর লক্ষ্য এবং পদ্ধতির সঙ্গে একাত্ম করা দরকার। তবে খেয়াল রাখতে হবে যন্ত্রের ব্যবহার যেন শিক্ষক বা ছাত্রকে শুধুমাত্র যন্ত্রচালক বা গ্রাহকে পরিণত না করে। মনে রাখতে হবে ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠতা এবং দ্বি-মুখী প্রবাহ হচ্ছে উন্নত শিক্ষার চাবিকাঠি এবং এ ব্যাপারে কোনো আপস করা যায় না।

## ৫.৬ নতুন অংশীদারিত্ব

### ৫.৬.১ NGO, বিভিন্ন সোসাইটি গ্রুপ এবং শিক্ষক সংগঠনের ভূমিকা

বিগত দশকের একটি পৃথক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে NGO এবং সিভিল সোসাইটি গ্রুপ-এর শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়া। স্কুলের নতুন আদর্শ সৃষ্টি করায়, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য উপাদানের উন্নতিতে, জনসমাবেশে NGO গুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। পাঠক্রমের উন্নতি, শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে সমর্থন, তার নজরদারি এবং গবেষণার সবকটি ব্যাপারে NGO সঙ্গে স্কুল এবং রিসোর্স সেন্টারগুলির শিক্ষাকে সাধারণের মধ্যে দৃশ্যমান জায়গা দিতে এবং শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিয়ে আলোচনার উদ্ভবকে সাহায্য করেছে। NCF এর পরিপ্রেক্ষিতে এবং ধারণার বিস্তৃতি, স্কুল এবং সমাজের সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনী কাজে তাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসংগ্রহ তার সঙ্গে শিশুদের শিক্ষার অধিকারের প্রতি দায়বদ্ধ একটি পরিবেশ গঠন এই রকম সব ব্যাপারেই প্রয়োজন বিভিন্ন সিভিল সোসাইটি গ্রুপগুলির সংযুক্তিকরণ এবং অংশগ্রহণ।

শিক্ষকদের সংগঠনগুলি স্কুলের শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে আরও বড় ভূমিকা নিতে পারে। যেমন তারা তাদের শিক্ষক সদস্যদের প্রভাবিত করে সুনিশ্চিত করতে পারে যে পড়ানোর সময় অন্য কোনো কাজ হবে না। গ্রহণযোগ্য একটি সংস্কৃতি গড়ে তুললে তা বিভিন্ন মান তৈরির মাধ্যমে স্কুলের কাজকর্মের উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করতে পারে। শিক্ষার কাজ চালানোর জন্য যেসব তথ্য এবং সাহায্য দরকার সেদিকে তারা দৃষ্টি আকর্ষণও করতে পারে। এমনকি তারা একটি গঠনমূলক ''প্রেসার গ্রুপ'' হিসাবে কাজ করতে পারে বিভিন্ন প্রয়োজনে যেমন শিক্ষকদের শিক্ষার মান এবং পেশাদারিত্বের ইত্যাদি। এই সংগঠন, স্মরণীয় অন্যান্য সংগঠন এবং BRC এবং CRC র সঙ্গে মিলে শিক্ষাসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সাহায্যের প্রকৃতি নির্ণয়ে তথ্য সরবরাহ, ইত্যাদি কাজ করতে পারে।

SCERT-এর ভূমিকা এবং কাজকর্মের মধ্যে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ অধ্যয়নের ক্ষেত্র নয় তার সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সহায়তাদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইতিমধ্যেই যেসব কথানির্দেশক সংস্থা/ব্যুরো রয়েছে, তাদের সেই অঞ্চলের কর্মরত শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ, মনস্তাত্ত্বিক হাতিয়ার/পরীক্ষা ক্রমোন্নতির নাগাল লেখাপত্র ইত্যাদি কাজে এবং পেশাগতভাবে প্রশিক্ষিত পথনির্দেশক ব্যক্তিত্বদের যথাস্থানে নিযুক্ত করে জেলা/ব্লক এবং বিদ্যালয় স্তরে পরামর্শদানের পরিষেবার ক্ষেত্রে তথ্যকেন্দ্র হিসাবে স্থাপিত করে, সেইসব সংস্থা/ব্যুরোকে শক্তিশালী করার জন্য CERT-র অবশ্যই পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষাক্রমের খসড়ায় যে বিস্তৃত লক্ষ্য আছে বিশেষ করে শিক্ষায় বহুমাত্রিকতা কে উৎসাহিত করার যে ঝোঁক আছে তার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শিশুদের প্রয়োজন এবং শিক্ষার নতুন নতুন দিকগুলি একত্রিত করায়, ছাত্রদের বিচিত্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এবং আমাদের দেশের শ্রেণীগত বাস্তব জটিল প্রকৃতির প্রথা মাথায় রেখে শিক্ষার নলেজস বেশ বিস্তৃত করাটা খুবই জরুরি। স্টাডি অফ এডুকেশনকে তাদের গবেষণার তালিকায় রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তরের কাছে আবেদন জানাতে হবে। বহুবিভাগীয় যুগ্ম গবেষণা যা বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রদের একত্রিত করে, একটি গবেষণার ভিত্তি তৈরির জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যে ভিত্তিটি, শিক্ষাক্রমের খসড়ায় ভিতরের ধারণাগুলির জন্য প্রয়োজনীয়। একই সঙ্গে যে সব বিদ্যালয় থেকে আসা শিশুরা আকর্ষণীয় এবং অস্বাভাবিক কম্বিনেশন নিয়ে পড়ার জন্য যাচ্ছে তাদের জন্যও বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা খোলা রাখা উচিত। ভর্তির মানদণ্ড বাদ দেওয়ার জন্য ব্যবহার না করে সেগুলিকে নেওয়ার জন্য খুলে রাখা উচিত এবং আগ্রহ, খোঁজ এবং সুযোগের বিভিন্নতাকে উৎসাহিত করা উচিত। এই ধরনের ভর্তির পদ্ধতি আরও গুরুত্বপূর্ণ যদি ছাত্ররা এই ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে গন্তব্যহীন ভাবে শুরু করে।

উচ্চতর শিক্ষাসংস্থাগুলির, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষকদের, শিক্ষা দেওয়ার এবং তাদের পেশাগত অবস্থান উন্নত করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন চিন্তাশীল শিক্ষক এবং তার একমুখীনতা যাদের উপর শিক্ষাক্রমের কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে তাদের জন্য শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীর সংস্কার প্রয়োজন। পাঠ্যপুস্তক লেখা এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে সহযোগিতামূলক কাজ যা ব্যবহারজীবী এবং শিক্ষাজীবী দুই ভিন্ন নিপুণতাকে একত্রে আনে। উচ্চতর শিক্ষা চিন্তার জায়গা করে দেয়, শিক্ষাসংক্রান্ত ধারণা এবং কাজের ওপর বিতর্ক এবং আলোচনার সুযোগ এনে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে SCERT এবং DIET জাতীয় প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ প্রয়োজন যাতে শিক্ষকদের শিক্ষা এবং চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ আরও শক্তিশালী হয় এবং তাদের গবেষণার ক্ষমতারও উন্নতি হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আবার বলা যেতে পারে সেই ধারণাটির কথা এমন একটি শিক্ষা কমপ্লেক্স, যেখানে একসঙ্গে থাকাবে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, SCERT, DIET এবং NGO। যার ফলে তৈরি হতে পারে এমন ব্যবস্থা বা নেটওয়ার্ক যা শিক্ষগত সাহায্য পর্যবেক্ষণে অংশগ্রহণ করবে এবং প্রকল্পের মূল্যায়ন করবে।

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী শিক্ষা ও শিক্ষণের উৎস পাঠ্যপুস্তক সমেত পাঠ্যসূচী তৈরি করা যেতে পারে শিক্ষকদের এবং অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ বাড়িয়ে অনেক বেশি বিকেন্দ্রিত এবং অংশগ্রহণ পদ্ধতিতে। এটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে আমরা চাইছি প্রতিটি স্তরে এবং প্রতিটি বিষয়ে একাধিক

পাঠ্যপুস্তক যাতে সেইসব জিনিসের অনেক বেশি স্থানীয় প্রাসঙ্গিকতা থাকে এবং শিক্ষকদের কাছেও বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে থেকে বাছাই করবার সংযোগ এত বড় থাকে। একটি দল অন্যান্য সহযোগী উপকরণও উৎপাদন করতে পারে, যেমন স্থানীয় অভিজ্ঞতা এবং ছবিসহ ছোটগল্প যা ছোটদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। বিভিন্ন বিষয় এবং পছন্দ যা এতকাল পাওয়া যেত শুধু অভিজাত স্কুলে তা এখন সমস্ত স্কুলেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হতে পারে।

শিশু ও নারীকল্যাণ দপ্তর, যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর, উপজাতি কল্যাণ দপ্তর, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দপ্তর, পঞ্চায়েত দপ্তর পর্যন্ত কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকারের বহু দপ্তর শিশুদের স্কুল এবং শিশু কল্যাণ ও উন্নতির বিষয়ে বিষয়ে আগ্রহী। এই সব দপ্তরগুলিরই শিশু এবং শিক্ষকদের শিক্ষায় সাহায্য করার ক্ষমতা আছে। তাদের প্রয়োজনকে কি উপায়ে তারা শিশুশিক্ষায় সাহায্য করতে পারে খুঁজে বার করা। শুধুমাত্র কিছু অতিরিক্ত সুবিধা দিয়ে নয়, তারা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে অর্থসাহায্য দিয়ে পাঠক্রমকে সমৃদ্ধ করতে পারে। যেমন টোম্পস্ ক্লাব, খেলার উপকরণ ও তার সঙ্গে প্রশিক্ষক পাঠানো, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক বা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জায়গায় শিক্ষামূলক ভ্রমণে পাঠানো ও সেই সমস্ত জায়গা সম্পর্কে তথ্য ও উপকরণ সরবরাহ নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মিড-ডে মিলের মানের তদারকি এইরকম। উদাহরণস্বরূপ, পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু যেহেতু পাঁচটি মন্ত্রীর দপ্তরের এক্তিয়ারভুক্ত সে কারণে স্বাস্থ্য এবং শরীর শিক্ষায় বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে মিলমিশ প্রয়োজন। পাঠক্রমের কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মূল দপ্তরগুলির মধ্যে সহযোগিতার কিছু ব্যবস্থাপনা চালু করতেই হবে এবং বিদ্যালয় পাঠক্রমে মধ্যস্থতাকারী স্থায়ী কিছু কর্মসূচীর চেয়ে বরং বিদ্যালয় পাঠক্রমেই কর্মসূচী পরিচালনা করতে হবে। কাজের মাধ্যমে এই দপ্তরগুলি শিক্ষাব্যবস্থাকে সাহায্য করতে এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ যেসব সহায়তা পাওয়া যায় সেগুলিকে, স্বাধীনভাবে ''শুধুমাত্র নিয়ে নেওয়া এবং কোথাও দিয়ে দেওয়া'র মতো করে ব্যবহার করলে হবে না। শিক্ষাদপ্তরের সঙ্গে পরিকল্পনা তৈরি করা প্রয়োজন। তাহলেই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এর ব্যবহার সুনিশ্চিত হবে। একইভাবে শিক্ষা দপ্তরের অনুরোধ অনুযায়ী নির্দেশিত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে।

# শেষের কথা

পাঠক্রমের এই যে খসড়াটি তৈরি হল এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের জন্য যথোপযুক্ত এবং তাদের কাছে কাম্য একটি বিধিবদ্ধ পাঠক্রম প্রণয়ন করা। এই খসড়াটিকে ভিত্তি করে শিশুশিক্ষার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা পাঠক্রম নির্ধারণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। ছাত্ররা স্কুলে কীভাবে শিক্ষা পাবে বা কী ধরণের শিক্ষা পাবে সে ব্যাপারে ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্কুলের বিভিন্ন বিষয়ে সমঝোতা তৈরি করতে সাহায্য করবে এই খসড়া। এই পাঠক্রমের ভূমিকাতে প্রতিটি স্কুলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ক্লাসরুমে শিক্ষকদের শিক্ষাপদ্ধতি, স্কুলভবনের বাইরের শিক্ষার স্থান এবং শিক্ষার উপাদানগুলির উপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে স্কুলের সামগ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রতিও যার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব পড়ে প্রতিটি ছাত্রের উপর। ব্যাপকভাবে পাঠক্রমের উন্নতির রূপরেখা তৈরি এবং প্রধান কার্যাবলী অর্থাৎ, পাঠ্যসূচী এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কার ইত্যাদি তৈরি করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন এই কার্যক্রমগুলি একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এছাড়াও শিশুশিক্ষার গুণগত মানের উন্নতির জন্য শিক্ষার প্রগতি এবং উন্নতির যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয় তা যাতে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রমের খসড়া তৈরির উদ্দেশ্যে প্রস্তাব চেয়ে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তার প্রভাবে শতশত অভিভাবক এবং শিক্ষকরা NCERT-র কাছে বিভিন্ন প্রস্তাব পাঠান। এইরকম একটি চিঠি এসেছিল মুম্বই নিবাসী শ্রীমতী নীতা মোহলার কাছ থেকে যিনি একজন মা এবং একজন শিক্ষিকাও। তিনি লিখেছেন "বর্তমানে ছাত্র হিসাবে আমার সন্তানরা সেই শিক্ষাই পাচ্ছে যা আমিও ২০ বছর আগে পেয়েছি। এখন সমস্ত পৃথিবীজুড়ে শিক্ষার এবং তার মূল্যায়নের নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত এবং অনুসৃত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের সন্তানরা এখনও সেই বোর্ডের লেখা থেকে খাতায় লিখে নেওয়া, সেগুলিকে কোনোরকমে মুখস্ত করে পরীক্ষার খাতায় উগরে দেওয়ার মতো প্রাচীন পদ্ধতিতেই শিক্ষাগ্রহণ করে চলেছে। যদিবা কিছু পরিবর্তন হয়েও থাকে তবে তার ফল ভালোর চেয়ে খারাপই হয়েছে। শিক্ষাগ্রহণ বা জ্ঞানার্জনের অনেক নতুন উপায় আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সন্তানদের স্কুলব্যাগের ভার ক্রমশই বাড়ছে। কম্পিউটার, মর‍্যাল সায়েন্স ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর এখন খুব জোর দেওয়া হচ্ছে এবং "কৌন বনেগা ক্রোড়পতি"র প্রভাবে এখন স্কুলের জেনারেল নলেজ বিষয়টিকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

পাঠ্যসূচী ক্রমশ স্ফীত হতে হতে শিক্ষকদের শেখানোর ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। শিক্ষকরাও এখন বিরক্তিকর একঘেয়েমির সাথে বিষয়গুলি খুবই দ্রুত ক্লাসে পড়িয়ে দিচ্ছেন। একই কারণে ছাত্ররাও ক্লাসে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দিতে পারছে না, এবং ফলস্বরূপ হয় বিষয়গুলি ভালোভাবে বুঝতে পারছে না অথবা দিবাস্বপ্নে আটকে থাকছে। সিলেবাস শেষ করার তাগিদে আগে পড়ানো বিষয়টি শিক্ষকের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছাত্রদের কাছে ভালভাবে বোধগম্য হওয়ার আগেই পরবর্তী বিষয় পড়ানো শুরু হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সিলেবাস শেষ করার দায়টা চলে যাচ্ছে অভিভাবক এবং প্রাইভেট টিউটরের ঘাড়ে। ফলত ছোট ছোট বাচ্চারা মাথায় বিশাল সিলেবাসের বোঝা নিয়ে স্কুল থেকেই সরাসরি চলে যাচ্ছে টিউটরের কোচিং ক্লাসে। শিশুরা তাদের শৈশবকেই হারিয়ে ফেলছে। কিছু ছাত্র কঠিন থেকে কঠিনতর পরিশ্রম করছে অন্যান্যদের হারিয়ে প্রথম সারিতে থাকবার জন্য। বেশির ভাগ ছাত্রই অভিভাবক এবং শিক্ষকদের দ্বারা তাড়িত হচ্ছে আরও বেশি পরিশ্রম করার জন্য এবং অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এমনকি অনেকের চিকিৎসাও করাতে হচ্ছে। অল্প কিছুসংখ্যক ছাত্র যারা মূল বিষয়গুলিতে ভালো ফল করতে পারছে একমাত্র তাদেরই সফল বলা হচ্ছে। এর বাইরে যেসব ছাত্র শিল্প, খেলা বা কারিগরী ক্ষেত্রে ভালো কাজ

করছে তাদের অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। খেলাধূলা বা অন্যান্য শখের কাজ করা থেকে ছাত্রদের বিশেষ ভাবে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে কারণ এইসব ক্ষেত্রে ভাল ফল করলেও তাতে পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর বাড়ে না। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এবং সাফল্যের মাপকাঠি এই দুইয়ে মিলে শিশুছাত্রদের জীবনটাকে বইয়ের মধ্যেই আটকে রাখছে, পক্ষান্তরে বাস্তব জগতের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এমনকি দেখা যাচ্ছে ক্লাস সিক্স-এর ছাত্ররাও বেশি নম্বর পাওয়ার দৌড়ে টিঁকে থাকার জন্য স্কুলের পরেও অন্তত চার ঘণ্টা করে বাড়িতে পড়াশোনা করতে বাধ্য হচ্ছে।

তাদের বেড়ে ওঠার সময়ে যদি ছাত্ররা বাস্তব জগতের চেয়ে বইয়ের জগতেই বেশি সময় থাকতে বাধ্য হয় তাহলে তাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় শিক্ষার বিপরীত প্রভাব ঘটছে। এর প্রভাবে ছাত্রদের মন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে থাকে সঠিকভাবে না বুঝে মুখস্থবিদ্যার সাহায্যে ভেবে নেওয়া এক পৃথিবী এবং অপরদিকে থাকে চারপাশের বাস্তব জগৎ, অনভিজ্ঞতার জন্য যার সম্বন্ধে তার পরিষ্কার ধারণা থাকে না। উদাহরণ হিসাবে ক্লাস ফোরের একটি বাচ্চার কথা ভাবুন যে জানে পাহাড়ের ওপর ঘাস খেয়ে বেড়ানো গবাদি পশুরা কী ভাবে ভূমিক্ষয় রোধ করে। এটা সে বই পড়ে জেনেছে কিন্তু সে জানেনা বাড়িতে এবং স্কুলে তার খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি কীভাবে গুছিয়ে রাখতে হয় যেহেতু এটা কোনো বইয়ে লেখা থাকে না। এই ছেলেটি বড় হবে প্রচুর জ্ঞান সঞ্চয় করবে। কিন্তু দেখা যাবে তার বাস্তববুদ্ধি খুবই কম। সে হবে প্রকৃতপক্ষে একটি শিক্ষিত বোকা।

সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কথা খেয়াল করলে দেখা যাবে তারা উন্নতি করেছেন তাঁদের জীবনের লক্ষ্যটাকে স্থির রেখে, অথচ এখনকার ছাত্রদের পড়ানো হচ্ছে প্রচুর বিষয় যার বেশির ভাগই তাদের দৈনন্দিন জীবন এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্কহীন। যেসব ছাত্ররা এই দিবাস্বপ্নে বিভোর থেকে শুধু পাঠ্যবইয়ের শিক্ষার মধ্যেই আটকে থাকে তাদের পক্ষেই সমাজের বিপদ্‌জনক প্রভাবগুলির থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভবনা বেশি থাকে। এর থেকে তাদের রক্ষা করার মতো কোনো সহায়ক ব্যবস্থা আমাদের সমাজে নেই। এইসব কারণে অভিভাবকরাও তাঁদের সাফল্যের মতোই মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন। প্রতি বছর বিভিন্ন বোর্ডের পরীক্ষায় যেসব ছাত্রছাত্রীরা বসে তাদের পঁচাত্তর শতাংশই এখন বিশাল মানসিক চাপ এবং তজ্জনিত বিশৃঙ্খলার শিকার।"

শ্রীমতী মোহলার চিঠি থেকে আমরা যেসব যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব পাই তার কয়েকটি হল

ছাত্রদের কী শেখানো হবে সেটা স্থির করা উচিত কতটা শেখা সম্ভব সেটা বিচার করে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক কাঠামো এবং বিস্ময়কর স্থাপত্যগুলিকে খেয়াল করলে দেখা যাবে তাদের প্রতিটি অংশ একে অপরের সঙ্গে চমৎকারভাবে সংযোগ রেখে কাজ করছে। বাস্তব চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে প্রণয়ন করা যাতে এর মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃত উদ্দেশ্য সাধনের সব উপাদানগুলিই থাকবে সহজলভ্যতা এবং সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে বাস্তবের জমিতে।

মাত্র কয়েকজনের সাফল্যের কথা না ভেবে শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে সবাই তাতে অংশ নিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। শিক্ষার ভিতটা এমন হবে যাতে সেটা সারাজীবন কাজে লাগে। স্তম্ভগুলিকে চওড়া করতে হবে এবং নতুন করে তার সীমা নির্ধারণ করতে হবে। পুরনো স্তম্ভগুলি অর্থাৎ অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদির পাশাপাশি ব্যক্তিত্ব চরিত্রগঠন, শরীরশিক্ষা, সৃজনশীল চিন্তার মতো নতুনন বিষয়গুলিকে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। বিষয়বস্তুগুলিকে হতে হবে জীবনের বিশেষ করে কর্ম্মজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় তার সঙ্গে লড়াই করার কথা মাথায় রেখে। ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়কেই যথেষ্ট সময় দিতে হবে। বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করে ছাত্ররা নিজেদের আগ্রহের বিষয়গুলিকে নিজেরাই আবিষ্কার করবে। এর পরিপূরক হিসাবে সঙ্গে থাকবে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা, যেমন নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তির প্রকাশ ইত্যাদি। বিকল্প মূল্যায়ন যেমন বই

সঙ্গে রেখে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে। ছাত্রদের মস্তিষ্কে বিভিন্ন বিষয়ের বীজ বপন করাটাই প্রয়োজন। পুরো গাছটা ঢুকিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বিদ্যা ছাত্রদের সারাজীবন ধরে শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত করবে।

শিক্ষাকে অবশ্যই মানবিক হতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের যোগ্যতা এবং প্রবণতা অসীম। শিক্ষাব্যবস্থাকে এর সঙ্গে মাধুর্যপূর্ণ হতে হবে। বিকল্প মূল্যায়নের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে যাতে ছাত্রদের বহুমুখী প্রতিভা উৎসাহ পায়। খেলা, শিল্প এবং কারিগরি বিদ্যায় যারা উৎকর্ষ দেখাবে পড়াশোনায় উৎকৃষ্ট ছাত্রদের সঙ্গে তাদেরও সমভাবে প্রাপ্য স্বীকৃতি দিতে হবে। উৎকর্ষতালিকা বড় করলে তা নিশ্চিতভাবেই ছাত্র এবং অভিভাবকদের উৎসাহিত করবে এবং তাদের মানসিক অবসাদমুক্ত করবে কারণ ছাত্ররা তখন আরও বহুতর বিষয়ে নিজেদের ছাড়িয়ে দিতে পারবে। মান-নির্ণয়ী প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের ফলে পাঠক্রমের সামাজিক ডারউইনবাদ প্রয়োগের থেকে সমাজের কেন্দ্রীয় মনোযোগ অন্যত্র স্থানান্তরিত হবে।

এরপর আশা করা যাক আমাদের দেশের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচী এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণেতারা এক জন মায়ের আবেদনের প্রতি যথেষ্ট এবং জরুরি মনোযোগ দেবেন।

# সংক্ষিপ্তসার

## ১ম অধ্যায়

* একটি বহুমাত্রিক সমাজের উপযোগী জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সমৃদ্ধিকরণ
* 'চাপমুক্ত শিক্ষা'-র মূল ধারণা অনুসারে পাঠক্রমের বোঝা কমানো
* পাঠক্রম সংস্কারের সঙ্গে সাজুয্যপূর্ণ পরিচালন ব্যবস্থার পরিবর্তন
* সামাজিক ন্যায়, সমানাধিকার এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মতো সাংবিধানিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে পাঠক্রম রচনা।
* সকলের জন্য উন্নতমানের শিক্ষা নিশ্চিত করা
* অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে সক্ষম লিঙ্গসাম্যের প্রতি এবং তফশিলি জাতি উপজাতিদের সমস্যা সম্পর্কে সংবেদনশীল, গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নাগরিক গঠন

## ২য় অধ্যায়

* শিক্ষা ও শিক্ষার্থী সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর বদল
* শিক্ষার্থীর শিক্ষা ও বিকাশ সম্পর্কে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী
* শ্রেণীকক্ষে সমস্ত ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য একটি বিশিষ্ট বাতাবরণ সৃষ্টি করা
* জ্ঞান সৃষ্টি ও সৃজনশীলতায় শিক্ষার্থীর সরাসরি অংশগ্রহণ
* পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে সক্রিয় শিক্ষা
* পাঠক্রমের মধ্যেই শিশুদের চিন্তা, কৌতূহল এবং প্রশ্ন উদ্দীপনের সুযোগ প্রণয়ন
* অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনে বিষয় সীমার বাইরেও জ্ঞান অন্বেষণ
* জ্ঞানচর্চার আধেয় (কনটেন্ট) ব্যতীত পর্যবেক্ষণ, অন্বেষণ, আবিষ্কার, বিশ্লেষন, ও চিন্তাভাবনার উপর সমান গুরুত্ব প্রদান
* বাস্তব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিশ্লেষণ ক্ষমতার উদ্রেককারি ক্রিয়াকলাপ সংযোজন
* আঞ্চলিক জ্ঞান এবং শিশুর অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণাকে পাঠ্যপুস্তক ও জ্ঞানচর্চায় সংশ্লেষণ
* পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার অধীনে যুক্ত শিশুরা জ্ঞান উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তাদের অবদান

রাখতে পারে যার ফলে ভারতের পরিবেশ সংক্রান্ত একটি স্বচ্ছ সাধারণের আয়ত্ত্বাধীন তথ্যভাণ্ডার সৃষ্টিতে সহায়তা লাভ করা যেতে পারে।

* স্কুলের বছরগুলিকে দ্রুত বিকাশের সময়ে পরিণত করা যাতে শিক্ষার্থী তার প্রবণতা ও আগ্রহ অনুসারে জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়ার উপাদানগুলিকে সংগঠিত ও বিন্যস্ত করে নিতে পারে

৩য় অধ্যায়

ভাষা

* ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা অর্থাৎ পড়া, শোনা, কথা বলা ও বোঝার ক্ষমতা স্কুলের বিষয়ের গণ্ডি ছড়িয়ে প্রসারিত হয়। শিক্ষার্থীর জীবনে, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করা দরকার।
* ত্রিভাষা সূত্র চালু করার লক্ষ্যে একটি নতুন প্রয়াস চালানো প্রয়োজন। উপজাতীয় ভাষা থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রেই মাতৃভাষাকে শিক্ষার সেরা বাহন বলে উপলব্ধি করা দরকার।
* অন্যান্য ভারতীয় ভাষার পাশে ইংরাজির নিজস্ব স্থান খুঁজে পাওয়া প্রয়োজন।
* ভারতের বহু ভাষাভাষী সমাজকে স্কুল জীবনের সম্পদ হিসাবে দেখা দরকার।

গণিত

* অঙ্কের জ্ঞানের (সংকেত, পদ্ধতি, যান্ত্রিক প্রক্রিয়া) তুলনায় গাণিতিক ভাবনাকে (যুক্তি নির্মাণ, সম্পর্ক নির্ণয়, বিমূর্ত ধারণার অভ্যাস) অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে।
* উন্নতমানের গণিতশিক্ষা লাভ করার অধিকার প্রতিটি শিশুর আছে। গণিতশিক্ষার সময়ে দেখতে হবে শিশুটি যেন যুক্তি নির্মাণ করতে, সংকেত ও সম্পর্ক নির্ণয় করতে এবং বিমূর্ত ভাবনায় অভ্যস্ত হতে শেখে।

বিজ্ঞান

* বিজ্ঞান শিক্ষার আধেয়,পদ্ধতি এবং ভাষা শিশুটির বয়স ও বোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
* পরিবেশের সঙ্গে যোগ রেখে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা এমন ভাবে দেওয়া দরকার যাতে বিদ্যার্থীর অনুসন্ধিৎসা এবং সৃজনশীলতার লালন পালন করা যায়।
* বিজ্ঞান শিক্ষাক শিশুর বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে এমন ভাবে সংযুক্ত করতে হবে যাতে সে যথেষ্ট কর্মমুখি দক্ষতা সহকারে কর্মজগতে প্রবেশ করতে পারে।
* সমগ্র স্কুল পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে পরিবেশ সুরক্ষার বোধ জাগ্রত করতে হবে।

সমাজ বিজ্ঞান

* পরীক্ষার প্রয়োজনে নিছক কিছু সারবাঁধা তথ্য মুখস্থ করার পরিবর্তে সমাজবিজ্ঞানের

বিষয়বস্তুতে তাত্ত্বিক অনুধাবনে চিন্তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন যাতে শিশুদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতায় দক্ষ করে তোলা যায় এবং তারা বিভিন্ন সামাজিক প্রশ্নে যৌক্তিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে।

* লিঙ্গসাম্য, মানবাধিকার, বিচ্ছিন্ন জনজাতির প্রতি সংবেদনশীলতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ও জাতীয় আগ্রহের বিষয়ে সামগ্রিক ধারণা গঠন করতেহবে।
* সমাজবিদ্যাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান হিসাবে পুর্ণবিন্যাস করা প্রয়োজন। ইতিহাসের গুরুত্ব এবং সমাজগঠনে ইতিহাসের ভূমিকা সম্পর্কে বিদ্যার্থীদের অবহিত করতে হবে।

কর্ম

বিদ্যালয় পাঠক্রমগুলি প্রাক্-প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত অমনভাবে পুনর্নির্মিত করতে হবে যাতে জ্ঞান আহরণ, মূল্যবোধের বিকাশ এবং বিবিধ দক্ষতা গঠনে এই পাঠক্রম একটি বিবিধ শিক্ষাদাত্রী মাধ্যম হিসাবে তাদের কাজের শিক্ষাদানকারী ক্ষমতা অনুধাবন করতে পারে।

শিল্প

* শিল্প (লোকশিল্প, ধ্রুপদী শিল্পকলা, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, পুতুলনাচ, মৃৎশিল্প, নাটক ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পকে অবশ্যই স্কুল পাঠক্রমের অঙ্গীভূত বলে গণ্য করা উচিত।
* অভিভাবক, স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা অধিকারিকদের এই ধরণের শিল্পকলা ও কারুশিল্পের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত এবং নান্দনিক গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন।
* স্কুল পাঠক্রমের সর্বস্তরেই শিল্পকে একটি বিষয়ে হিসাবে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

শান্তি

* সমগ্র স্কুলজীবন ধরে শিক্ষার্থীর মনে শান্তিকামি মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং ক্রিয়াকলাপের আয়োজন করে একাজ করা যেতে পারে।
* শিক্ষক শিক্ষণের একটি বিষয় হিসাবে শান্তি শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা

* শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নতির জন্য স্বাস্থ্য ও শরীর শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খেলাধুলা, স্বাস্থ্য ও শরীর শিক্ষার ( যোগব্যায়াম সহ) আকর্ষণের মধ্যে দিয়ে স্কুলের ভর্তি, ধরে রাখা এবং স্কুল সমাপ্ত করার সমস্যারও কিছু সমাধান হতে পারে।

পরিবেশ ও শিক্ষা

* পরিবেশ শিক্ষার আওতাভুক্ত কর্মকাণ্ডের জন্য পর্যাপ্ত সময় নির্ধারিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্তরে বিভিন্ন নির্দিষ্ট বিষয় পড়ানোর সময় পরিবেশের প্রসঙ্গে উদ্বেগ এবং সেইসংক্রান্ত প্রশ্ন মিশিয়ে দিলেই সবচেয়ে ভালোভাবে পরিবেশ শিক্ষার পন্থা অনুসৃত হতে পারে।

৪র্থ অধ্যায়

* ন্যূনতম উপাদান সামগ্রীর উপস্থিতি এবং নমনীয় পাঠক্রমের প্রতি সমর্থন শিক্ষকের প্রয়োগ কুশলতা বাড়ানোর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।
* যে শিক্ষাব্যবস্থা শিশুকে শিক্ষার্থী হিসাবে গণ্য করে তা শিশুর আগ্রহ বাড়াতে সক্ষম হয়।
* সর্বশিক্ষার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সুস্থ ও প্রতিবন্ধী নির্বিশেষে সমস্ত শিশুর অংশগ্রহণ একান্ত জরুরি।
* গণতান্ত্রিক আচার আচরণের মধ্য দিয়ে আহরিত ব্যক্তিগত শৃঙ্খলার মূল্য শিক্ষার্থীর জীবনে অপরিসীম।
* সমাজের সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা স্কুলের সাথে ভাগ করে নেবার ব্যবস্থা থাকলে স্কুল ও সমাজের মধ্যে এক সেতুবন্ধ তৈরী হতে পারে।
* নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিক থেকে শিক্ষা পদ্ধতির নবরূপায়ণ করা প্রয়োজন:-

  — এমন পাঠ্যপুস্তক রচনা করা প্রয়োজন যাতে ধারণাগুলির বিস্তারিত আলোচনা থাকবে। সক্রিয় ক্রিয়াকলাপের নির্দেশ থাকবে, সমস্যার সমাধান এবং চিন্তাশীল বিশ্লেষণের অবকাশ থাকবে। পাঠ্যপুস্তকে দলবদ্ধ কার্যকলাপেরও নির্দেশ থাকা প্রয়োজন।

  — পরিপূরক বই, ওয়ার্কবুক এবং শিক্ষা সহায়ক বই ইত্যাদি কে নতুন ধারণা অনুসারী করে তুলতে হবে।

  — একমুখী মাল্টিমিডিয়া ও তথ্য সম্প্রসারন প্রযুক্তি (ICT) বাব্যহাবের বদলে এদের পারস্পরিক আদান প্রদানের ভিত্তি করে তুলতে হবে।

  —স্কুল লাইব্রেরিটিকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপযোগী জ্ঞানান্বেষণের পীঠস্থান করে তুলতে হবে। এটিকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংযোগের মাধ্যম হয়ে উঠতে হবে।
* স্কুলের সময় সারণী নির্ধারণের বিকেন্দ্রীকরণ, শিক্ষকের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার এবং পেশাদারি দক্ষতার প্রণয়ন করে শিক্ষার আবহ গড়ে তোলা।

৫ম অধ্যায়

* গুণমান সম্পর্কে সংবেদনশীলতা যে কোনও সংস্কারের চরিত্র লক্ষণ হওয়া উচিত। এর ফলে ব্যবস্থাটি তার নিজের দুর্বলতা স্বতঃই কাটিয়ে উঠতে পারে।
* দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ বিদ্যালয়শিক্ষার তুলনীয় মান প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন পশ্চাদপট থেকে আসা শিশুরা একত্রে অধ্যয়ন করতে যে শিক্ষার সামাজিক মনোন্নয়ন ঘটে এবং বিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক বোধ সমৃদ্ধ হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করাই আমাদের কাম্য।
* একটি পরিকল্পনা পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার যাতে স্কুল স্তরে কর্মসীমাটি চিহ্নিত করা হবে এবং ক্রমান্বয়ে ঊর্ধ্বমুখী পর্যালোচনার মাধ্যমে ব্লক ও ক্লাস্টার স্তরে সেগুলিকে

দৃঢ়সংবদ্ধ রূপদান করে জেলাস্তরে চূড়ান্ত করা যেতে পারে।

* প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকরা সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি পরিকল্পনা রূপরেখা প্রস্তুত করবেন।

* স্কুলগুলির কার্যফল পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিটিকে স্কুলের সাথে যোগাযোগ রক্ষার একটি উপায় বলে ভাবতে হবে।

* শিক্ষক/ শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ কর্মসূচী এমনভাবে পুনরায় সূত্রায়িত এবং শক্তিশালী করতে হবে যাতে শিক্ষক/ শিক্ষিকা হতে পারেন এমন একজন যিনি:

—শিক্ষা-শিক্ষণ পরিস্থিতির মধ্যে শিক্ষার্থীকে (ছাত্র-ছাত্রী) তাদের স্বীয় প্রতিভা আবিষ্কার, পূর্ণতর মাত্রায় নিজেদের শারীরিক এবং বৌদ্ধিক ক্ষমতা অনুভব করা ও একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে নিজ নিজ চরিত্র এবং কাঙ্ক্ষিত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে উৎসাহদাতা, সহায়ক ও মানবিক গুণ বৃদ্ধিকারী, এবং

—একটি দলের সক্রিয় সদস্য হিসাবে পাঠক্রম নবীকরণের জন্য সচেতন উদ্যোগ নেন যাতে পরিবর্তিত সামাজিক প্রয়োজন এবং শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সঙ্গে এটি সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

* পূর্ণসূত্রায়িত যে শিক্ষক/ শিক্ষিকার শিক্ষা শিক্ষা কর্মসূচীতে জ্ঞান নির্মাণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সক্রিয় সংযুক্তিকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেই কর্মসূচী শিক্ষালাভ, জ্ঞান নির্মাণের উৎসাহদাতা বিশেষ শিক্ষক/ শিক্ষিকার শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিবিধ বিষয়মুখী চরিত্র, একত্রীকরণের তত্ত্ব, অভ্যাস/চর্চার মাত্রা এবং যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে সমসাময়িক ভারতীয় সমাজের প্রশ্ন ও বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে ভাগ বসায়।

* শিক্ষক/শিক্ষিকাদের শিক্ষায় ভাষাসংক্রান্ত দক্ষতার কেন্দ্রীয় ভূমিকা এবং শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের পেশাগত নিবিষ্টতাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ বলে অনুমিত হয়।

* কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে স্কুল ব্যবস্থায় পরিবর্তনের অনুঘটকে রূপান্তরিত করতে হবে।

* গ্রামস্তরে বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলি যাতে সমান্তরালভাবে কাজ করতে পারে তার উপযোগী একটি ব্যবস্থাতন্ত্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

* পরীক্ষার চাপ কমানো এবং পরীক্ষায় সাফল্যের হার বাড়ানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি হল:-

— বিষয় ভিত্তিক পরীক্ষাকে সমস্যার সমাধানমূলক পরীক্ষায় রূপান্তরিত করতে হবে। প্রশ্নপত্রের বর্তমান ছকটিকে পাল্টাতে হবে।

— স্বল্পমেয়াদী পরীক্ষা চালু করতে হবে

— পরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া প্রয়োজন

— সমস্ত প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলির পরিকল্পনা ও আয়োজনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে তুলতে হবে।

* প্রাক্-প্রাথমিক স্তর থেকে +স্তর পর্যন্ত বিদ্যালয় পাঠক্রমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক করে তোলায় বিশ্বায়নের আওতাভুক্ত একটি অর্থনীতির চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় বৃত্তিশিক্ষার পূর্ণতাত্ত্বিক এবং পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয় ভিত্তি স্থাপিত হবে এমনই প্রত্যাশা।

* এই ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বিদ্যমান সুযোগসুবিধার দেশব্যাপী দৃশ্যচিত্রের সঙ্গে একযোগে বিভিন্ন গ্রাম-সংগঠন ও ব্লক স্তর থেকে উপ-বিভাগীয়/জেলাশহর এবং মহানগরীর এলাকায় প্রতিষ্ঠিত পৃথক পৃথক বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রগুলিকে যুক্ত করে একটি লক্ষ্য-নির্ধারী ভঙ্গিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের (VET) তত্ত্ব অনুষ্ঠান ও প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

* একাধিক পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন করতে হবে যাতে শিক্ষকের চয়ন স্বাধীনতা থাকে এবং ছাত্রদের বিবিধ প্রয়োজন বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত হতে পারে।

* শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা ও ক্লাস পরিচালনা পদ্ধতির আদান প্রদান ঘটানোর সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে নিত্যনতুন পদ্ধতি প্রকরণ প্রবর্তিত হবার ও পরীক্ষা নিরীক্ষার সম্ভাবনা তৈরী হবে।

* পাঠ্যসূচী (সিলেবাস), পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষণ সামগ্রী ইত্যাদি পরিকল্পনার পদ্ধতি বিকেন্দ্রীকরণ করে ঐ সব উপাদান রচনায় শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ, এন জি ও এবং নানা শিক্ষক সংগঠনের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।

ভারতেন্দ্র সিংহ বাসওয়ান
শিক্ষা সচিব

ভারত সরকার
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক
মধ্য এবং উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
১২৮ 'সি' উইং, শাস্ত্রী ভবন
নতুন দিল্লী - ১১০০০১
দূরভাষ : ২৩৩৮৬৪৫১, ২৩৩৮২৬৯৮
ফ্যাক্স : ২৩৩৮৫৮০৭
ই-মেল : secy_she@sb.nic.in

২১-৭-২০০৪

প্রিয় অধ্যাপক দীক্ষিত,

শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি ১৯৮৬, যেভাবে ১৯৯২ সালে পরিবর্ধিত হয়েছে তাতে নিম্নলিখিত বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়।

"১১.৫ নতুন নীতির বিবিধ ধ্রুবকের প্রয়োগ প্রতি পাঁচ বৎসরে পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। প্রয়োগ এবং সময়ে সময়ে যেসব প্রবণতা উদ্ভুত হয় তাদের উন্নতিসাধন নিশ্চিত করতে স্বল্পমেয়াদী মূল্যায়নের ব্যবস্থাও করতে হবে।"

২) শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি, ১৯০৬-এর অধীনে প্রস্তুত কর্মসম্পাদনের কর্মসূচী (POA) ১৯৯২ পুনর্বিচারের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনার জন্য কয়েকটি প্রসঙ্গ পেশ করেছে। POA-এর অষ্টম অধ্যায়ের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করা হল।

৩) যেহেতু বর্তমান পাঠক্রম কাঠামোর চারবছর আগে প্রকাশিত সেকারণে এই পাঠক্রমের পুনর্বিচার এবং পুর্ননবীকরণ আরম্ভ করার এই হল সময়। পাঠক্রম পুননবীকরণের জন্য NCERT উদ্যোগ শুরু করতে পারে।

৪) পুননবীকরণের কাজটি সম্পাদনের সময় আপনি দয়া করে এই বিষয়টি নিশ্চিত করবেন যে, প্রক্রিয়াটি যেমনভাবে রচিত হয়েছিল অথবা বেশ কিছু সময়কাল যাবৎ যেভাবে উদ্ভাবিত হয়েছিল, তা লঙ্ঘিত হয়নি। পুর্ববর্তী পুনর্বিচারটি চূড়ান্ত রূপদানের সময় অনুসৃত পদ্ধতিসমূহের অপর্যাপ্ততা এবং অতি-সরলীকরণের সমালোচনা বিষয়ে আপনি সম্যক অবহিত।

৫) গত কয়েক বছর যাবৎ NCERT-র পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে পণ্ডিতমহল কঠোর সমালোচনা করেছেন। ইতিহাসের গ্রন্থ সম্পর্কিত বিতর্ক সামলানোর প্রক্রিয়ার মধ্যে আপনি ইতিমধ্যেই যুক্ত। বর্তমান পুনর্বিচার উপস্থাপনার সময়কালে, একটি নতুন পাঠক্রম কাঠামোর সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাদি প্রণয়নের সময় কেমন করে এ জাতীয় বিচ্যুতি থেকে তাদের সুরক্ষিত করা যায় সে বিষয়টি আপনি স্বইচ্ছায় উত্থাপন করতে পারেন।

৬) পুনর্বিচার কাজটি সম্পাদনের সময়কালে আপনি যে 'ভারতীয় শিক্ষা'সংক্রান্ত যশপাল কমিটির প্রতিবেদন এবং POA-র অষ্টম অধ্যায়টি বিবেচনা করবেন সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

৭) 'ভারত' সংক্রান্ত ধারণা যেভাবে আমাদের সংবিধানের রূপকল্পিত হয়েছে তার সঙ্গে NCERT সর্বদাই এখই সূত্রে বাঁধা। আমাদের সংবিধানের মুখবন্ধে নিম্নলিখিত শব্দাবলীতে ভারতের যে আদর্শ রূপকল্পনা রয়েছে, সেটি পুনর্বিচারে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মানুষের স্মরণ করিয়ে দেওয়া অত্যন্ত সময়োপযোগী:

**আমরা, ভারতের জনসাধারণ,** একবাক্যে দৃঢ়সংকল্প হয়েছি ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজবাদী ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে** পরিণত করতে এবং তার সমস্ত নাগরিকের জন্য সুরক্ষিত করতেঃ

**ন্যায়,** সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক

**স্বাধীনতা,** চিন্তায়, প্রকাশের, বিশ্বাসে, প্রত্যয়ে এবং পূজায়;

**সাম্য,** মর্যদায় এবং সুযোগে

এবং তাদের সকলের মধ্যে প্রচার করতে

**সংহতি** এবং একতা ও ব্যক্তিমানুষের মর্যাদা নিশ্চিতকারী বন্ধুতা...'

৮) নতুন NCERT-এর সূত্রায়নে বিদগ্ধ গোষ্ঠী এবং ব্যাপকতার নাগরিক সমাজে যে উদ্দীপনা সঞ্চারিত হবে এবিষয়ে আমাদের আস্থা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে সমস্ত আনুষঙ্গিক কার্যকলাপ আপনি তদানুসারে আরম্ভ করে দিতে পারেন।

এই উদ্যোগের জন্য শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা সহ,

স্বাক্ষর

(বি. এস. বাসওয়ান)

অধ্যাপক এইচ. পি. দীক্ষত
আধিকারিক
শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জাতীয় পরিষদ
১৭-বি, শ্রী অরবিন্দ মার্গ
নতুন দিল্লী - ১১০০১৬

ভারতেন্দ্র সিংহ বাসওয়ান
শিক্ষা সচিব

ভারত সরকার
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক
মধ্য এবং উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
১২৮ 'সি' উইং, শাস্ত্রী ভবন
নতুন দিল্লী - ১১০০০১
দূরভাষ : ২৩৩৮৬৪৫১, ২৩৩৮২৬৯৮
ফ্যাক্স : ২৩৩৮৫৮০৭
ই-মেল : secy_she@sb.nic.in

ডি. ও. নং ১১-১৭য়২০০৪-এস সি এইচ.৪ ২ মে, ২০০৫

প্রিয় অধ্যাপক কৃষ্ণকুমার,

বিদ্যালয়-শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় পাঠক্রম কাঠামোর (NCFSE) প্রসঙ্গে আমাদের আলাপ-আলোচনা অনুগ্রহ করে স্মরণ করবেন। এই বিষয়ে আমার ২১/৭/২০০৪ তারিখের যুগ্ম সংখ্যা চিহ্নিত চিঠি দয়া করে লক্ষ্য করবেন যেখানে বিদ্যালয়-শিক্ষা (২০০০-এর জন্য জাতীয় পাঠক্রম কাঠামোর NCFSE পুনর্বিচার এবং পুনর্নবীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করার প্রসঙ্গ আছে। এই চিঠির ৬নং অনুচ্ছেদে আমি NCFSE-২০০০ এর পুনর্বিচারের সময়, 'ভারহীন শিক্ষা' সংক্রান্ত যশপাল কমিটির প্রতিবেদনটি বিবেচনার কথা উল্লেখ করেছি। এখন NCERT যে জাতীয় পাঠক্রম কাঠামো প্রশস্ত করেছে, সেক্ষেত্রে আমরা আশা করব যে, নতুন পাঠক্রমের ভিত্তিকে পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুতিকালে, 'ভারহীন শিক্ষা' প্রতিবেদনে রেখাঙ্কিত নীতিসমূহ সম্পূর্ণ বিবেচনা করা হবে।

শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা সহ

স্বাক্ষর

(বি. এস. বাসওয়ান)

অধ্যাপক কৃষ্ণ কুমার
আধিকারিক, NCERT
শ্রী অরবিন্দ মার্গ
নতুন দিল্লী - ১১০০১৬